মাও সে-তুং একটি নাম

• বেদুইন •

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬
ডিসেম্বর, ১৯৬৯

প্রকাশক :
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক :
ফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
অবলা প্রেস,
১।এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
জহর দাস

দাম : বারো টাকা

শান্তি রায় ও কল্যাণ রায়

স্নেহভাজনেষু

এই লেখকের :—

পিকিং থেকে বলছি, রাজা আর নেই, মন্ত্রী পতন, রাজনীতির দাবাখেলা উপেক্ষিত বসন্ত, ঘানার কালো মানুষ, হ্যানয় থেকে সায়গণ, অমুবোষ্টুমির আখড়া, পথে প্রান্তরে, সিয়া একটি গোপন চক্র, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

"No country in the world arouses more controversial passion than China and yet in the past few years there has been a striking Convergence of opinion among specialists."—The Times (London)

"Mao has devoted his life to China and the Chinese peasants. Indeed the Chinese Peoples' Republic has shaped a whole pattern of revolution for poor peasant societies"—Political Leaders of 20th Century.

বিচিত্র মাও সে-তুং-এর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবন। এই বিরাট পুরুষকে নিখুঁতভাবে বিচার করা সুকঠিন, অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। তার কর্মজীবনের বিপরীত চিন্তাধারার সংঘাতে আসল মানুষটিকে অনেক সময় হারিয়ে ফেলতে হয়। পরিণত বয়সের মাও সে-তুং আর যুবক মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা পাশাপাশি রাখলে আজকের মাও সে-তুংকে যুবক মাও সে-তুং এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। মাও সে-তুং সম্বন্ধে তথ্যমূলক একটি উপাখ্যান গড়ে তোলা কঠিন কাজ। সেই কাজে ব্রতী হয়ে অনেক সময়ই মনে হয়েছে কত না ত্রুটি থেকে গেছে আমার এই লেখায়। অবশ্যই তা অনিচ্ছাকৃত। একটি বিশেষ মতবাদের ভিত্তিতে মাও সে-তুং-এর ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনকে লিখতে মোটেই চেষ্টা করিনি। পাঠকরা বিচার বিবেচনা করবেন, আমার বিশেষ কোন বক্তব্য নেই।

গ্রন্থ প্রণয়ণ কালে দেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। বিতর্কমূলক বিষয়ে নিজস্ব সমালোচনাও কোথাও কোথাও দিয়েছি।

বইখানা লিখতে বসে নানারূপ পারিবারিক বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে অনেক সময় কোথাও কোথাও বক্তব্য হয়ত স্পষ্ট হয়নি তার জন্য আমার দায়িত্ব অস্বীকার করছি না। ত্রুটির অংশীদার আমিও কিন্তু যে সামাজিক পরিবেশে এই ঘটনা ঘটেছে (মাও সে-তুং বর্ণিত আমাদের দেশের lumpen-proleteriat-দের জন্য) তাদের দায়িত্বও কম নয়।

বাংলাদেশে আমরা যে নবযুগের সূচনা আশা করেছিলাম, সে আশা নির্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। মানুষ যে বিপ্লব চায় শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে তা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে বলেই আমার বিশ্বাস। এই অবস্থার নিরসন হোক, এই কামনা নিয়ে পাঠকদের সামনে "মাও সে-তুং একটি নাম"-কে রাখছি।

গ্রন্থকারস্য

১.১২.৬৯

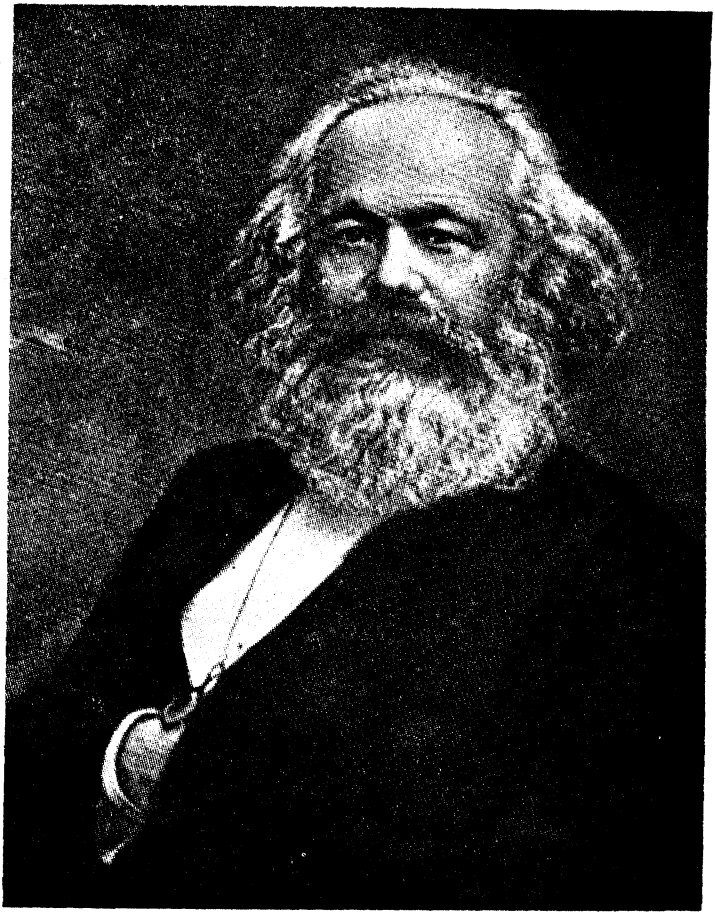

কার্ল মার্কস্

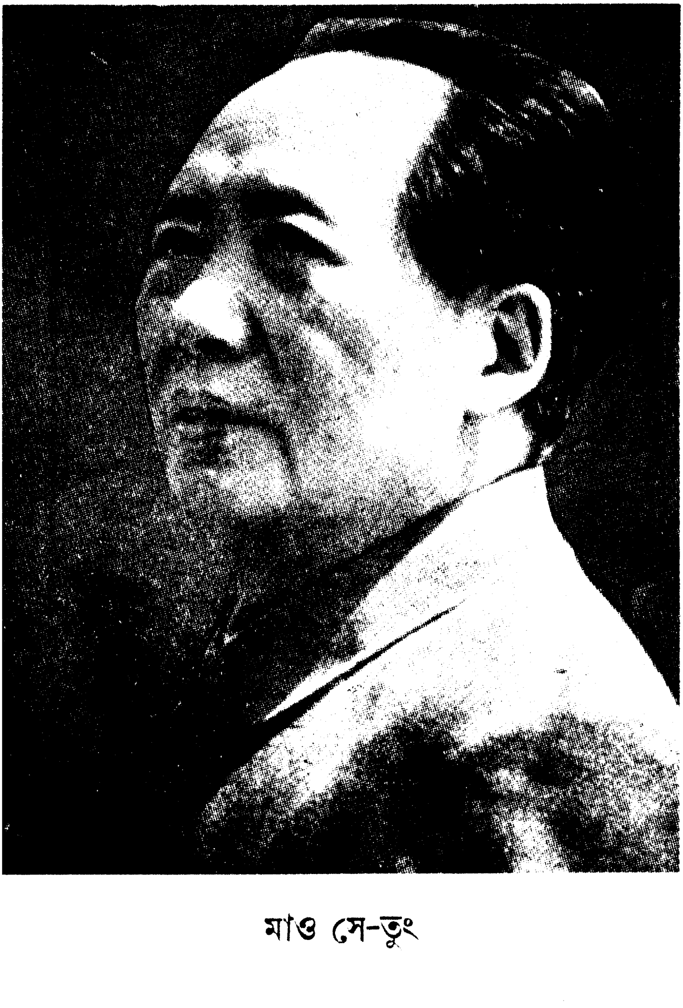

মাও সে-তুং

চাষীদের সঙ্গে আলাপরত মাও

৩০ বৎসর বয়সে মাও

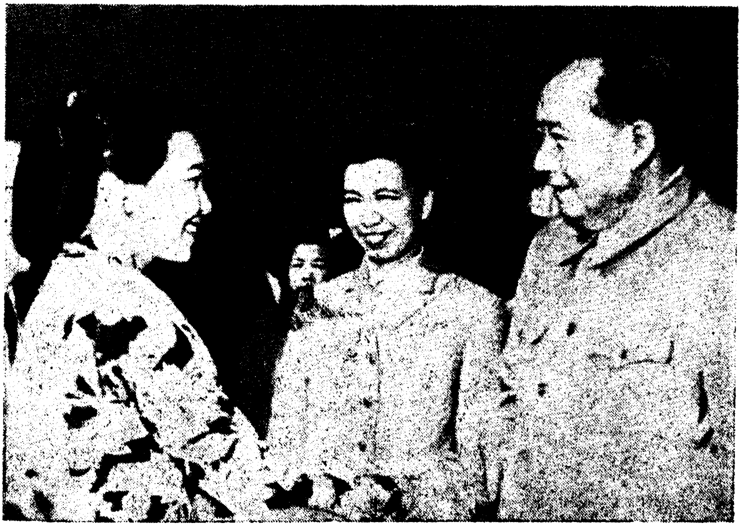

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের স্ত্রীর অভ্যর্থনায় সস্ত্রীক মাও সে-তুং

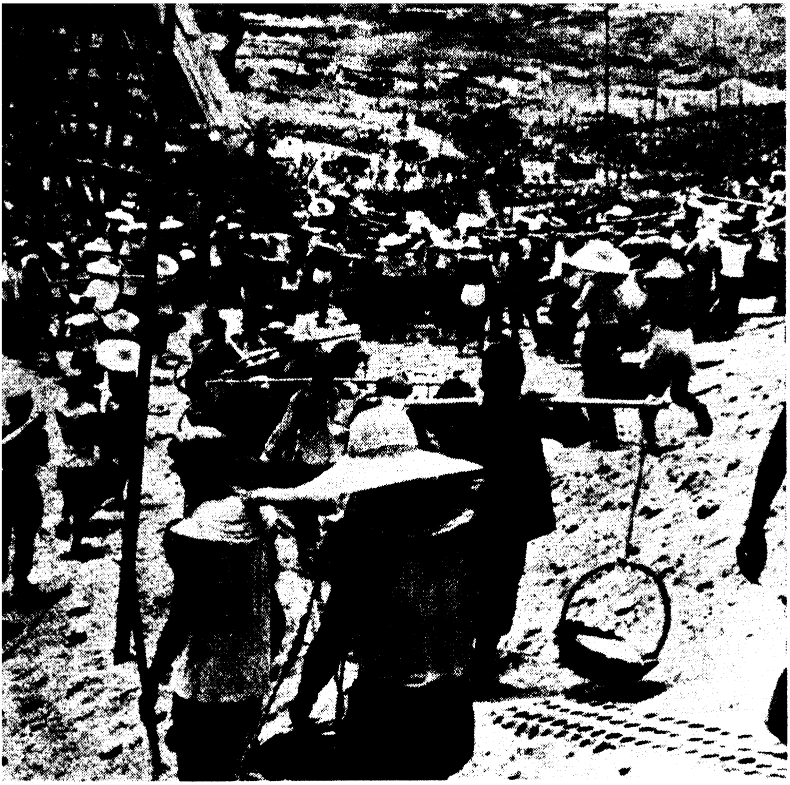

সমবেত প্রচেষ্টায় নদীতে বাঁধ দিচ্ছে

লঙ্‌ মার্চের লাল ফৌজ

কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের সময় মাও

২৬ বৎসর বয়সে মাও

মাও সে-তুং ও ক্রুশ্চেভ

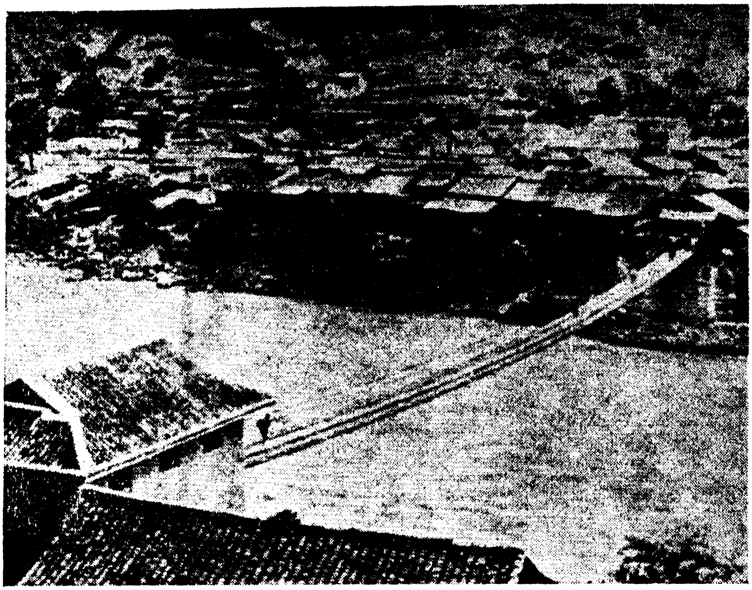

তাতুর নদীর সেতু—লঙ্ মার্চের সময় এইখানেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়

তাচাই অনুর্বর ভূমি

মাও সে-তুং ও হো-চি-মিন

আমেরিকা ও এশিয়ার লেখকদের সঙ্গে মাও

মাও সে-তুং ও জেনারেল চু টে

অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাও

মসকো প্রত্যাগত চৌ এন-লাইকে মাও অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন

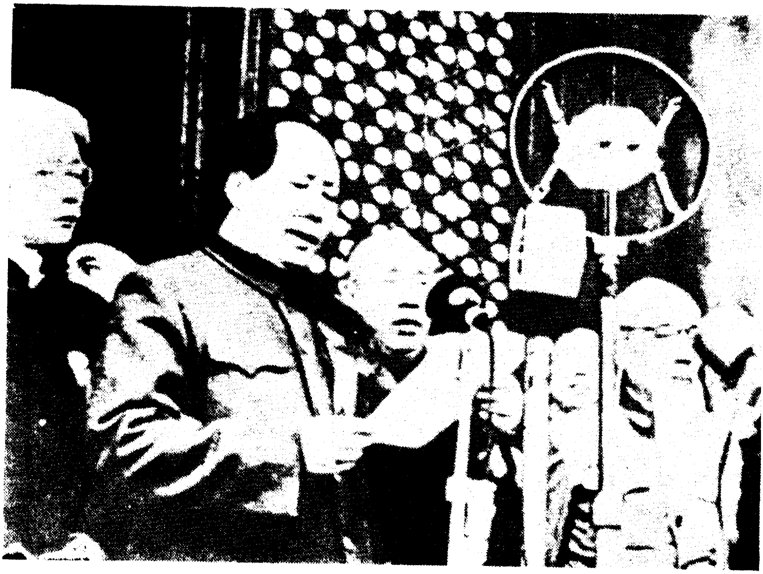

চীনা প্রজাতন্ত্র ঘোষণায় মাও

ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে মাও সে-তুং

আজ বড়ই শীত। আকাশ বেশ পরিষ্কার, বাতাসে হিমের কাঁপুনি। দক্ষিণের পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হিমেল হাওয়া শোঁ-শোঁ শব্দ করতে করতে ছুটে এসে হাত-পা জমিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই গ্রাম নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর দেখা নেই বাইরে।

খড়-কুটো কুড়িয়ে এনে মাটির গামলায় আগুন জ্বেলেছে মাও পরিবারের কর্তা। গরম করে রাখতে চায় তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রীকে। মাও পরিবারের সবাই ব্যস্ত। ব্যথা-কাতর আসন্ন প্রসবা মাও-গৃহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে সবাই। পরিবারের কর্তাও দেখছে, দেখেই মুখ নীচু করছে। নিজেই আগুনে ফুঁ দিয়ে গরম করে তুলছে ঘরটা, আলোর শিখায় মাও-গৃহিণীর ব্যথা-কাতর মুখখানা কেমন বীভৎস মনে হচ্ছিল। গৃহকর্তা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিল, খুব কষ্ট হচ্ছে ?

যন্ত্রণা-কাতর নারী পাশ ফিরে শুচ্ছে, মুখে তার শব্দ নেই।

শব্দ বের করার উপায়ও নেই। সামাজিক শাসনে অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করতে হয় সে দেশের নারীদের। প্রসব যন্ত্রণা-কাতর মায়েদের তো আর গত্যন্তর নেই নীরবে সহ্য করা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম নেই। যন্ত্রণায় শিউড়ে উঠছে মাঝে মাঝে, আবার পাশ ফিরে শুয়ে যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে চাইছে। বোধহয় যন্ত্রণাকে অনুভব করার মত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল তার স্নায়ুতন্ত্রী।

সকালবেলা অবধি গরীব কৃষক ঘরের বউকে কাজ করতে হয়েছে। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করতে হয়েছে সকালের শীতে কাঁপতে কাঁপতে। গরুকে মাঠে বেঁধে দিয়ে এসেছে খোলা রোদে। পরিবারের সবাইয়ের

খাবার ব্যবস্থা করেছে নিঃশব্দে। যন্ত্রণা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে, মুখ বুঁজে সহ্য করেছে, শুধু একবার স্বামীকে ডেকে বলেছে, সময় হয়েছে।

পরিবারের কর্তা ঠিক বুঝতে পারেনি তার কথা। জানতে চাইল, কিসের সময়?

শিশু জন্মাবে।

বাস্। এই পর্যন্ত। এর বেশি কোন কথা বলেনি, বলার প্রয়োজনও বোধহয় ছিল না।

সেদিনই অবসান হল যন্ত্রণার।

ডিসেম্বরের সেই কঠিন শীতে নবকুমারকে কোলে পেল কৃষক বধূ।

বাইরের খুপরী ঘরটায় অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল পরিবারের কর্তা। মাঝে মাঝে খবর নিতে হাজির হচ্ছিল প্রসবাগারের সামনে, আবার এসে বসছিল তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে। এমন সময় দাই এসে খবর দিল, তোমার ছেলে হয়েছে গো কর্তা। এবার মেঠাই আনাও, সবাইয়ের মুখমিষ্টি কর। ছেলে নয়, স্বয়ং তথাগত।

মাও-কর্তা উৎফুল্ল হল। তখনই মনে পড়ল তার স্ত্রীর করুণ মুখখানি। প্রশ্ন করল, বউ কেমন আছে দাই?

ভালই আছে গো, ভালই আছে। তোমার বউ খুব বেশি কষ্ট পায়নি। সেই যে লি-লি সুং, তার বউ যা কষ্ট পেয়েছিল। বাপ্‌রে। তবে খুব শক্ত মেয়ে তোমার বউ। আর ভাল থাকবেই বা না কেন! সুন-লি'র হাতে চ্যাংসার কয়েক শ' মেয়ে ছেলের মুখ দেখল। কেউ বলতে পারবে সুন-লি'র হাতে কেউ কষ্ট পেয়েছে। আগেই সব বদ-হাওয়া দৈত্য-দানা মন্ত্র দিয়ে বশ করেছি গো। কার সাধ্য খারাপ করার। বখশীশটা কিন্তু পুরো চাই।

হাসল গৃহকর্তা।

বলল, আমি যে বড় গরীব।

দাই বাধা দিয়ে বলল, এই ছেলে হল তোমার সাত রাজার ধন এক মানিক। মা ছেলেকে কোলে নিলেই তোমার কপাল খুলে যাবে। ভাবছ কেন কর্তা। দেখবে বছর না ঘুরতে তোমার মরাই ধানে-গমে ভর্তি হয়ে যাবে, ঘরে তোমার লক্ষ্মী বাঁধা থাকবে।

তাই হোক, তখন তোমায় খুশী করব।

তা বললে হবে না বাপু। আমার নগদ নগদ বিদায় চাই।

সারাদিন খেতের কাজ করে গৃহকর্তা ছিল ক্লান্ত। বাড়িতে এসে স্ত্রীর অবস্থা দেখে বেশ কিছুটা ঘাবরেও গিয়েছিল। দেহ ক্লান্ত, মন অশান্ত ছিল এতক্ষণ। খবর শুনে খুশী হয়েছিল খুব-ই। সন্তান, বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্ম সংবাদ পেয়ে এর মধ্যেই ভুলে গেল দেহের ও মনের ক্লান্তি। দাইকে সন্তুষ্ট করতে বলল, হবে হবে। এবার যদি ফসল পাই প্রয়োজন মত তা হলে আগামী মরশুমে তোমাকে সিকি মউ* জমি দেব ঘর করতে। সারা জীবন তো পরের কুঁড়েতে দিন কাটালে এবারে নিজের ঘরদোর হবে।

দাই ক্ষুব্ধ ভাবে বলল, ঠাট্টা করছ কর্তা। পেটে ভাত নেই, জমি দিয়ে কি করব। বয়স এখন ভাটির টানে। ক' দিনই বা বাঁচব। দু বেলা দুটো খেতে পেলেই যথেষ্ট। তোমার জোয়ান বয়স। জমি থাকলেই তুমি বাঁচবে, তোমার ছেলে মেয়ে বাঁচবে, আমি তো জমি গলায় বেঁধে কবরে শোব না। আমি দুটো খেতে চাই। সিকি পিকুল** ধান পেলেই খুশী হব, তার বেশি আশাও করি না।

অত ধান কোথায় পাব দাই। সিকির অর্ধেক ধান দেব। এখন কিছুটা, আবার ফসল উঠলে বাকিটা।

* এক মউ = আধ বিঘার কিছু কম জমি।

** এক পিকুল = দেড় মণের কিছু বেশি।

তাই দিও বাপু। তোমার ছেলে বেঁচে থাকলে আমাদের কি দুঃখ থাকবে! তখন বুঝে নেব।

দাইকে বিদায় করে কর্তা ছুটল পূর্বপুরুষদের কবরখানায়।

মোমবাতি জ্বেলে, লাল ফানুস উড়িয়ে তার নবজাতকের জন্য মঙ্গল কামনা করল। হাত জোড় করে কবরখানায় তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো। চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ বসে রইল সেখানে। ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেল গ্রামের জ্যোতিষের কাছে নবজাতকের ভাগ্য গণনা করাতে।

ভাগ্য!

কাগজে তুলি দিয়ে ঘর এঁকে, অঙ্ক কষে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষ যা বলল তাতে খুশী হতে পারল না কৃষক কর্তা। মনে মনে বিরক্তি ও ভয় নিয়ে ঘরে ফিরে এল। ভবিষ্যতে এই শিশুকে নিয়ে কেন যে বিব্রত হতে হবে তা ভেবে ঠিক করতে পারল না।

একবার শিশুটির মুখ দেখার প্রবল বাসনা জাগল তার মনে। সাহস করে প্রসবাগারের সামনে যেতে পারছিল না। বাইরে ঘুরে এসে হাত-পা যেন তার জমে থাকার উপক্রম। তাড়াতাড়ি উনুনের পাশে গিয়ে বসল দেহটাকে গরম করতে। হাত-পা গরম হতেই আবার মনে জাগল সন্তান দেখার ইচ্ছা।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল প্রসবাগারের দিকে। দরজা সামান্য ঠেলে ফাঁক করল। উঁকি দিয়ে দেখল শিশু তখন মায়ের বুকের উষ্ণতা পেয়ে অসারে ঘুমোচ্ছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে তার মুখখানা ভাল করে দেখতেও পেল না। তবুও নিশ্চিন্ত হল। শান্ত হল তার মন। শিশুকে কেন যে জ্যোতিষ গৃহের আপদ বলল তা ভেবেও পেল না। এমন শিশুকে কি করে আপদ মনে করবে! আশ্চর্য!

আবার চুপি চুপি ফিরে এসে বসল তার খুপরীতে।

সারা রাত বসে বসেই কেটে গেল। মাঝে মাঝে ঝিমুনি এসেছে, শীতের প্রচণ্ডতায় জরসর হয়ে বসতে হয়েছে। হাতের কাছে কাঁথা থাকতেও তা টেনে নিয়ে গায়ে দিতেও ভুলে গেল।

বড়ই হিসেবী এই গৃহকর্তা। উচ্চাশাও তার কম নয়। সামান্য কয়েক মউ জমির ফসল সঞ্চয় করে সেবারের দুর্ভিক্ষের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করল।

গৃহকর্তা গেল গ্রামের জমিদারের কাছে।

নজরানা দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিবেদন করল, হুজুর আপনার ঐ নালার ধারের তিন মউ জমি আমাকে দিন।

চণ্ডুর নল থেকে মুখ তুলে জমিদার বলল, অত জমি নিয়ে কি করবি ?

হুজুর। আমি গরীব মানুষ ছাপোষা। আমার জমির ফসলে পেট ভরে না, আর তিন চার মউ জমি পেলে ছেলে মেয়েরা খেয়ে বাঁচবে হুজুর। তাই আবেদন জানাতে এসেছি।

ও জমিটা দিতে পারব না হে মাও। পাহাড়ের ঐ দিকটায় কিছু জমি আছে তা থেকে তোকে তিন মউ জমি দিতে পারি। নিতে হলে সদর কাচারিতে যা। আমি হুকুমনামা লিখে দেব।

তা হুজুরের যা ইচ্ছা। তবে একটু বেশি দাম দিয়েও যদি নালার ধারের ঐ জমিটা পেতাম তা হলে খুবই উপকার হতো।

আসছে বছর দেখব। এ বছর হবে না। যা পেলি খাসের জমি তা নিয়েই খুশী হ'।

সেলাম করে গৃহকর্তার কথা মত সদরে গেল জমির পাট্টা নিতে।

আকাশ সেবার বড়ই সদয়। সময় মত বৃষ্টি নামল। সস্ত্রীক গৃহকর্তা গেল জমিতে, ক্ষেত মজুরদের ডেকে নিল সঙ্গে। সারা দিন পরিশ্রম করল তারা। তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হলনা। বছর শেষে ফসল তুলল ঘরে মনের আনন্দে।

ধান মাড়াই হল; মড়াই বাঁধা হল।

শস্যের দাম সেবার খুব কম হলেও সারা বছরের খাবার রেখেও প্রচুর শস্য রয়ে গেল বিক্রির জন্য।

শহরের গোলদারদের কাছে শস্য বিক্রি করে এবারও কিছু নগদ কড়ি সংগ্রহ হল। আবার ছুটে গেল জমিদারের কাছে। আগের মতই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জমির জন্য আবেদন জানাল।

এবারও তিন মউ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ঘরে ফিরল গৃহকর্তা।

শিশু বড় হয়েছে। গত বছর শিশুকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে মাও বধূ মাঠে যেত। যখন কাজ করত তখন শিশু থাকত তার পিঠের সঙ্গে জাপটে। এবার আর তা করতে হয় না। শিশুকে মাঠের ধারে বসিয়ে স্বামী-স্ত্রী ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে কাজ করছে। শিশু মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে উঠে বসে। ধূলো বালি মাখা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করত, চুমুতে চুমুতে শিশুর সোনালী হাসিকে সম্পূর্ণতা দিত। শিশুর মুখের হাসি দেখে সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে যায় কৃষক দম্পতি।

শিশু বড় হতে থাকে।

সবাই বলল, সে-তুংকে পাঠশালায় দাও মাও কর্তা।

গৃহকর্তা হেসে বলল, ছেলে কি আমার লাটসাহেব হবে। ওভাবে অর্থনাশ করতে পারব না। একটা দোকান করেছি, সেটা দেখতে পারছিনা, জমি দেখার লোক নেই। এবার ছেলেকে জমির কাজে পাঠাব মনে করেছি।

ছ বছরের ছেলে। তাকে মাঠে পাঠাবে কি হে। বড় হতে দাও।

এখন থেকে জমিতে না গেলে কাজ শিখবে কি করে। বড় হলে ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে মোটেই কাজ করতে চাইবে না। তার চেয়ে এখন নিজেদের কাজ বুঝে নিক।

সত্যিই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গৃহকর্তা গেল মাঠে। সেদিন থেকে

শিশুর শিক্ষা শুরু হল। কঠিন চাষের কাজ করতে না হলেও ছোট ছোট কাজ করতে হতো, সাহায্য করতে হতো বাবাকে ও অন্যান্য ক্ষেত মজুরদের। শিশু মাও মাথায় করে ভাতের গামলা নিয়ে যেত মাঠে, কখনও গরু তাড়া করে ছুটত মাঠের আইল ধরে। এই কাজের ফাঁকে খোলা আকাশের দিকে আনমনা হয়ে চেয়ে দেখত, উদাসভাবে চেয়ে থাকত বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের দিকে, কখনও নিজের মনেই গুন গুন করে গান গাইতো বেসুরে। সময় পেলেই ছোট ছোট সঙ্গীদের সঙ্গে ছুটোছুটি করত। মায়ের কোল থেকে ছোট ভাইকে টেনে নিজের কোলে নিয়ে আদর করত।

এমনি করে আরও দুটো বছর কেটে গেল।

মাও পরিবারেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। আরও কয়েক মউ জমি কিনেছে গৃহকর্তা। তার মুদীখানা দোকানটাও বেশ ভাল ভাবেই চলছে। অভাবের তাড়না নেই, উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে বেশ কিছু নগদ পয়সাও করেছে। আরও কিছু চাই, এই স্পৃহা তার মনে। এদিকে ভয়ও কম নয়। হোনান প্রদেশে ডাকাতের খুব উৎপাত। স্থানীয় গভর্ণর তার সৈন্য নিয়ে সামলাতে পারেনা, কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীও নাজেহাল। ডাকাতদের খুব সুবিধা। প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের সাহায্য করে খুব। সরকারী সৈন্যদের দেখলেই তারা পাহাড়ের ভেতর এমন ভাবে আত্মগোপন করে যার ফলে তাদের খুঁজে বের করা মোটেই সম্ভব হয় না। তার ওপর নদী নালার দেশ, বনজঙ্গলেরও অভাব নেই, দেশের সাধারণ মানুষ যেমন পরিশ্রমী তেমনি জঙ্গী। তাই সম্পন্ন চাষীদের ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতে হয়। জমিদাররা রাতদিন পাহারা রাখে, বন্দুক না হলে সম্পদ রক্ষা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। মাও কর্তার জমি, ফসল আর অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পরিবারের কর্তা টাকা চেনে, কেতাবের অক্ষর ভালভাবে চেনে না, অথচ তার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাব রাখতে প্রাণান্ত।

নিজের সঞ্চয়ের কথা বলতেও পারে না অপরকে, বাইরের লোকের ওপর ভরসা করে হিসাবের দায়িত্বও দিতে পারে না। মুখে মুখে হিসাব আর পকেটে পকেটে তহবিল রাখায় বিপদও অনেক। অনেক ভেবে চিন্তে গৃহকর্তা স্থির করল ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাবে লেখাপড়া শিখতে। তিন চার বছর পাঠশালায় পড়াতে পারলে মোটামুটি হিসাব রাখতে পারবে তার ছেলে। এর বেশি আর কি দরকারই বা আছে। মনে মনে যুক্তি বুদ্ধি স্থির করে একদিন স্ত্রীকে ডেকে বলল, তোমার ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাব মনে করেছি।

কৃষক বধূ বলল, পাঠশালায় কেন ?

তাও জানো না, লেখাপড়া শিখতে।

কি লাভ ?

দেখছ তো কাজকর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাবছি ধান চালের আড়তদারী করব। কিন্তু লেখাপড়া জানা লোক না হলে কি করে হিসাব রাখব। আমার যা বিদ্যা তাতো জানই। কোন রকমে তুলি টেনে হিসাব রাখি, তাও কত যে ভুল হয় তা তো জান না।

কৃষক বধূ নির্বিকার ভাবে বলল, আমি আর কি বলব। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি তো তুলির আঁচড় দিতে জানি না, লেখাপড়ার কি বুঝব বল। তোমরাই ভাল বোঝ। ভগবান অমিতাভ আমার ছেলেকে দীর্ঘায়ু করুক।

কিছুক্ষণ থেমে বলল, লেখাপড়া শিখে হিসাব রেখে কি হবে !

বিরক্তির সঙ্গে গৃহকর্তা বলল, তোমার মত বোকা মেয়েমানুষ কখনও দেখিনি। বললাম যে আমার ভাগ্য খুলেছে, তার হিসাব রাখতে হবে, তোমাকেও কিছু ধর্মকেতাব পড়ে শোনাবে। এখন তো আর আমি গরীব চাষী নই। আরও বড় কিছু আশা করছি। নিশ্চয়ই তাতে তোমার মত আছে। সব ভেবে চিন্তেই বলছি।

কৃষক বধূ সম্মতি জানিয়েও বলল, লেখাপড়া শিখলে ছেলে যদি

পূর্বপুরুষদের সম্মান না করে, অমিতাভকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করে তা হলে কি হবে বলত!

কি যে বল। আমাদের দেশে ওরকম কোন কালে হয়নি, হতেই পারে না। আমাদের গৌরব হল অতীত। অতীতকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি বলেই আমরা বেঁচে আছি। পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা, পূর্বপুরুষদের পূজা করা—এসব রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কখনও তা হতে পারে না। তুমি ভয় পেও না।

না হলেই ভাল। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমার কিন্তু ভয় আছে। শেষে ছেলে যদি বিগড়ে যায়!

তোমাকে জিজ্ঞেস করাই ঝক্‌মারি। যাও তোমার নিজের কাজে। আমি বুঝে নেব ছেলের সঙ্গে।

কৃষক বধূ নিজের কাজে চলে গেল। গৃহকর্তা চাকরকে পাঠাল ছেলেকে ডেকে আনতে।

আট বছরের ছেলে যতটা হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উচিত অতটা সে নয়। বাবা ডেকে পাঠালেই সেই অপুষ্ট ছেলেটি ভয়ে শিঁটকে যেত। বাবার ডাক শুনে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল। চোখে মুখে ভীতির চিহ্ন। কি জানি কোথাও কোন অন্যায় বোধহয় সে করেছে, নইলে অসময়ে কেন ডাকবে তাকে।

সোজাসুজি গৃহকর্তা বলল, তোকে পাঠশালায় যেতে হবে।

থতমত খেয়ে কিশোর পুত্র বলল, আচ্ছা।

কেন যাবি?

তা, তা, জানি না। পণ্ডিতমশায়কে ডেকে আনব বাবা?

হতভাগা ছেলে, ধমকে উঠল তার বাবা।

তা হলে কাকে ডাকতে হবে?

মরল গিয়ে। ডাকতে হবে না কাউকেই। পাঠশালায় তুই যাবি লেখাপড়া শিখতে।

মাথার বেনীটি দুলিয়ে ছেলেটি উৎসাহিত ভাবে বলল, আচ্ছা।

দাঁত খিঁচিয়ে গৃহকর্তা বলল, আচ্ছা। লেখাপড়া শিখতে হলে কেতাব চাই, কাগজ চাই, কালি চাই, তুলি চাই। সে সব জানিস।

কিশোরের উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গেল দাঁত খিঁচুনিতে। কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাবার সামনে।

আজকেই চল। তোকে পাঠশালায় দিয়ে আসি। পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলেও আসতে পারব। নে চল।

এখুনি।

হ্যাঁ এখুনি।

মাকে বলে আসি আর জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।

ঠিকই বলেছিস। যা তোর মাকে বলে আয়। একটা কুর্তাও গায়ে দিয়ে আয়।

পিতার আদেশ শিরোধার্য।

মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে একটা রঙীন জামা গায়ে দিয়ে বেনী দোলাতে দোলাতে কিশোর তার বাবার পিছু পিছু চলল পাঠশালায় ভর্তি হতে।

অনেকটা পথ হেঁটে তবেই পাঠশালা।

পণ্ডিতমশায় তখন লগুড় হস্তে ঝিমোচ্ছেন। মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীর কলকাকলি থামাতে হুঙ্কার দিচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পণ্ডিতমশায়ের দিকে পিঠ রেখে দেওয়ালের দিকে মুখ করে প্রাচীন কালের কোন একটা কবিতা আবৃত্তি করছিল। মাওকর্তা ও তার ছেলে ঘরে ঢুকতেই পড়ুয়াদের চিৎকার গেল থেমে। পণ্ডিতের ঝিমুনিও কাটল।

মাওকর্তা চিৎকার করে ডাকল, শুনছ পণ্ডিত।

পণ্ডিতমশায় কৃষককে ভাল করেই চেনে। গ্রামের এই অবস্থাপন্ন কৃষকের দ্বারস্থ হতে হয় অনেকেরই তাই অচেনা নয়, বলতে গেলে সবাই সমীহ করে চলে মাওকর্তাকে।

পণ্ডিতমশায় ভাল করে তাকিয়েই ধরমর করে আসন থেকে উঠে

দাঁড়াল। তার হাত থেকে লাঠিখানাও পড়ে গেল। বিনীত ভাবে বলল, তুমি এসেছ কর্তা। আরে বসতে দে। তারপর কি খবর ?

আমার এই ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে পণ্ডিত।

তা আর বলতে। তুমি হুকুম করলে শেখাতেই হবে। এই খোকা রোজ আসবি। তোকে লেখাপড়া শেখাব। কেমন ? আর এই কথা বলতে কেনই বা তুমি এলে কর্তা, আমাকে ডাকলেই তোমার ঘরে যেতাম। তোমার ছেলেকে ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে আসতাম। হেঁ-হেঁ, একি যে সে লোকের ছেলে, খাস মাও পরিবারের ছেলে। ছেলে তোমার মানুষ করে দেব। কত গাধা গরু চড়ালাম, এতো তোমার ছেলে। হেঁ-হেঁ। কিরে আসবি তো কাল থেকে ?

কিশোর ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। পণ্ডিতের লাঠির দিকে তার নজর। লাঠি নামক বস্তুর সঙ্গে তার খুবই পরিচয়।

তা নাম ঠিকানা যা লিখতে হয় লিখে নাও পণ্ডিত। রোজ তো আমি আসতে পারব না তাতো বুঝতেই পারছ।

তা আর বলতে।

পণ্ডিত খাতা বের করে কালি ও তুলি হাতে তুলে নিল, বলল, কি নাম রে তোর ?

ভয়ে ভয়ে ছেলে তার নাম বলল।

তোর কথাই বুঝতে পারছি না। ভাল করে বল। ভয় কিসের। যারা পড়ে না, সহবত শেখে না তারা ভয় পায়।

ছেলের জিব তখন আরষ্ট, কোন রকমে বলল, মাও সে-তুং।

মাও সে-তুং। বেশ নাম তো। তোর বয়স কত রে ?

ছেলে তার বাবার মুখের দিকে তাকাল। বয়স যে কত তা তার জানা নেই।

বয়স ? মাওকর্তা হিসাব করতে লাগল।

এই শীত দিয়ে আটটা শীত কেটেছে, ওর জন্ম পত্রিকা একটা

আছে। পাঠিয়ে দেব দেখে নিও পণ্ডিত। তবে সালটা হল নতুন জমানার সাত বছর আগে। ঠিক বছরের শেষ মাসে জন্ম।

পণ্ডিত হিসাব করে লিখল, আটারশত তিরানব্বই সালের ডিসেম্বর। তারিখ লিখল ছাব্বিশ।

বয়সটা পড়ে শোনাতেই মাওকর্তা মাথা নেড়ে বলল, ঠিক লিখেছ পণ্ডিত। তোমাদের অঙ্কে কি ভুল হয়। তাও তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব ওর জন্মপত্রিকা।

তুলি দিয়ে কাগজে আঁচড় দিলো পণ্ডিতমশায়। মাও অবাক হয়ে দেখছিল। তুলির আঁচড়ে পণ্ডিতমশায় বয়স ঠিক করল, তুলির আঁচড়ে তার বংশ পরিচয় লিখল। আশ্চর্য ক্ষমতা ঐ তুলির। লেখাপড়া মানেই তুলি দিয়ে দাগ কাটতে শেখা। বাপ্‌রে তুলির ক্ষমতা!

পণ্ডিতমশায় তোষামোদী গলায় বলল, তা কর্তা তোমার ছেলের মাথায় তেলটেল একেবারে দাওনা কেন?

কি যে বল পণ্ডিত। ছেলে বড়ই একগুঁয়ে। কোন কথাই শুনতে চায় না সহজে।

লক্ষণ তো ভাল নয় কর্তা। ছেলের ধর্ম বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা। তা যদি না করে লেখাপড়া শিখে কি হবে। একটু সাবধান হওয়া দরকার। কাপড় জামাও তো বেশ ময়লা, মাথার বেনীতে বোধহয় উকুনে বাসা করেছে। এদিকে তোমরা একটু নজর দিও, আমরা লেখাপড়াটাই শেখাতে পারি। বাড়ির কাজ তো শেখাতে পারি না।

ছেলেটা একটা বাঁদর। পয়সা থাকলে কি হবে, ওকে মানুষ করাই মুস্কিল।

মোটেই মুস্কিল নয়। মানুষ করে দেব। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া পিটিয়ে মানুষ করলাম, আর তোমার ছেলেকে মানুষ করতে পারব না, এ কি কথা বলছ কর্তা। এই সে-তুং, দেখেছিস

এই লাঠি। বুঝবি বাছাধন যদি বাঁদরামি করিস। পড়াশোনা না করলে এই একটা লাঠি তোর পিঠে চারটে হবে। তবে যদি পড়াশোনা করিস, সহবত শিখিস তা হলে তো তুই আমাদের মাথার মণি।

মাও সে-তুং তখন ভয়ে আরষ্ট হয়ে গেছে। কোন রকমে শুকনো গলায় বলতে চেষ্টা করল 'হাঁ' কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। তার ছোট্ট পা দুখানা মাঝে মাঝেই ভয়ে কেঁপে উঠছে।

সেদিন বাবার হাত ধরে পাঠশালা থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এই নতুন পড়ুয়া। পণ্ডিতমশায়ের উগ্রমূর্তি আর তার লগুড় কোনটাই তাকে যে পাঠে আগ্রহশীল করেনি তা বুঝতে বিশেষ দেরী হলনা তার মায়ের।

বাড়ি ফিরে এসেই মায়ের কামিজ চেপে ধরে বলল, আমি পড়বনা মা।

কৃষকগিন্নী ভাল করে বুঝতে না পেরে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, কেন?

আমার ভয় করছে। মাঠের কাজ অনেক ভাল মা।

ভাল তো নিশ্চয়ই কিন্তু কিসের ভয়?

পণ্ডিতের চোখ দুটো পাকা লঙ্কার মত টক্‌টকে লাল।

তাতে তোর কি?

বোধহয় আফিম খায়।

গুরুজনদের সম্বন্ধে ওসব বলতে নেই। তুই যাবি লেখাপড়া শিখতে। লাল চোখ দেখে অমন ভয় পেতে নেই।

কিন্তু লাঠি!

লাঠি। কেন?

পড়া না পারলেই সপাং, আমার লেখাপড়া শিখে কাজ নেই মা। আমি মাঠেই যাব।

চিন্তিত ভাবে কৃষকগিন্নী বলল, আসুক তোর বাবা। তাকে জিজ্ঞেস করছি। আর যদি ঐ হাড়হাভাতে পণ্ডিত তোকে মারে তা হলে তার সঙ্গে আমি বুঝাপড়া করে নেব। আমি বেঁচে থাকতে তোর কোন ভয় নেই। আমি গিয়ে বলে আসছি।

না, না। তোমাকে যেতে হবে না। পণ্ডিতমশায় রাগ করলে আর রক্ষে নেই।

সে সব আমি বুঝব। আমি তোকে দিয়ে আসব, নিয়ে আসব।

মায়ের হাত ধরে যাওয়া যে বেশ নিরাপদ তা বুঝেই মাও সে-তুং বলল, বেশ। তোমাকে কিন্তু যেতে হবে রোজই।

যাব রে যাব। তোর ভাই সে-নিম, সে-তান আর বোন সে-হুং কে নিয়েই তো কষ্ট। ওদের সামলাতে সামলাতে হয়রাণ হয়ে যেতে হয়। এখন চল মন্দিরে। তথাগত অমিতাভের কাছে প্রার্থনা জানাবি চল। সব সময় তথাগতের ওপর বিশ্বাস রাখবি, দেখবি কোন কষ্ট হবে না। ভগবান বুদ্ধ মানুষের দুঃখমোচন করতে এসেছিলেন। জানিস সে-তুং, যখন আমার বিয়ে হল তখন দুবেলা খাবার জুটত না আমাদের। আমরা তথাগতকে আশ্রয় করেই এতটা পথ এগিয়েছি। কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম শুধু তাঁর চরণ ভরসা করে। তাঁর ওপর আস্থা আমাদের অসীম। সেই আস্থা আজও অটুট রয়েছে। তাই আমাদের দুঃখ আজ আর নেই।

মাও সে-তুং চোখ বুঁজে তথাগতের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলল, হাঁ মা তথাগত আমাদের কে ?

মন্দিরে আসছিস তাও জানিস না তুই।

বারে, তুমি শুধু ভগবান তথাগত বলেই তো ডেকে নিয়ে আসছ, কোনদিন তো বলনি তথাগত আমাদের কে হন ?

তাও জানিস না বোকা। ভারতবর্ষের নাম শুনেছিস ?

তা শুনেছি। কোথায় সে দেশ ?

আমাদের দেশের দক্ষিণে পাহাড় পেরিয়ে গেলেই ভারতবর্ষ। সেখানে রাজার ঘরে জন্মেছিলেন ভগবান বুদ্ধদেব। লোকের দুঃখ, দারিদ্র্য, মৃত্যু, জরা এসব দেখে বড়ই কষ্ট হল তাঁর মনে। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে মানুষের দুঃখ দুর্দশার শেষ হয়, কি করলে মানুষ জরা-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন। তাই তাঁকে লোকে বলল, বুদ্ধ বা জ্ঞানী। দেহের অবসানই হল দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায়। আর যদি পুনর্জন্ম না হয় তা হলেই নির্বান, চির শান্তি। আমাদের আশে পাশে কত দুঃখ তাতো দেখছিস। সবাই ভগবান তথাগতের আশ্রয় নিলে তবেই নির্বান। তবেই শান্তি।

অবাক হয়ে গেল মাও সে-তুং।

কিন্তু মা!

আবার কিন্তু কিসের।

বড়লোকরা যদি গরীবদের মধ্যে তাদের খাবার বিলিয়ে দেয় তা হলে তো কোন কষ্ট থাকে না। আমাদের লুসি পীসির তো খুব কষ্ট। তুমিই তো কিছু কিছু দিয়ে তার কষ্ট কমাতে চেষ্টা করছ। বড় বড় লোকরা এই ভাবে দিলেই তো মানুষের কষ্ট থাকবে না।

তা কি দেয় সবাই। নিজের টুকু কম করে অন্যকে দিতে চায়না কেউ-ই। তাইতো ভগবান অমিতাভ তথাগত বুদ্ধের আশ্রয় নিতে হয়।

মাও সে-তুং ঠিক বুঝলনা তার মায়ের কথা। সে যেমন সোজা ভাবে বুঝেছে তার মা কেন বুঝতে চাইছে না তা ভেবেই পেল না।

মায়ের হাত ধরে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে, যেতে যেতে তার মা বলল, আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের রক্ষা করেন। যিনি তা করেন তিনি হলেন ভগবান বুদ্ধদেব। রাজার ছেলে

হয়েও কোন বস্তুতে তাঁর কোন স্পৃহা ছিল না। তাঁর অনুশাসন মানলে তাঁরই মত মহানির্বান লাভ করতে পারব আমরাও।

মহানির্বান কি মা?

আগে যে বললাম দেহ থাকলেই দুঃখ। দেহ না থাকলে আর কিসের দুঃখ। তাই দেহের লয় চাই। আর যাতে জন্ম নিতে না হয় তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। তারপর যে দেহের লয় তাতেই মহানির্বান।

আমরা মরলে আবার কে জন্ম নেবে।

আমাদের দেহ মরে, আত্মা তো মরে না। তাই আত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আবার জন্ম হবে।

কি যে বল। দেহ না থাকলে আবার আত্মা কোথায় থাকে?

ওসব বলতে নেই বাবা।

তোমার কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছে কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। দেহ থাকলে দুঃখ। তা তো সবারই থাকে। মরতে হবে কেন!

ওসব তুই বুঝবি না। যখন বড় হবি তখন বুঝবি। মা-বাবার কথা বিশ্বাস করতে হয়। কখনও মা-বাবার অবাধ্য হতে হয় না। তা হলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।

আবার সন্ধ্যা বেলায় মন্দিরে হাজির হল ছেলের হাত ধরে।

হাঁটু গেড়ে বসল তথাগতের মূর্তির সামনে। মা হাত জোড় করে বলল, আমার ছেলের মঙ্গল কর প্রভু, আমার ছেলের সুমতি হোক, সে যেন মানুষের মত মানুষ হয়।

শিশুও হাত জোড় করে বলল, আমার মায়ের দুঃখ কমাও প্রভু। আমাকে মানুষের মত মানুষ কর প্রভু।

মা বলল, আমার ছেলে বিদ্বান হোক। হিসাব শিখুক। সংসারের দুঃখ লাঘব করুক।

শিশু বলল, আমার মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রভু।

প্রার্থনা শেষ করে মায়ের হাত ধরে মাও আবার ফিরে এল বাড়িতে।

তার বাবা ইতিমধ্যে কাগজ বই কালি তুলি কিনে এনেছে ছেলের পড়ার ব্যবস্থা করতে।

উঃ কি আনন্দ!

নতুন বই। নতুন কাগজ। নতুন তুলি। নতুন দোয়াত। শিশু মাও ভাবছে, তার পণ্ডিতমশায়ের মত সে-ও তুলির টানে মনের কথা লিখতে পারবে কাগজে। কি মজাই না হবে। মাকে আশ্চর্য করে দেবে সে কাগজে তুলির টান দিয়ে, বাবাকে খুশী করবে বয়স হিসাব করার মত অঙ্কের হিসাব কষে। আর সে গর্বভরা দৃষ্টিতে তাকাবে যারা লেখাপড়া শেখেনা তাদের দিকে।

বই-খাতা নিয়ে ছুটে গেল মন্দিরে। দেবতার পায়ে বই ছুঁইয়ে পূর্বপুরুষদের কবরখানায় নমস্কার জানিয়ে ফিরে এল শিশু মাও সে-তুং।

ফিরে আসতেই মা জিজ্ঞেস করল, রাতের বেলায় কোথায় গিয়েছিলি সে-তুং?

মন্দিরে আর কবরখানায়। নতুন বইপত্তর ভগবানের পায়ে ছুঁইয়ে এসেছি মা। কবরখানায় নমস্কার করেও এসেছি।

আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে মা বলল, তুই তো আমার ভাল ছেলে।

বুকের সঙ্গে ছেলেকে জাপটে ধরে চুমু খেল তার কপালে।

পাশের ঘরে কোলের শিশুটা কেঁদে উঠতেই বড় ছেলেকে আদর করা বন্ধ করে ছুটে গেল পাশের ঘরে।

বাবাও নির্দেশ দিয়েছে, পড়বে কাজও করবে মাঠে।

কাজ পড়া, পড়া কাজ।

সকাল বেলায় হাঁড়ি ভর্তি ভাত তরকারী নিয়ে মাঠে যেতে হয়, দুপুরে স্কুলে যেতে হয়, রাতে চর্বির বাতি জ্বেলে পড়তে বসতে হয়। বিকেলেও খেলার অবসর নেই, খামারে বসে বসে শস্যের ওজন দেখতে

হয়। সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্তিতে যখন চোখ বুঁজে আসে তখন পাঠশালার পড়া তৈরী না করে উপায় নেই। পণ্ডিতমশায়ের সেই লগুড়টির কথা মনে পড়লেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। বাড়িতে পড়া দেখিয়ে দেবার লোক নেই, পাঠশালায় পণ্ডিতমশায়ের লাঠি বিনা অন্য কোন পাঠ্যবস্তু দানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। বাবার কাছে বই নিয়ে গেলে কোন রকমে দুচারটে শব্দ শিখিয়ে বিদায় দেয়। তখন বাবাও ক্লান্ত। পণ্ডিতমশায়ের বিদ্যা কতকগুলো শব্দ বা অক্ষর আর পুরাতন কালের কতকগুলো ধর্মীয় স্তোত্র শেখানো। এ নিয়েই তার জীবন ধরে শিক্ষাদান করে এসেছে গ্রামের ছেলে মেয়েদের। এর বেশি শেখাবার প্রয়োজনও হয়নি কখনও, নিজের ঐ সামান্য বিদ্যা সম্বল করেই কেটে গেছে তার চল্লিশটা বছর।

প্রাচীন কালের ছড়া মুখস্থ করা। তুলির আঁচড়ে মানুষ আর দানব আর রাজার নাম লেখা। অঙ্ক বলতে শুধু একশত পর্যন্ত গুণতে আর লিখতে শেখা। বড় জোর যোগ বিয়োগটা শেখানো। এই হল পাঠশালার শিক্ষনীয় বিষয়। পণ্ডিতমশায়ের মুখ দেখা নিষেধ, বিশেষ করে পড়ার সময়। তার দিকে পেছন দিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ রেখে লিখতে বা আবৃত্তি করতে যদি ভুল হতো তা হলে পেছন থেকে সপাং করে লাঠি পড়ত পিঠে। শিশুর দল চিৎকার করে কেঁদে উঠত। পিঠে মোটা মোটা কালো কালো দাগ পড়ত। আর সেই আঘাত এত অতর্কিতে পড়ত যাতে ত্রাসের সঞ্চার হতো পড়ুয়াদের মধ্যে। পাঠ্য তালিকা যাই থাকুক, দিবানিদ্রায় পণ্ডিতমশায় যখন ঝিমোতে থাকে তখন শিশুরা মিট মিট করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে গল্প করত। কখনও কখনও মৃদুস্বর গুঞ্জন থেকে কলরবে পরিণত হতো। পণ্ডিতমশায়ের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে রুদ্র মূর্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয় তা বিবেচনা না করে সামনে যাকে পেত তাকেই কয়েক ঘা কষে দিত। এই পাঠ্যজীবনের সঙ্গে পরিচয় যে কি

ভয়ঙ্কর এবং এই পাঠশালায় যে শিক্ষালাভ করত শিশুরা তা বুঝতে পারত না অভিভাবকরা।

কনফুসিয়ান ধর্মস্তোত্র মুখস্থ করত ছাত্র-ছাত্রীরা। তার অর্থ বুঝত না, বুঝিয়েও দিত না কেউ, শুধু আবৃত্তি করত সুর করে। আর কোন রকমে তুলি দিয়ে মনের কথা লিখতে শিখত। এইটুকু শিক্ষালাভ করতে চারটে বছর বলীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে পাঠশালায় আসা যাওয়া করত। শিশুদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়, বিদ্যালাভের আগ্রহও ছিলনা যেমন শিশুদের তেমনি অভিভাবকরাও বিশেষ প্রয়োজন মনে করত না লেখাপড়া শেখানোর।

এই অকিঞ্চিৎকর পাঠ্য ব্যবস্থায় খুশী হতে পারেনি মাও সে-তুং-এর শিশুমন। সে পড়ত। পড়বার মত বইয়ের বড়ই অভাব তবুও একই বই তিনবার চারবার পড়ত।

ছোটবেলা থেকে মাও সে-তুং শুনে আসছে তার দেশ হুনান প্রদেশ ডাকাতদের আড্ডাখানা। দেশের সম্পন্ন গৃহস্থরা ডাকাতের ভয়ে সব সময় ভীত সন্ত্রস্থ থাকত। মাও সে-তুং ডাকাতদের সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। তাদের কাজ দেখার প্রবল বাসনা ছিল তার মনে। পার্শ্ববর্তী কোথাও ডাকাতির খবর পেলে অনুষ্ঠানটি সরজমিনে দেখার কেমন বাসনা জাগত তার মনে।

পণ্ডিতের যষ্টি কোন সময়ই তাকে মনোযোগী করতে পারেনি। তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল পুরাকালে লেখা কয়েকখানা উপন্যাস। মনোযোগ সহকারে সে সব পড়ত। বাড়িতে অবসর সময় কাটাত একই বই বার বার পড়ে। তখন বই ছিল কম, সংগ্রহ করাও ছিল কঠিন কাজ, বিশেষ করে গ্রামে পৌঁছত না সে সব বই। তাই পুরানো তেলচিটে বইগুলোকে সে সঙ্গী করে নিয়েছিল, বিশেষ করে ডাকাতদের কাহিনী ভর্তি 'সলিল সৈকতে' বইখানা বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়ত। এই বইয়ের নায়ক দস্যুসর্দার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, অবশ্য

কোন চাষী অথবা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করতে নয়। মহর্ষি কনফুসিয়াসের মহান শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল সম্রাট, তাই তার আচরণের প্রতিবিধান করতে এই বিদ্রোহ। দস্যু দলপতির মূলগত নীতি যাই হোক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কম কথা নয়। মাও সে-তুং বইখানি পড়ত আর ভাবত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে-সে কথা নয়। একটা বিরাট কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভেবেছে, রাজা কেন ধর্মীয় আচরণকে সহ্য করেনি, কেন সে চীনের মানুষদের সরল বিশ্বাসে আঘাত দিয়েছিল! রাজার ক্ষমতা অনেক, সেই ক্ষমতা-দর্পী রাজা ধর্ম-ব্যবস্থা পণ্ড করতে চেয়েছে নিশ্চয়ই, তাই এই বিদ্রোহ। এতো অন্যায় কিছু নয়। এই বিদ্রোহী দল একটা দস্যুর দল হলেও সাধারণ মানুষ, এই বিদ্রোহের ঘটনা তার মনে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করত। সম্রাট শেষ অবধি তার অনুসৃত নীতি পালটাতে বাধ্য হয়েছিল, এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হতে পারে। দস্যুর কাছে রাজার পরাজয় সত্যই রোমাঞ্চকর। রক্ষণশীল চৈনিক জীবনে গল্পের দস্যু যে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিল তা অভিভূত করত মাও সে-তুংকে।

মাও সে-তুং তার ছোট ভাই বোনদের এই গল্প শোনাত। তারা গল্প সবটা না বুঝলেও তারাও কেমন আনন্দ পেত গল্প শুনে। দাদাকে বার বার তাগাদা দিত গল্প বলার।

আরও অভিভূত হতো যখন আরেকজন দস্যুর কাহিনী পড়ত "তিনটি রাজ্যের উপকথায়"। এই দস্যুদল রাজদরবারের দুর্নীতি, আমলাদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। হান রাজা লিউ পেই ছিল কনফুসিয়ান আদর্শে বিশ্বাসী। তার আদর্শের মূলে ছিল বাস্তব সঙ্গতির অভাব, তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বাস্তববাদী সাও-সাও। এই সাও-সাও মনে করত বাস্তব জীবন সব চেয়ে বড় সত্য। কল্পনার নেশায় মশগুল যারা থাকত তাদের সে অপছন্দ করত। দস্যুতা তার বৃত্তি নয় তবুও সে দস্যু। তার দস্যুতায় ছিল নীতির বিরোধ। অপরের অর্থ অপহরণ তার বৃত্তি নয়।

তার মত প্রচারের অস্ত্র হল তার দস্যুবৃত্তি। সে অবাস্তবকে আঘাত করে বাস্তবকে স্বীকার করাতে চাইত। এই উপকথা কেমন একটা আমেজ সৃষ্টি করত তার মনে। সেই দিক থেকেই তার মনে দাগ কেটে বসেছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আমলাতন্ত্রকে ঘৃণা করতে শিখেছিল ধীরে ধীরে। গল্পকে গল্প মনে করে পড়ত না মাও সে-তুং। তার পেছনে যে সত্য তাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করত তার শিশু মন দিয়ে। বাল্যকাল থেকে দস্যুদের প্রতি কিছুটা মমত্ববোধ জেগেছিল তার মনে। সেই মমত্ব যে কি ধারা নেবে তা কেউ বলতে পারেনি। মাও সে-তুং কিন্তু মনে মনে প্রশংসা করত দস্যুদের। তাদের শক্তিকে সে ছোট মনে করত না।

কারণ, কারা এই দস্যু এই কথা সে ভেবে দেখত। বেকার দরিদ্র ক্ষেতমজুর আর চাষীরাই সমবেত হতো দস্যু দলের সঙ্গে। তারা সক্রিয় ভাবে যোগ দিত। সারা বছরের তিন মাসেরও খাবার যাদের থাকত না, সমাজ ব্যবস্থা যাদের বঞ্চিত করত জীবনের সব কিছু প্রয়োজন থেকে তারাই তো আশ্রয় নিত এদের আড্ডায়, পেট ভরে দুটো খাবার আশায়। ক্ষুধা তাদের অসৎ করেছে তাও শুনেছে তার মায়ের কাছে।

মায়ের কাছে আরও শুনেছে গরীব চাষীদের কথা। তাদের যেমন অতীত নেই, বর্তমান নেই, তেমনি থাকে না ভবিষ্যৎ। পশুদের মত দুটো খাবার গিলতে পারলেই তারা খুশী। তাদের অপর কোন প্রয়োজন আছে জীবনে এ কথা তারা চিন্তা করার অবসর পেত না। সেই সব মানুষই বের হতো ডাকাতি করতে পেটের জ্বালায়।

এদের চিন্তাধারায় কোন স্বচ্ছ প্রগতির ছোঁয়াচ না থাকলেও মোটামুটি তারা তো কৃষক সম্প্রদায় থেকে এসেছে। দস্যু হলেও ওরা কৃষক। অথবা কৃষকদের দস্যু বলা হয়েছে যেহেতু তারা বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহ করতে পারে কৃষকরাই, উদ্দেশ্য যাই

হোক না কেন। কৃষকদের সম্বন্ধে সেই বয়স থেকেই কেমন একটা অনুভূতি জেগেছিল মাও সে-তুং-এর মনে।

উপন্যাসের সত্যাসত্য বিচার করার বয়স ছিল না, তা না হলেও বিষয়বস্তু যে তার মনে রেখাপাত ঘটায় তা বোঝা গেছে তার পরবর্তী জীবন থেকে। ঘটনার পেছনে যে সত্য আত্মগোপন করে থাকত তাকেই খুঁজে বের করতে সচেষ্ট ছিল সে।

পাঠশালার চারটে বছর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল। আট বছরের মাও সে-তুং আজ বার বছরের কিশোর। শিশুর চিন্তাধারা থেকে বয়ঃসন্ধির চিন্তাধারায় নিজেকে ঠেলে দেবার সময়ে এসেছে। এখন সে তর্ক করে, কথায় কথায় মানুষের কথা বলে, বড়লোকদের কেন বা অতটা পছন্দ করে না।

এই চার বছরের পাঠ্যজীবনে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে সে প্রশংসালাভও করেছে। যাকে যমদূত মনে করেছে এতকাল তার ওপর কেমন একটা মমতা ছিল তার। রাস্তায় দেখা হলে সম্মানও দেখাত। পাঠশালায় খুব বেশি লগুড়াঘাত তাকে সহ্য করতে হয়নি তার মনোযোগিতা ও বিনয় নম্র ব্যবহারের জন্য।

এর পরই দীর্ঘ ছেদ পড়ল তার পাঠ্যজীবনে।

তার জন্মস্থান সাওসানে আর বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল না, আর কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় পড়াশোনায় ইতি করে ঘরে এসে বসতে হল। বাবাকে এক আধবার বলেছিল বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার কথা।

বাবা বলেছিল, আর দরকার কি পড়ে। আমার ব্যবসার হিসাব রাখতে পারলেই তো যথেষ্ট।

মাও সে-তুং ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল, আর কটা বছর পড়তে পারলে ভাল হতো।

ভাল তো হতো তা জানি কিন্তু এখানে তো ইস্কুল নেই। বাইরে পাঠিয়ে তোমাকে পড়াব এমন আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই।

দরকারের বেশি কিছু করা আমার স্বভাব নয়। তা আমি করি না। আর পড়ার দরকার নেই। আমি গোলদারী ব্যবসা আরম্ভ করেছি তাতেই তোমাকে বসতে হবে। গ্রামে বসে যাতে দু পয়সা উপায় করতে পার তার ব্যবস্থা করেছি, তার বেশি আমি চাই না। এবার ভাল করে ব্যবসাবাণিজ্যটা শিখতে থাক। তা হলেই যথেষ্ট। হিসাব লিখতে শিখেছ, এই তো যথেষ্ট।

বাবার এই অনুদার অভিমত শুনে মাও সে-তুং ছেড়ে দিল উচ্চশিক্ষার আশা ভরসা। তবুও মাঝে মাঝে মায়ের কাছে নাকে কাঁদুনি কাঁদত। ছোট ছোট ভাইবোনরা যখন পড়তে বসত তখন তাদের পড়াত। গল্প করত কিন্তু মন ভরত না কোন ক্রমেই।

মায়ের কাছে আবেদন নিবেদন জানালে মা কোন উৎসাহ দিত না। বলত, বাড়ির মালিক যা বলছে তার বাইরে কিছু করার উপায় তার নেই। চীনের ছেলে বাবা মায়ের নির্দেশ শুনেই চলেছে এতকাল, আজ তার উল্টো কিছু করা ছেলের ধর্ম নয়। তোমার বাবার কথা শুনে চল, ভগবান তথাগত তোমার মঙ্গল করবেন। তুমি তো ধর্ম পুস্তক পড়তে শিখেছ বাবা। তাই আমাকে পড়ে পড়ে শোনাবে। তাতেই তোমার মঙ্গল হবে।

আমার মঙ্গল আমি জানি না?

ও কথা বলতে নেই। তোমার মঙ্গল তোমার বাবা মা বেশি বোঝেন।

তা বলে পড়াশোনা করব না?

নিশ্চয় করবে। বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করতে পার। ইস্কুলে না গেলে কি পড়াশোনা হয় না। কত লোক বাড়িতে পড়াশোনা করে পণ্ডিত হয়েছে। তুমিও হতে পারবে। ভিন গাঁয়ে গিয়ে পড়াশোনা করাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তোমার বাবাকেও বলেছি, সেও বলল, টাকা কোথায় পাব। আসল অভাব হল টাকার। বাড়িতে বসেই পড়াশোনা কর বাপু।

সারাদিন কাজ। পড়ব কখন। মাঠে যেতে হবে, মুদীখানায় বসতে হবে, গোলদারী দেখতে হবে, তারপর কি আর পড়ার সময় পাব ?

ইচ্ছা থাকলেই হয়। যার ভাল কাজে মন থাকে ভগবান তাকে সাহায্য করে। একবার আমাদের দেশের এক রাজা—

থামো মা, রাজার গল্প শুনতে ভাল লাগে না। রাজার মন আমাদের নেই, তার মত অর্থও নেই। রাজার কথা শুনতে ভাল লাগে না।

কি যে বলিস তুং। আমাদের দেশে রাজাই হল ভগবানের অবতার। তার কথা শুনবি না!

ওসব বুঝি না। আমার পড়া বন্ধ। সেই কথাই বল।

অধীর হোস না বাবা, আমাদের এমন অবস্থা তো চিরকাল ছিল না। আজ তো দুটো খেতে পাচ্ছি। যখন তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তখন ছিল মাত্র একখানা ঘর আর সাত মউ জমি। আজ তার একশ' মউয়ের মত জমি। ধান চালের ব্যবসা করছে। এতো একদিনে হয়নি। আমিও মাঠে কাজ করেছি মজুরদের মত। এটা তো সবাই করতে পারে না। তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল, চেষ্টা ছিল। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে আর চেষ্টা থাকে তোমারও লেখাপড়া হবে। ভাবনা করো না। ধৈর্য ধরতে হয়।

তাও তো দুটো বছর কেটে গেল।

দুটো বছর তো কিছুই নয়। আমাদের আঠার বছর চেষ্টা করতে হয়েছে, আজও চেষ্টা করছি।

আর কোন আলোচনা না করে বাবার নির্দেশে চাষের কাজ, দোকানের কাজ—সব কাজেই ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ল সে। কিন্তু মনে রয়ে গেল বিরক্তি ও ক্ষোভ। তখন তার বয়স তের বছর পূর্ণ হয়ে চোদ্দ চলছে। চেহারায় কিন্তু তারুণ্যের ছাপ পড়েছে।

মাও সে-তুং ঘরের কাজ করেও মাঝে মাঝে ছেলেদের আড্ডায়

গিয়ে বসে। গ্রামের গরীব ভূমিহীন চাষীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয় গল্প গুজবে। অনেক রাতে ফেরে কখনও কখনও। ভাত নিয়ে বসে থাকে তার মা। অনুযোগ করে, কোথায় যাও?

ঐ তো চ্যাং কাকার বাড়িতে বসে ছিলাম।

ওদের বাড়িতে যেওনা বাবা। ওরা ভাল মানুষ নয়। কেউ চোর, কেউ ডাকাত, কেউ আফিমের ব্যবসা করে। ওদের সঙ্গে উঠাবসা করলে নিশ্চিত বিপদ।

আমি শুনছিলাম ওদের কথা। জানো মা চ্যাং কাকার মেয়ে সুন হুয়ে হারিয়ে গেছে।

সে কি রে। অত বড় মেয়ে!

হাঁ মা। তাই তো শুনছিলাম। চ্যাং কাকী কত দুঃখ করছিল।

না রে না। হারায়নি। কোথাও বিক্রি করেছে মেয়েটাকে। নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে। চুপ করে আছে চ্যাং। কদিন বেশ মাংস মেঠাই খাবে। তারপর যে-কে-সে। তা হোক তুমি যেও না। কাল সকালে তোমাকে যেতে হবে এক জোড়া নতুন বলদ কিনতে। হালের গরু কম পড়েছে।

বলদের চেয়ে ঘোড়া ভাল।

অত টাকা কোথায়!

পরে কিনব। এখন না কিনলেই নয় কি?

ঘোড়া দিয়ে চাষও হয়, আবার দরকার মত শহরে যাওয়াও যায়। তাই কর মা।

এবারকার মত বলদই কিনতে হবে বাবা। আসছে বছর চেষ্টা করব।

মাওকর্তা সত্যিই এক জোড়া বলদ কিনে এনেছে। নতুন বলদ। আগে কখনও চাষে নামেনি। সহজে বাগ মানতে চায় না। কোন রকমেই তাদের কাঁধে জোয়াল তোলা গেল না। রাখালরা উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে মাওকর্তা স্থির করল, বলদ দুটো বিক্রি করে

দেবে। নতুন আরেক জোড়া বলদ কিনবে। ছেলেকে ডেকে বলল, এই বলদ দুটো আগামী হাটেই বিক্রি করে দিয়ে ভাল দেখে একজোড়া বলদ কিনে আনবে। সঙ্গে লুনকে নিয়ে যেও, সে গরু যাচাই করে নিতে পারবে।

আচ্ছা, বলে মাও সে-তুং হিসাবের খাতা নিয়ে বসল। তাদের মুদীখানার দোকানের হিসাব। হিসাব লিখতে লিখতে হাতের তুলি ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে বের হল দোকান থেকে। সোজা গেল খামারে। গোয়াল থেকে নতুন বলদ দুটো টানতে টানতে নিয়ে গেল মাঠে। বাড়ির চাকরকে বলল, হাল আর জোয়াল নিয়ে আয় মাঠে।

নতুন বলদের ঘাড়ে জোয়াল তুলে দিতেই ঘাড় কাত করে জোয়াল ফেলে দিল বলদজোড়া। আবার তুলে দিল তাদের ঘাড়ে। এমনিভাবে যতবার তুলে দেয় জোয়াল ততবারই ফেলে দেয় বলদজোড়া। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত, বলদজোড়া স্থির হয়ে দাঁড়াল। শেষ আশা নিয়ে মাও সে-তুং আর তার রাখাল জোয়াল তুলে দিল তাদের ঘাড়ে। তাদের নিয়ে গেল মাঝ মাঠে। এরপর আবার শুরু হল অধ্যবসায়ের পরীক্ষা। তিন চার ঘণ্টা পর যখন তারা ফিরে এল ক্লান্ত হয়ে তখন বলদজোড়াও অনেকটা বাগ মেনেছে।

পরের দিন যখন মাও সে-তুং গেল হাল বলদ নিয়ে আর চাষ করল এক মউ জমি তখন সবাই অবাক। দুরন্ত বলদ দিয়ে চাষ করানোটা বড় কথা নয়, বড় কথা তার অধ্যবসায় আর দুটোকে বশে আনার ক্ষমতা। সবাই প্রশংসা করল তার, মাও সে-তুং নিজেও খুশী হল নিজের সাফল্যে।

বলদজোড়া বিক্রি করতে যেতে হল না কাউকেই কোন হাটে।

মাঠের কাজে, ঘরের কাজে, ব্যবসায়ের কাজে মাও সে-তুং নিজেকে মিশিয়ে দিল তার বাবার নির্দেশে। নিজের পরিতুষ্টিকে ভুলে যেতে চেষ্টা করছিল বার বার শুধু বাবা মাকে পরিতুষ্ট করতে। সব সময়ই

মনে হতো তার আরও তাকে জানতে হবে, আরও তাকে পড়তে হবে, আরও কিছু করতে হবে। রাতের বেলায় তেল অথবা চর্বির বাতি জ্বেলে তার প্রিয় উপন্যাসগুলো বার বার পড়ত, কোন লোকের কাছে কোন বই পেলে তা নিয়ে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে পড়ে শেষ করত। কোন সময়ে মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে বই হাতে করে আইলে বসে বইপড়া শেষ করত, যখন খদ্দের থাকত না দোকানে তখন বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকত। এই ভাবে সাধনা করতে থাকে মাও সে-তুং কিন্তু অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর তার এই চেষ্টা। তবুও বিরাম নেই তার সাধনার।

মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বইও দু চারখানা হাতে এসে পৌঁছত। সেগুলো আদ্যোপান্ত বারবার পড়ত। তার কিশোর মনে "সেং সি উয়ে য়েন" বইখানা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চেং কুয়ান ইয়েং-এর এই বইটিতে ছিল কি করে শিল্পের ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনা যায়, কি ভাবে রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই সব বিষয়ে মাও সে-তুং-এর আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বার বার বইখানা পড়েও কেন বা তার তৃপ্তি হতো না। চেন কুয়ান ইয়েং-এর বইখানাই প্রথম জীবনে সব চেয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল তার মনে, তার ভবিষ্যৎ কর্মধারায় এই রেখাপাতের অবশেষ পরিস্ফূট হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। তার মনে যা প্রতিফলিত হয়েছিল তারই ছায়া দেখা গেছে তার কাজের মধ্যে।

মাও সে-তুং বুঝেছিল তার পাঠ্য জীবন যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি অকিঞ্চিৎকর। আরও পড়তে হবে, আরও জানতে হবে, তবেই তার জীবনে আসবে পরিপূর্ণতা। তার পিতার আশ্রয় থেকে তার এই দুরন্ত উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার কোন উপায় আছে কিনা ভেবে পেল না। স্থির করল, না নেই। পিতার আশ্রয় ত্যাগ না করলে তার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার কোন পথ নেই। তাকে ছুটতে হবে সাওসান ছেড়ে আরও বড় পৃথিবীর দিকে, তাকে সংগ্রহ করতে হবে প্রভূত

জ্ঞান। মিশতে হবে বহুজনের সঙ্গে। আলোচনা করতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়, নিজেকে দশের একজন করে তুলতে হবে। মাও সে-তুং খুঁজতে থাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ।

আরও জানতে ও শিখতে হলে বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তী হওয়াই হল সব চেয়ে ভাল পথ। কিন্তু তা কি করে সম্ভব!

এক বন্ধু বলল, নইলে তোমার আশা পূর্ণ হবার কোন উপায় নেই।

মাও দুঃখিত ভাবে বলল, সত্যিই উপায় নেই বন্ধু।

সাওসান গ্রামে ছিল বেকার একটি আইনের ছাত্র।

তার সঙ্গে মাওয়ের ছিল গভীর প্রীতি। সলাপরামর্শ করত তারই সঙ্গে। মনের কথা বলত তাকে। তার সঙ্গে দিনের পর দিন পৃথিবীর নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করত। মাও ক্ষোভের সঙ্গে বলত, এখানে যদি একটা উচ্চ বিদ্যালয় থাকত তা হলে কত ভাল হতো। আমাকে এত ভাবতে হতো না। বিদ্যালয়ের যে কি অভাব! বাইরে গিয়ে পড়ার কোন উপায় নেই। আমাকে নির্ভর করতে হয় বাবার উপর। বাবা অমত করেছে, টাকার ব্যবস্থাও হবে না কোন সময়ই।

আমি তো তোমাকে অনেক বই কেতাব দিয়েছি।

সে আর কটা। এক-একটা দশ-বার বার করে পড়েছি। কিন্তু এই তো সব নয় বন্ধু। এতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের অতীত কাহিনী বিনা বর্তমানের ছায়াও তো কোথাও দেখতে পাই না, ভবিষ্যৎ যে কি তাও সঠিক বলতে পারব না আমরা। আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় যা শিখিয়েছেন তার সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমানকে দিনগত পাপক্ষয় মনে করেন, অতীতের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানান। ভবিষ্যৎ তাদের কাছে নৈরাশ্যভরা। এদের কাছে নতুন কিছু প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

পথ তো দেখছি না ভাই। তোমার মায়ের সাহায্য ভিন্ন কিছুই

হবে না মনে হচ্ছে। মাকে যেমন করে হোক তোমার মতে আনতে হবে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন টাকা। বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় করা সম্ভব নয়। মা রাজি হলেও বাবা রাজি হবেন না। আমার সঙ্গে বাবার মতের মিল হচ্ছে না কোন রকমেই।

মায়ের মত করতে পারলে তোমার বাবাও মত দেবেন। মাকে স্বমতে আনতে চেষ্টা কর।

আমার কোন ভরসা নেই, তবে চেষ্টা করতে পারি। আমার মনে হয় বাড়ি থেকে পালিয়ে শহরে গেলে কিছু না কিছু ব্যবস্থা করতে পারবই পারব।

তবুও তুমি যাও তোমার মায়ের কাছে। আমার বিশ্বাস একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই হবে।

শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে মাও সে-তুং গেল তার মায়ের কাছে। আবার বলল তার মনের কথা। জোর দিয়ে বলল, তোমাদের এই ধান চালের দোকান দিয়ে কি হবে। লেখাপড়া না শিখলে কোনটাই কোন কাজে আসবে না। আমাকে পড়তে দিতে হবেই।

মনোযোগ সহকারে সব শুনে তার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোলের মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তা কি আমি বুঝি না। তোর বাবা যেমন গোঁয়ার, কোন কথাই শুনবে না। দেখি শেষবারের মত একবার নাড়াচাড়া করে। তবে ভরসা নেই।

তুমি টাকা দাও।

আমি কোথায় টাকা পাব। বড় জোর তোকে ইস্কুলের মাইনেটা দিতে পারি। তাও দিতে হবে চুপি চুপি। আগে দেখি ঘরের মালিক কি বলে।

সন্ধ্যা বেলায় মা গেল মন্দিরে।

হাত জোড় করে ভগবান তথাগতকে নিবেদন করল তার মনের বাসনা। "আমার ছেলে মানুষ হোক" এই আমার প্রার্থনা।

মন্দির থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে গৃহকর্ম শেষ করে শুতে গেল।

মাও সে-তুং কান পেতে রইল সেই রাতের পিতামাতার আলোচনা শুনতে। মা-বাবার দ্বন্দ্ব চলল অনেক রাত অবধি। তার পড়াকে কেন্দ্র করে এই দ্বন্দ্ব। নিরক্ষর জননীর পক্ষে যতটা যুক্তি দেওয়া সম্ভব তা দিতে ত্রুটি করল না কিন্তু কিছুতেই তার বাবা সম্মত হল না। মায়ের চোখের জলও নিস্ফল হল। বাবার একটি কথা, ছেলেকে পড়তে দেওয়া হবে না। ছেলে যা লেখাপড়া শিখেছে তাই যথেষ্ট। আমার সংসার সম্পত্তি ব্যবসা রক্ষা করার চেয়ে বড় কাজ আর নেই। বিষয়বুদ্ধিতে পোক্ত হওয়াই বড় জ্ঞানলাভ। সেই জ্ঞানলাভ করতে বল তোমার ছেলেকে। তার পড়ার জন্য অর্থব্যয় করতে পারব না। কাল থেকে সে যেন সব সময়ের জন্য দোকানে বসে। এখন থেকে দোকানের সব কাজ তাকেই করতে হবে। এখন বয়স তো ষোল বছর হল, এর পর কিছুতেই পোষ মানবে না।

নিজের কানেই শুনল মাও সে-তুং। পরদিন সকালে জননীর কাছে পিতার বিস্তারিত অভিমত শুনে মাও সে-তুং চিন্তা করতে থাকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। মুখে কিছুই বলল না। পুত্রের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মাতৃহৃদয়ে জাগল যে বেদনা তার ছবি ফুটে উঠল মায়ের মুখে। কিন্তু নিরুপায়।

আশা নিয়ে বলল, একটা পথ আছে তুং।

কি পথ?

তোর মামার বাড়ি হেসিয়াং-হেসিয়াং-এ চলে যা। সেখানে গেলে কিছু একটা হবেই। তাদের সাহায্য পেলে তোর কোন অসুবিধাই হবে না।

কিন্তু মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে পারব না। সেখানেও হয়ত গরু চড়াতে পাঠাবে নয়ত তাদের দোকানে ঝাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে দেবে। তুমি যদি কিছু টাকা দাও তা হলে কোন বোর্ডিং-এ থেকে অথবা ঘর ভাড়া করে পড়াশোনা করতে পারি।

একা থাকতে পারবি কেন? পাঁচজনের সঙ্গে থাকলে তোর উপকার হবে, পড়ার সুবিধা হবে।

একা থাকলেই বেশি সুবিধা। কোন ভয় নেই মা। তুমি এখন কিছু টাকা দাও। পরে আর টাকা দিতে হবে না। আমি ছেলে পড়িয়ে বা অন্য কাজ করে পড়ার খরচ তুলে নেব। আমি তো তোমার ছোট্ট ছেলেটি নই। দু ভাই আর এক বোন তো কাছেই রয়েছে, তাদের নিয়ে তুমি বেশ ভুলে থাকতে পারবে। আমার বয়স তো ষোল। এই বয়সে কত ছেলে পেটের ধান্দায় বেরিয়ে যায়। মেহনত করে বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ায়। আমার জন্য চিন্তা করো না মা। আমি সব পারব। নিশ্চয় পারব। দেখবে আমি ভাল ভাবেই থাকতে পারব।

তাই করিস কিন্তু তোর বাবা খুব রাগ করবে।

ঘর পালানো ছেলের ওপর রাগ করে কি লাভ হবে বল। আমি তো সহজে সামনে আসছি না। আর বাবা যখন রাগ করবে তখন তুমি তাকে সামলাবে।

মাতা-পুত্র যুক্তি পরামর্শ করে দিন গুণতে থাকে। জ্যোতিষের কাছে গিয়ে শুভদিন ঠিক করে এল দুজনেই। সেই শুভদিনেই ঘর পালিয়ে যেতে হবে পড়াশোনা করার নেশায়। মাও সে-তুং সেই দিনটির জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে।

সাওসান গ্রামে মাত্র দুজন জানত এই ঘটনা। একজন তার মা অপর জন তার আইন পড়ুয়া বন্ধুটি।

সেই নির্দিষ্ট দিনে মাও সে-তুংকে তার মা পাঠিয়ে দিল হেসিয়াং-হেসিয়াং-এ। জানতে পারল না কাকপক্ষীও।

রাতের অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল মাও সে-তুং। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মা চোখ মুছল।

সকাল বেলায় দোকান বন্ধ দেখে গৃহকর্তা জানতে এল, তুং কোথায়?

জননী উদ্বিগ্ন ভাবে বলল, কেন দোকানে ?

দোকান তো বন্ধ।

অ্যাঁ! তা হলে কোথায় গেল ? মাঠে যায়নি তো ?

তুমি খুঁজতে পাঠাও। আমি দোকানে বসছি। খদ্দের ভীড় করেছে, দোকানটা আগে খোলা দরকার।

গৃহকর্তা চলে যেতেই গৃহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রথম ধাক্কা কাটলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আরম্ভ হবে ছেলের খোঁজ। মন শক্ত করল গৃহিণী।

মাও সে-তুং সকাল বেলায় পৌঁছে গেছে হেসিয়াং-হেসিয়াং-এ।

প্রথমে মামার বাড়িতে দেখা করতেই মামারা জিজ্ঞেস করল, বাড়ির খবর কি ? ভাল আছে তো সবাই ?

মাও হাঁ হুঁ বলে ওসব প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

তা কি মনে করে এসেছিস ?

পড়তে।

কি পড়তে ?

বড় স্কুলে।

তা হলে টাংসানে যেতে হবে। সেখানেই বড় স্কুল আছে।

সেখানেই যাব মামা। তোমাদের কাছ থেকে খবরটা নিতে এসেছি। টাংসানের রাস্তাটা বলে দাও। আমি সেখানে যাব।

তা যাবি যা। তবে কাল যাস। আজ এখানে থাক।

না মামা, দেরী হয়ে যাবে। আজকেই দিনে দিনে পৌছতে হবে। নতুন জায়গা, আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

তা হলে খেয়ে দেয়ে দুপুরের মধ্যেই রওনা হতে হয়। তা তিন চার ঘণ্টা তো লাগবে সেখানে পৌছতে।

তাই ভাল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে মাও রওনা হবার আগে মামাকে বলল, বাবাকে যেন খবর দিওনা। আমি গিয়ে খবর দেব।

তুই কি রাগারাগি করে এসেছিস ?

না। তবে বাবা পড়তে দেবেন না, আমি পড়ব ঠিক করেছি। মা মত দিয়েছেন, বাবা মত দেননি। তাই স্কুলে ভর্তি হয়ে তবেই খবর দেব বাবাকে।

আচ্ছা। তুই খবর দিস। আমার আর জানিয়ে কি দরকার।

মাও সে-তুং টাংসানের পথে বেরিয়ে পড়ল।

বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে গেল টাংসানে।

ছোট শহর।

অবশ্য তার জন্মস্থান সানসাওয়ের চেয়ে অনেক বড়। অনেক দোকানপাট, অনেক মানুষ, বড় বড় রাস্তা, পুলিশ-সৈন্য, আদালতখানা সব কিছুই আছে। কর্মব্যস্ততাও আছে শহরে। গ্রামের মত অলস মন্থর গতি নেই কোথাও। দোকানপাটগুলো বেশ সাজানো, বাড়ি-ঘরগুলো মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। মাও অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল। ছোট শহরের জীবন। ভাল লাগছিল তার তবুও মনে হল শহরের এই ব্যস্ততা ও গ্রামের আলস্যের মাঝে কোথায় যেন একটা বিরাট সমত্ব আছে। সম্পন্ন চাষীর গৃহে নিরন্ন মজুরের ভীড় দেখেছে গ্রামে আবার শহরেও মনে হল স্বচ্ছল ব্যক্তিদের আশে পাশে ভীড় করেছে অস্বচ্ছল দরিদ্র মানুষরা। এই সমতা তার চোখে বেশ কঠিনভাবে আঘাত করল। বাস্তব পার্থক্যটা মনে হল খুব ক্ষীণ।

মাও সে-তুং টাংসান উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখাল।

জ্ঞানলাভের অত্যুগ্র বাসনা ঘরছাড়া করল মাও সে-তুংকে, সারা দুনিয়াতে যে তার ঘর সে কথা সেদিনের মানুষ জানত না। জানত না মাও সে-তুং নিজেও।

মাও সে-তুং পড়তে থাকে।

পড়ার শেষ নেই। অধ্যবসায়ের কঠিন পরীক্ষা দিতে বসেছে সে।

কিন্তু।

এই একটি 'কিন্তু' নিয়ে মাও সে-তুংএর জীবন। সেই 'কিন্তু'

হল বস্তুকে বিচার করার ও বিশ্লেষণ করার গভীর প্রেরণা। সেই প্রেরণা তাকে টেনে এনেছিল মাটির কাছে, মানুষের কাছে, মেহনতী শোণিত মানুষের কাছে।

মাওয়ের প্রথম শিক্ষালাভের এই প্রচেষ্টা। একে দিয়েই বিচার করতে হয়েছে তার ভবিষ্যৎ। ভাল কাজের জন্য চীনের চিরাচরিত প্রথাকে অগ্রাহ্য করে ঘর পালিয়ে এসেছিল সে, বাস্তবত বিদ্রোহ করেছিল তার পিতার অযৌক্তিক নির্দেশের বিরুদ্ধে।

মাও সে-তুং-এর জীবন কথায় এই সব সামান্য ঘটনার যে বিরাট বিস্তৃতি রয়েছে তা বিচার করা হয়েছে পরবর্তী জীবনে। সে দিনের সেই ঘর পালানো মাও যে আজকের মাও, তা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারবেনা। তবুও তা সত্য। সেই সত্যকে আশ্রয় করেই মাওয়ের জীবন গড়ে উঠেছে।

হোনান প্রদেশের রাজধানী চ্যাংসা।

ঘটনাটা ঘটেছিল চ্যাংসায় উনিশ শ' চার সালে।

মাও তখনও কিশোর।

ঘটনাটা শুনেছিল চ্যাংসার লোকের কাছে কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার করেছিল তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে।

সম্রাজ্ঞী দোয়াগরের জন্মোৎসব।

পৃথিবীর সব দেশে যেমন হয়ে থাকে তেমনি চ্যাংসাতেও রাজতন্ত্রের ধারক আমলাবৃন্দ ও রাজতন্ত্রের অনুগত অর্থবান ব্যক্তিদের এই উৎসব। উৎসবে যোগ দিতে সমবেত হয়েছে চ্যাংসার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা, ধনী সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিরা আর সম্রাজ্ঞীর দরবারের মাননীয় পারিষদ দলের অনেকে।

বাজী পটকা ফুটছে। আকাশে ফানুষ উড়ছে। ভোজ্যপেয় বস্তুর তখন ছড়াছড়ি। উৎসব তখন পূর্ণোদ্যোমে চলছে। প্রধান তোরণে

উৎসবের বাজনা, মাঙ্গলিক ধ্বনি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই। এই আনন্দভরা উৎসবে হঠাৎ শোনা গেল বন্দুকের শব্দ। থামল উৎসবের কলকোলাহল। হৈ-হৈ করে ছুটে বের হল সেপাই শান্ত্রী, ছোটাছুটি চিৎকার হট্টগোল। কেউ জানে না কি হয়েছে। কে গুলি করল, কাকে গুলি করল বুঝতে বুঝতে অনেক সময় কেটে গেল। পুলিশ ছুটছে, আততায়ী যে কে তা না জেনেই ছুটছে। বাজী পটকার আওয়াজ ভেদ করে বন্দুকের আওয়াজ তাদের সচকিত করেছে কিন্তু নির্দেশ পায়নি কোথায় কি ঘটনা ঘটেছে।

সবার চোখেই জিজ্ঞাসা।

অবশেষে জানা গেল কোন একজন দুর্বৃত্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও রাজ সভাসদদের হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছিল। গুলি নিশানা ভ্রষ্ট হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে কারও কোন আঘাত লাগেনি। তবে তখন সবাই আতঙ্কিত, উৎসব মধ্যপথেই বন্ধ করতে হয়েছে নিরাপত্তার অজুহাতে। আততায়ীকে ধরা যায়নি।

কিন্তু কে এই দুর্বৃত্ত!

কেন এই আক্রমণ?

অপরিচিত নয় এই আততায়ী। অনেকেই চিনতে পেরেছিল তাকে। অনেকেই বলল, লোকটা ছুয়াংসিং।

কিন্তু কোথায় গেল আততায়ী, কি করে ভেতরে এল, কি করে পালিয়ে গেল। সবই যেন ধাঁধা।

বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি!

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা প্রদেশে।

সাওসানেও খবর পৌঁছে গেল। খবর শুনে সবাই আতঙ্কিত। এত বড় কাণ্ড যখন হতে পারে তখন সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা কেমন করে থাকতে পারে।

মাও সে-তুংও শুনেছিল খবর। খবর শুনেই কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল সেই কিশোর বয়সে। পাঠশালার ছাত্রের মনে এই দুঃসাহসিক

ঘটনা যে গভীর রেখাপাত করতে পারে তা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না। কেমন একটা অনুভূতি, কেমন একটা উন্মাদনা। তারিফ করল হুয়াংসিং-এর এই দুঃসাহসকে। তার সমবয়সীরাও আলোচনা করছিল তাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে। কেউ বলল ভাল, কেউ বলল মন্দ, মাও শুধু বলল, বাপরে, এ লোক কম লোক নয়। আমরা কি পারতাম এমন কাজ করতে।

পাঠশালা থেকে বিদায় নিয়ে মাও যখন বাড়িতে এসে চাষের কাজে নামল তখন তার পঠিত উপন্যাসের দস্যুদের সঙ্গে হুয়াংসিং-এর বীরত্ব তুলনা করতে থাকে মাঝে মাঝেই। তার এই নীরব সমালোচনা তাকে আরও গভীরে টেনে নিয়ে গেল। কল্পনার রথে চড়ে মাও যেন চাইছিল এমন একটি ঘটনার নায়ক হতে।

মাঞ্চু রাজাদের কথাও ভাবত মাঝে মাঝে। রাজাদের সম্মান করতে হয় এইটুকুই সে জানত। বর্তমানে রানী শাসন করছে দেশটা। রানী থাকে পিকিং-এ, তার সঙ্গে সাধারণত কারও দেখা হয় না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয়ও তার নেই, অথচ তারই নির্দেশে চলছে গোটা দেশটা। অনেকের মুখেই শুনেছে মাঞ্চু রাজাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অত্যাচারের কথা, আবার শুনেছে বিদেশীরা কি ভাবে দখল করেছে তাদের দেশের অংশ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে। এসব বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা ছিল তার মনে তবুও ধীরে ধীরে তার সামান্য চিন্তাধারায় ছক বেঁধে ভাবতে বসেছে রাজতন্ত্রের কথা। সে নিজে যদি রাজা হতো তা হলে কি করত তাও ভেবেছে। অস্থির একটা আনন্দময় চিন্তার সঙ্গে ব্যথার কেমন একটা সুর যেন একই তালে-লয়ে বাঁধা! রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নিজের অপরিণত বুদ্ধি-বৃত্তিকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ফেলেছিল মাও সে-তুং। এ দিয়ে অবশ্য তার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ইঙ্গিত জানা যায়নি।

মাও সে-তুং যখন বার-তের বছরের কিশোর তখন হুনান হুপেই সীমান্তের কৃষকরা একদিন মাথা তুলে দাঁড়াল। কৃষক অর্থে সম্পন্ন

কৃষক নয়। যাদের ভূমি নেই, যারা ভূমিদাস। যারা জীবিকা মনে করে চাষকে এবং চাষের ফসলের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। এদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল কো লাও-হুই। চাষীদের নায্য দাবী আদায়ের জন্য কো বহু আবেদন নিবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সম্পন্ন চাষী জমিদার ও রাজতন্ত্র কেউ-ই তার আবেদনে সারা দেয়নি বরং ব্যঙ্গ করেছে তাকে। ভয় দেখিয়েছে, প্রলোভন দেখিয়েছে।

আর কোন পথ যখন খোলা ছিল না তখন কো লাও-হুই-এর নির্দেশে ও পরিচালনায় কৃষকরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। দলে দলে কৃষক দাবী জানাতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। অপর পক্ষও দুর্বল নয়। তারা সশস্ত্র বাহিনী হাজির করল বিদ্রোহ দমন করতে। বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে পারল না নিরস্ত্র কৃষকরা। কৃষক নেতাদের বন্দী করে তরবারির আঘাতে তাদের মাথা কেটে নামাতে থাকে রাজার সৈন্যরা।

বিদ্রোহ দমন করল।

কৃষকরা অসফল হল। তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হল। নৃশংস অত্যাচারের ভয়ে দলে দলে কৃষক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল অজানার পথ ধরে।

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মাও সে-তুংও শুনল কৃষকদের এই অসাফল্য ও রাজকীয় বাহিনীর নৃশংসতার কথা। নানা ডালপালা নিয়ে কাহিনী আরও ভয়ঙ্কর হয়ে হাজির হল লোক সমাজের সামনে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এই রকম বিদ্রোহ করতে না পারে তার জন্যও প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করেছিল সরকার।

পাঠ্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে শিশু ও কিশোর মাও সে-তুং-এর মনে এই সব ঘটনা যে ছাপ দিয়েছিল তারই প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছিল মাও সে-তুং-এর টাংসানের পাঠ্যজীবনে। মনের কোণায় স্থায়ী আঁচড় ছিল বলেই মাও হয়ে উঠল চিন্তাশীল কিন্তু তার প্রকাশ ছিল না কোথাও।

মাও পড়ছে বিদ্যালয়ের পাঠ্য, পড়ছে উন্মুক্ত জগৎটাকে। দেখছে, শুনছে, জানছে। সাধনার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে মাও স্বপ্নের সৌধ রচনা করছে।

সঙ্গীদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করে দেশের কথা, দশের কথা। আলোচনা করতে কখনও মাও ক্লান্ত হতোনা অথচ তার গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত তার কথার গাঁথুনিতে। তার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিত না অনেকেই তাই যখনই মাও কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত তখন তার সহপাঠীরা তাকে ঠাট্টা করত। কারণ, তার বক্তব্য বুঝবার মত সামর্থ্য তাদের ছিলনা। অবোধ্য বিষয় নিয়ে তামাসা সম্ভব, আলোচনা সম্ভব নয়।

অনেক সময় বেশ বচসাও হতো।

চাষার ছেলে মাওকে নিয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করত শহরের ধনীর সন্তানরা। তাকে টিটকারী দিত। কেউ হয়ত তার বেণীটা ধরে টানাটানি করত।

টাংসান বিদ্যালয়ের ছাত্র মাও।

দশ সাল। হ্যাঁ, সেটা উনিশ শ' দশ সালের শেষ কটা দিন।

মাও তখন ছাত্র, কিন্তু ছাত্র নেতা নয়। তার জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের দিন যে এত সহজে আসবে তা নিজেও জানত না।

শহরের পথে পথে তখন ভীড় করেছে বুভুক্ষু মানুষের দল। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, দুটো ভাত, একটু মণ্ড, একটু জই।

ঐ কাতর ক্রন্দনে শহরের বাতাস তখন বিষাক্ত। হাড় জিরজিরে মানুষের দল তখন মিছিল করে চলেছে। স্বামী-স্ত্রী ভুলে গেছে তাদের সম্পর্ক, মা ভুলে গেছে সন্তানের প্রতি মমতা, ভাই ভুলে গেছে বোনকে। সবার হাতে ভিক্ষা পাত্র।

চমকে উঠল মাও সে-তুং।

এরা কারা?

গ্রামের মানুষ। গ্রামের চাষী। গ্রামের ভূমিহীন চাষী। গ্রামের

ক্ষেত মজুর। গ্রামের ছোট :ছোট চাষী। এরাই তো ছুটে এসেছে আহার্যের আশায়। কিন্তু এরাই তো উৎপন্ন করে ফসল অথচ এরাই পেটভরে খেতে পায় না, আজ এরাই অন্নাভাবে ছুটে এসেছে ধনীর করুণা ভিক্ষা করতে।

খরায় ফসল হয়নি গত বছরে।

প্রকৃতি কৃপণ, মাথার ওপরে সূর্যদেব তার সুতীব্র তেজে জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্ষেতের ফসল। চাষী তাকিয়ে থেকেছে আকাশের দিকে জলের আশায়। সামান্য যাও বা দুচার ফোঁটা জল এসেছে আকাশ থেকে করুণার মত তাও নিমেষে শুষে নিয়েছে পিপাসার্ত ধরণী। তাই ফসল তুলতে পারেনি চাষা। অংশ পায়নি ক্ষেতমজুর। যাও বা পেয়েছিল তাও তুলে দিতে হয়েছে মহাজনদের হাতে। সরকারী ট্যাক্স আর জমিদারের প্রাপ্য মেটাতে নিঃস্ব হয়েছে ওরা। ওদের নিজের বলতে কিছু নেই। নেই আহার্য, নেই পরিধেয়। নেই আশ্রয়। ঘটিবাটি যা ছিল বিক্রি করেছে। স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করেছে অর্থবানের কাছে, মাতা সন্তানকে বিক্রি করেছে তবুও পোড়া পেটের জ্বালা তারা মেটাতে পারেনি।

ঘাসপাতা, কুকুর-শেয়াল যা কিছু সামনে পেয়েছে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছে, দেখা দিয়েছে মহামারী। খাদ্য অখাদ্য বিচার করার কোন উপায় তাদের নেই। যখন সব শেষ তখন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ছুটে বের হয়েছে গ্রাম থেকে, ছুটে এসেছে শহরে। যারা কিছুটা বেপরোয়া তারা দলবদ্ধ হয়ে ধনীর গৃহে রাতের অন্ধকারে হামলা করতে চেষ্টা করেছে। তারাও দলে দলে মরেছে জমিদারের পেয়াদার হাতে কিম্বা সরকারী ফৌজের গুলিতে। যারা দুর্বলমনা তারাই এসেছে ধনীর করুণাপ্রার্থী হয়ে, এদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

কানের কাছে সব সময় ধ্বনিত হচ্ছে, খেতে দাও, খেতে দাও।

আকাশ দীর্ণ হতে থাকে সেই আকুল ক্রন্দনে, দীর্ণ হয় না শুধু ধনীর হৃদয়।

তারপর।

গলিত শবে পূর্ণ হল শহরের গলিপথ। কঙ্কালের মত মানুষগুলো অনাহারে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলতে চলতে মাটিকে আঁকড়ে ধরে শেষ আশ্রয় মনে করে। মৃতদেহগুলো টেনে হেঁচরে ফেলে দেয় ভাগাড়ে। শকুন-শেয়ালের ভোজপর্ব চলছে বিনা বাধায়। দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত, আর্তনাদে শ্রবণপথ ব্যথিত, শীর্ণ নরদেহের মিছিলে দৃষ্টিপথ ভারাক্রান্ত।

এই শেষ নয়।

সংবাদ আসছে, আরও, আরও বুভুক্ষু মানুষ ছুটছে শহরের দিকে। শুধু এই শহরেই নয়, বড় বড় শহরের দিকে তারা ছুটে চলেছে।

মাও সে-তুং শুনত, দেখত আর ভাবত। ভাবনার আর শেষ নেই।

বন্ধুদের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে আলোচনা করত। বিশেষ করে সরকারী যন্ত্রের উত্তাপহীন আচরণের কথাই আলোচনা করত বেশি।

লোহার বেড়ি পড়িয়ে একদল লোককে নিয়ে চলেছে জেলখানায়।

ওরা কারা ?

জানো না। ওরা ডাকাত। ডাকাতি করেছে। নিরীহ লোকদের হত্যা করেছে।

কেন, কেন ?

কেন ? লোভ। অপরের সম্পদ লুটে নেবার লোভ।

না, তা নয়। অন্য কোন কারণ আছে। মানুষ তো ডাকাত হয়ে জন্মায় না। পরিবেশ তাদের ডাকাত করে গড়ে তোলে।

হাসতে হাসতে একজন বলল, ওরা ছোটলোক, ভবঘুরে, ডাকাত। খেতে না পেলে আর কি কাজ করবে। লুটেপুটে খাওয়া হল ওদের পেশা। ধনীর বাড়িতে হামলা করেছে। ডাকাত তার স্বভাব ছাড়তে পারবে কেন। যতই দাও ওরা ডাকাতি করবেই করবে। ওরা জন্মেছে ডাকাতি করতে। শান্তি শৃঙ্খলা ওদের সহ্য হয়না, আইন ওরা মানে না।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ওরা কারা?

ওরা চোর।

চোর! অমন সরল যাদের চাহনি তাদের চোর বলছ!

যারা চুরি করে তাদের কি সাধু বলব। ওদের চাহনি দেখে ভুল হয় কিন্তু আসলে ওরা চোর।

কি চুরি করেছে ওরা?

গেরস্থবাড়ি থেকে ভাত চুরি করেছে।

হা-হা করে হেসে উঠল প্রশ্নকর্তা। ভাত চুরি, মানে ক্ষুধা!

শুধু তাই নয় ছাগল গরুও চুরি করে। গোটা গোটা ছাগল পুড়িয়ে ঝলসে রাক্ষসের মত খায়। মানুষকেও হয়ত ওরা পুড়িয়ে খেতে পারে। অমানুষ ওরা। ওরা রাক্ষস, ওরা পিশাচ। ওদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি না দিলে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। চোর-ডাকাতের দয়াতে তো মানুষ বাঁচতে পারেনা। ওদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। হাত দুটো যদি কেটে ফেলে দেয় তা হলেই বোধ হয় আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।

ঘুম! তা বটে। ওদের হাত কাটলে ঘুমোতে পাবে নিশ্চিন্তে। আশ্চর্য!

বন্ধুদের এসব আলোচনা শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠত মাও সে-তুং।

যখন এসব আলোচনা হতো তখন মাও মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ করত, বলত, ওরা ডাকাত নয়, ওরা চোর নয়। ওরা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। পেটের দায়ে যেমন এই সব ভিখিরী এসে ভীড় করেছে শহরে তেমনি ওরাও পেটের দায়ে ভিক্ষা করতে না পেরে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওরা বঞ্চনাকে সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করেছে।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে ব্যঙ্গ করত মাওকে।

একজন বলল, তোর মাথা খারাপ। ডাকাতকে ডাকাত বলবি না,

চোরকে চোর বলবি না। কোনদিন বা তুই বাবাকে বাবা বলতে কষ্ট পাবি।

মনে মনে কষ্ট হতো মাও। তবুও বলত, নারে না ওদের বড় কষ্ট। ধনী-চাষীর ঘরে জমিদারের ঘরে খাবার মজুত আছে অথচ ওরা খেতে পায় না। ওদের কষ্ট তোরা বুঝবি না।

দরকার নেই আমাদের বুঝে। তুই একাই বুঝে নে। আজ থেকে তোর খাবারটা ওদের দিস তা হলে ওরা আর চুরি-ডাকাতি করবে না।

আমার একার খাবার দিয়ে কি সবার পেট ভড়বে! আমরা সবাই দিলেও ভড়বে না। তোরা যা মনে করছিস এ তা নয়। ওরা ডাকাত নয়। খেতে পেলে নিশ্চয়ই ওরা ডাকাতি করত না। আমি গ্রামের ছেলে, আমি জানি ওদের কি দুঃখ। ওদের যে কিছুই নেই। মেহনত করে খায় কিন্তু এখন কাজ দেবার লোকও নেই। মজুরী পাওয়ার পথও বন্ধ। কেউ খেতেও দেয়না কাজও দেয়না তাই ওরা হামলা করেছে নিজেদের বাঁচাতে।

তুই একটা আস্ত পাগল। মাথায় বড় হলে বুদ্ধিতে বড় হয় না, শুনেছিস তো মাষ্টারমশায়ের কথা। যেমন তুই ঢ্যাঙা তেমনি তোর মোটা বুদ্ধি। চোর-ডাকাতরা যেন তোর ঘরেরই লোক। এত দরদ যখন তখন তুইও তো ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারিস।

তোরা ঠাট্টা করছিস। সত্যিই ওরা ডাকাত নয়।

দেখা যাবে বিচার তো হবে। বিচার হয়ে যদি ওরা খালাস পায় তা হলে বুঝব ওরা ডাকাত নয়, নইলে ওদের ডাকাত বলে স্বীকার করবি তো?

না।

কেন?

কে বিচার করবে? যারা অভিযোগ করে তারাই বিচার করে। সুবিচার লাভ তাতে হয় না। সরকার ফরিয়াদী, সরকার বিচারক। এতে সুফল কেউ পেতে পারে না।

তুই যে কি বলিস তার মাথা মুণ্ডু নেই। অভিযোগ করছে গ্রামের চাষীরা, গৃহের মালিকরা। আর বিচার করছে সরকারী হাকিম। দুই জন কি এক লোক।

একই লোক। ওদের স্বার্থ এক। যাদের স্বার্থ এক তারা লোক হিসেবে দুই হয় না। আর বিচার তো মানবিকতার ধার ধারে না। তাই বিচার হয় প্রহসন।

বন্ধুরা স্বীকার করত না মাওয়ের কথা। হাসত তার কথা শুনে। শেষ পর্যন্ত তারা স্থির করল, মাওয়ের মগজে কতকগুলো স্ক্রু ঢিলে তা না হলে এমন কথা কেউ কখনও বলতে পারে।

বিচার অথবা বিচারের অভিনয় চলতে থাকে একতরফা।

আজ খবর শোনা গেল অমুক দস্যুদলের আটজনের ফাঁসি হয়ে গেল।

পরের দিন আবার জানা গেল, আরও কতকগুলো ডাকাতের ফাঁসি হয়ে গেছে।

সংবাদ শুনেই অস্থির হতো মাও সে-তুং। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা না করে চুপ করে বসে বসে ভাবত। মনে মনে ভাবত অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে তবুও তো ওরা মৃত্যুর দিন অবধি দুটো খেয়ে মরছে। এরা যখন বাইরে ছিল তখন অনাহার ছিল নিত্যকার সঙ্গী। জেলখানার কদর্য আহার্যও ওদের পক্ষে সৌভাগ্য।

সাওসানেও বড় গোলমাল।

সেখানকার জমিদার বাড়িতে হামলা করতে গিয়েছিল একদল কৃষক, তাদের দাবী ছিল আহার্য। রুটির বদলে তারা পারিতোষিক পেয়েছিল গুলি। নিরস্ত্র মানুষরা ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করল জমিদার বাড়ি। জমিদারের ক'জন পেয়াদা মরল সেদিনের সংঘাতে। চাষীদেরও ক'জনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সেদিন।

কো লাই-হুই ছিল এদের নেতা। তার আস্তানা ছিল পাহাড়ের গুহায়। সেখান থেকে সে আক্রমণ শুরু করল জমিদারদের ওপর। পর

পর আঘাত হানতে থাকে অত্যাচারী জমিদারকে। কো লাই-হুই সব রকম প্রস্তুতি রেখে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। হঠাৎ একদিন তার পাহাড়ী আস্তানা ঘেরাও করল সরকারী ফৌজ। সদলে ধৃত হল কো লাই-হুই।

বন্দী কো লাই-হুইকে টানতে টানতে নিয়ে এল চ্যাংসায়। নামমাত্র বিচার। বিচারে দোষী স্থির করে আদালত তার মৃত্যুদণ্ড দিল। তার সহচররাও নিষ্কৃতি পেল না।

যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসি হল সবাইয়ের। সংখ্যায় তারা মোটেই কম নয়। এ যেন পাইকারী হারে নরহত্যা।

শিউড়ে উঠল দেশের সব মানুষ। বর্বর এই বিচার ব্যবস্থা, ততোধিক বর্বর হল সেই বিচার ব্যবস্থা যা বিচারের নামে নরহত্যাকে প্রশ্রয় দেয়।

মাও সে-তুং শুনল খবর। গভীর ভাবে চিন্তা করছিল কো লাই-হুইয়ের এই অপমৃত্যুর ঘটনা।

বন্ধুরা বলল, কেমন দেখলে তো ডাকাতদের কেমন শাস্তি হয়। ওরা ডাকাত, জাত ডাকাত। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। এবার তোমাদের পাহাড়ী হোনান অঞ্চল ঠাণ্ডা হবে।

দৃঢ়তার সঙ্গে মাও বলল, না।

কেন?

একজন কো লাই-হুইকে ফাঁসি দিলে শান্তি ফিরে আসবে না বন্ধু। আরও কো লাই-হুই জন্ম নেবে পাহাড়ে। মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে আরও অনেক অনেক কো লাই-হুই। তারা দুর্মদ গতিতে চূর্ণ করবে শাসকদের অন্যায় অবিচারকে। যতদিন জমিদারের অত্যাচার চলবে ততদিন অত্যাচারিত চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। একটি বা দুটি জমিদারকে শায়েস্তা না করে শত শত চাষীকে শাস্তি দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার এই ব্যর্থ চেষ্টা সত্যই কৌতুককর।

তুমি তা হলে শান্তি চাও না?

নিশ্চয় চাই। শান্তি তো সমষ্টির। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থরক্ষা করতে ফাঁসির দড়ি সমষ্টির গলায় পড়িয়ে দিলে শান্তি আসে না, আসে অশান্তি। অশান্তিকে চিরস্থায়ী করতেই তো এই ব্যবস্থা। যদি জমিদারদের শায়েস্তা করতে পারত দেশের সরকার তা হলে শান্তির জন্য নরহত্যা করতে হতো না।

তুমি বলতে চাও জমিদার না থাকলে শান্তি আসবে!

আমার বিশ্বাস তাই আসবে। আমার বিশ্বাসের কোথাও কোন ভুল নেই। তোমরা যাচাই করে দেখতে পার। আমার কথা বহু জনের কথা, দু-চার জনের কথা নয়।

বন্ধুরা বিশ্বাস করত না মাওয়ের যুক্তিকে, এমন কি শ্রদ্ধাও করত না তার বক্তব্যকে।

মাও তার জন্য মোটেই দুঃখিত হতো না।

যে লোক সহজে কথা বলত না সেই লোক ক্রমেই মুখর হতে থাকে নিজের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে।

মাও সে-তুং ফিরে গেল সাওসানে ছুটির দিনগুলো কাটাতে। তাকে দেখে উৎফুল্ল হল তার বাবা মা। দু বছরে অনেক লেখাপড়া শিখেছে, অনেক দেখেছে। তার ওপর কিছুটা শহুরে কায়দাও রপ্ত করেছে ইতিমধ্যে।

মাও কর্তা ছেলেকে পেয়ে মনে মনে খুশী হলেও ছেলের অনুপস্থিতির জন্য তার যে বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছে তাও সে ভুলতে পারছিল না। বাইরে মোটেই প্রসন্ন ভাব দেখা গেল না।

তারপর লেখাপড়া কতটা শিখলে? প্রথম প্রশ্ন করল তার বাবা।

তা কিছুটা এগিয়েছি।

তা ভাল। কিন্তু তুমি না থাকাতে আমার ব্যবসার কতটা যে ক্ষতি হয়েছে তা তুমি বুঝবে না। এবার কিছু বেশি মাল ধরে রাখতে পারলে কয়েক হাজার ডলার উপায় সহজ হতো। যাক্ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর।

আমার তো বয়স হয়েছে। বুঝে সুঝে না নিলে তোমাদেরই ভবিষ্যতে কষ্ট পেতে হবে।

মাও সে-তুং কোন কথা না বলে মনে মনে ছটফট করছিল, কত তাড়াতাড়ি সে বাবার সম্মুখ থেকে উঠে যাবে তাই ভাবছিল।

বাইরে তখন বস্তা বোঝাই চাল আর গম গাড়িতে ওঠানো হচ্ছিল।

এ মাল কোথায় যাবে ?

পিকিং, ক্যান্টন, অনেক জায়গায়।

এটা কি ভাল হচ্ছে ?

কোনটা ?

দেশের লোক না খেয়ে মরছে আর তুমি মাল পাঠাচ্ছ শহরে, রাজধানীতে। ওরা কারা ? আরে তোমরা কি চাও ? গাড়ি আটকে রাখছ কেন ?

যারা গাড়ি আটকে দাঁড়িয়েছিল তারা উচ্চস্বরে বলল, আমরা খেতে পাচ্ছি না। কিছু চাল দাও কর্তা। বাইরে চাল পাঠিওনা, আমাদের কিছু দাও।

মাওকর্তা মুখ খিঁচিয়ে বলল, বিনা পয়সার মাল পেয়েছিস নাকি !

মাও সে-তুং বলল, আহা রাগ করছ কেন। ওদেরও তো কিছু দরকার।

তোমার যদি এত দয়া তা হলে চালের দামটা পাইয়ে দাও। তারপর ওদের বিলিয়ে দাও।

তুমি নিষ্ঠুর।

তা তুমি বলতে পার। বুকের রক্ত দিয়ে জমি করেছি, এক একটা পয়সা সঞ্চয় করে শস্যের ব্যবসা করেছি। আজ দুটো খেতে পাচ্ছ আমার সারা জীবনের বুদ্ধি ও মেহনতের জন্য। তা বুঝি ভুলে গেছ ? একদিন ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো দেখেছ, আজ ছাউনির তলায় বাস করে মেজাজ দেখছি বেশ উচ্চগ্রামে চলছে। এসব কি করেছি ছোটলোকদের জন্য। ওরা আমার মত কষ্ট করে কেন

ভাগ্য বদল করতে চেষ্টা করছে না। আমার যখন কষ্ট ছিল তখন তো কেউ কাউকে সাহায্য করতে আসেনি। আমি ওদের কিছুই দেব না।

সেটা কি ভাল হবে। ওদের সম্মুখ দিয়ে ধানচালের গাড়ি শহরে পাঠাবে আর ওরা খেতে পাবে না। এটা মর্মান্তিক। তোমার এ কাজকে মোটেই সমর্থন করতে পারি না।

কথা শেষ করেই মাও কর্তা এগিয়ে গেল জনতার সামনে। বলল, কি চাও তোমরা ?

খেতে চাই কর্তা। আজ ক'দিন হল এক দানাও পেটে পড়েনি।

কিন্তু আমাদের সামর্থ্য কি আছে তোমাদের পেট ভর্তি করার।

ঐ তো তোমাদের গুদাম থেকে শয়ে শয়ে পিকুল ধান চাল বাইরে চালান যাচ্ছে। আমাদের কিছু দাও কর্তা। ভগবান তথাগত তোমাদের মঙ্গল করবেন।

আমাদের পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে। সরকারকে দিতে হবে, তোমাদের দেবার মত কিছুই নেই।

আমরা যে খেতে পাইনা অনেকদিন।

তা বলে এভাবে রাস্তা আটকে রাখলে কি খাবার পাবে ? এটা তো খাবার পাওয়ার পথ নয়। তোমাদের এই কাজকে সমর্থন করতে পারছি না। তোমরা ফিরে যাও, আমরা ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করব। লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করতে আমরা চেষ্টা করব।

জনতা বড়ই দুর্বল। তবুও তাদের প্রতিবাদের এই পথ কোন ক্রমেই সমর্থন লাভ করল না মাও সে-তুং-এর কাছ থেকে। সক্রিয়ভাবে কিছু করতে সাহসও পেল না কেউ-ই। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল বুভুক্ষু জনতা। যাবার সময় অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগল মাও পরিবারকে।

পরবর্তীকালে মাও ভেবেছে তার এই অতীত কর্ম। সেদিন তার মনে ছিল চৈনিক গতানুগতিক চিন্তাধারা। অপরের দুঃখ বুঝবার মত

হৃদয় ছিল কিন্তু এমন রাজনৈতিক শিক্ষা তখন সে লাভ করেনি যার ফলে সেদিনের সমস্যা সমাধানে এগোতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে চিন্তা করার মত ক্ষমতাও বোধ হয় ছিল না।

মাও চীনকে ভালবাসত জাতীয়তাবাদী চীনের অপর সাধারণ মানুষের মত। যখন সে শুনল যে কোরিয়া, তাইওয়ান, ইন্দোচীন, বর্মা ও অন্যান্য অনেক দেশ ও স্থান ছিল চীনের অংশ এবং তা বলপ্রয়োগে অপহরণ করেছে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ অথবা জাপান তখন সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আপশোষ করে বলেছিল, চীনের মুক্তি আনতে চীনের অধিবাসীরাই সক্ষম। এবং 'The duty of all people to help save it.'—চীনের মানুষের কর্তব্য পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা।

আরও বেশি মনে মনে আহত হয়েছিল চীনের ইতিহাস পড়ে। চীন দেশে আফিমের বাজার রক্ষা করতে, চীনের সর্বনাশ করতে আফিম ছড়িয়ে দিয়ে ইংরেজ যা করেছে তা ভুলবার মত ঘটনা নয়। আফিমের বাজার সৃষ্টি করতে আঠারশত চল্লিশসালে 'আফিমের যুদ্ধ', আঠারশত ষাট সালে সম্রাটদের গ্রীষ্মপ্রাসাদ ইংরেজ ও ফরাসীরা যেভাবে পুড়িয়ে দিয়েছিল, আঠারশত পঁচানব্বই সালে জাপান যে ভাবে চীনের ওপর হামলা করেছিল এবং সর্বশেষ উনিশশত সালে পশ্চিমী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে বকসারে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা যখনই তার মনে জেগেছে তখনই সে ব্যথায় মুষরে পড়েছে। এই অন্যায়গুলো জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দানবগোষ্ঠি যে ভাবে চীনের ওপর অব্যাহত গতিতে চালিয়েছে মাঞ্চু সম্রাটদের দুর্বলতায় তা ভেবে মাও সে-তুং মনে মনে গর্জে উঠেছে। নিরুপায়ের মত নিজের হাত নিজে মুচড়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়েছে। মাও বুঝেছে চীনের জনসাধারণ সহযোগিতা না করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে জনচেতনা জাগ্রত করাই হল বর্তমান ধর্ম ও কর্ম।

টাংসান উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসেই মাওয়ের সঙ্গে পরিচয়

ঘটে বৃহত্তর পৃথিবীর। বিশেষ করে চীনের ইতিহাস তার মনে জাগায় নতুন উদ্দীপনা। মাও তখন পুরোপুরি একজন স্বদেশী-করা চীনা।

বন্ধুদের সঙ্গে অনেক সময়ই আলোচনা হতো অতীতের আফিম যুদ্ধ, গ্রীষ্ম প্রাসাদ ধ্বংস, জাপানের বর্বর আক্রমণ, বক্সার বিদ্রোহ নিয়ে। কিন্তু প্রতি সময়ই মাও অনুভব করত পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় চীন কত অসহায়।

বন্ধুরা বলল, আমাদেরও ইউরোপীয়দের মত যন্ত্রবিজ্ঞান, যুদ্ধ বিজ্ঞানে দক্ষতালাভ করতে হবে। আমাদের অতীত কুসংস্কার ভেঙ্গে ছুটতে হবে ইউরোপীয় শিক্ষা রপ্ত করতে। নইলে চীনের দুর্ভাগ্যের শেষ হবে না।

একদিন ইয়েন ফুর লিখিত প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তুমুল তর্ক সুরু করল সবাই। কোনটা ভাল? দেশী শিক্ষা অথবা বিদেশী শিক্ষা।

একজন সতর্কভাবে বলল, ওসব আলোচনা করিস না ভাই।

আরেকজন বলল, কেন?

জানিস না আমাদের সম্রাজ্ঞী ত-আন ছু-তুংকে এই সব আলোচনার জন্য ফাঁসি দিয়েছিল। ত-আন চেয়েছিল পরিবর্তন। প্রগতিশীল পরিবর্তন, তাও এমন কিছু নয়। তবুও দোয়াগর মহারাণী তাকে বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়ে চীনের বৈশিষ্ট্য রক্ষার নামে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাই বলছি ও-সব আলোচনার দরকার নেই।

মাও মাঝখান থেকে বলল, সেদিন একজনের মুখ বন্ধ করতে মৃত্যু দণ্ডদান যত সহজ ছিল আজ শত শত জনের মুখ বন্ধ করতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া তত সহজ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ধারায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই চীনকে রক্ষা করতে পারবে না এই আমার বিশ্বাস।

কেন পারবে না। ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হলে তাদের মত নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে যন্ত্রবিজ্ঞানে। তা হলেই চীনের মুক্তি সম্ভব।

আরেকজন বন্ধু বলল, আমাদের স্থির করতে হবে কতটা ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন আর কতটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা দরকার।

মাও বলল, জীবনের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, যদি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান জানাতে চাই তা হলে প্রয়োজন দেশের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাকে অটুট রেখে অপরের যা ভাল তা গ্রহণ করা। ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করব ঠিকই কিন্তু আধুনিকতার ছাঁচে তাকে ঢালতে হবে। তার জন্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, যন্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা মোটেই ইউরোপীয় শক্তিকে বড় করেনি। তাদের সাম্রাজ্যবাদী আচরণের পেছনে রয়েছে জাতীয় চরিত্র, সেই চরিত্র গঠন যদি চীন করতে না পারে তা হলে সাম্রাজ্যবাদের সমরলিপ্সুদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। তারা এই লুঠের ধন দিয়ে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করতে যে চিন্তাধারা, যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার আশু ফলস্বরূপ যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছে তা যতদিন না চীনের মানুষ গ্রহণ করছে ততদিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের সামনে চীন তুচ্ছ প্রমাণিত হবে।

বন্ধুরা মাওয়ের যুক্তি অস্বীকার করতে পারল না। অনেকেই এই লম্বা রোগা ছেলেটির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকে বেশ সমীহ করতে শিখল।

মাও তখন বড়ই ব্যস্ত কং-আং য়ু-ওয়েই এবং লিয়াং চি-চা আও নিয়ে। তাদের লেখা বইগুলো বারবার পড়ছে মাও। সেই সঙ্গে পড়ছে চীনের ইতিহাস। মাও পড়ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদের জীবনী, মাও পড়ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারকদের জীবনী। বিশেষ করে নেপোলিয়ন আর ওয়াশিংটনের জীবনী তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

মাঝে মাঝেই বন্ধুদের বলত, ওয়াশিংটন আট বছর অবিরাম যুদ্ধ করে আমেরিকার স্বাধীনতা এনেছিলেন। তাঁর মত একজন নেতা আমাদের দেশে যদি থাকত তা হলে আমাদের দেশও পরপীড়ণ মুক্ত হয়ে ঐশ্বর্যশালী হতে পারত। যদি তা না জন্মায় তা হলে আনাম, কোরিয়া ও ভারতের মত দুর্ভাগ্য বহন করতে হবে চীনকে। নিজের শক্তিকে সংহত করতে না পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

মাও বলল, আপনি চেষ্টা করলে কিছুনা কিছু হবেই হবে।

তুমি আজই তো বললে অন্তত চব্বিশ ঘন্টা সময় আমাকে দাও। দেখি কি করতে পারি। আগামী কাল একবার এস।

মাও ভালবাসত বীর যোদ্ধাদের কাহিনী পড়তে। টাংসানে পড়বার সময় বীরকাহিনী পড়তে পড়তে সামরিক বিষয়ে তার আগ্রহ জন্মাতে থাকে। বিশেষভাবে যুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে মাও। পরবর্তী জীবনেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

জীবনের কতকগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা মাওকে দ্রুত শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নেয়।

টাংসানের পাঠ্য জীবনে নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করতে পেরেছিল ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কিন্তু সমাজ সচেতনতা বলতে যা বুঝায় তা তখনও তার মনে দানা বাঁধতে পারেনি।

মাওয়ের বাবা ছিল পড়াশোনার বিপক্ষে। সেজন্য পড়তে যখন সুযোগ পেল মাও তখন তার সহপাঠীদের চেয়ে সে ছিল বয়সে বড়। মাওয়ের বাবা সম্পন্ন চাষী হলেও যে বিদ্যালয়ে মাও পড়ত সেখানে তার সহপাঠীরা সবাই ছিল ধনীর সন্তান—বড় বড় জমিদারের ছেলে। জমিদারের ছেলেরা মূল্যবান পোষাক পড়ে আসত বিদ্যালয়ে। আর মাওয়ের বিদ্যালয়ে যাবার মত একটির বেশি পোষাক ছিল না। অন্য যে সব জামা কাপড় সে পড়ত তা অতি সাধারণ পোষাক।

সহপাঠীদের চেয়ে মাথায় ছিল লম্বা, পোষাকও ছিল অতি সাধারণ, গ্রামের ছেলে তাই শহরের আদব-কায়দাও বিশেষ রপ্ত করতে পারেনি তখনও। তাই সহপাঠীদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তাকে সহ্য করতে হতো সব সময়। অনেকেই তার মাথার বেণী ধরেও টানাটানি করত। টাংসানেই মাও পরাধীনতা চিহ্ন বেণীটি কেটে ফেলে প্রথম বিদ্রোহ জানাল অন্যায় রীতির বিরুদ্ধে।

সহপাঠী সিয়াও য়ু বলত, মাও গোঁয়ার, নিষ্ঠুর ও ক্রোধী।

মাওয়ের যে কোন গুণ থাকতে পারে তা স্বীকার করত না তার

সহপাঠীরা বরং তার আচার-আচরণকে এমন ছোট চোখে দেখত যাতে মাও সব সময় মনে মনে আহত হতো।

শিক্ষকরা কিন্তু ভালবাসত মাওকে।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাও একদিন শিক্ষককে বলল, আমি চ্যাংসায় কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে চাই, তার জন্য সুপারিশ দরকার। আমাকে একটা সুপারিশ-পত্র দিলে খুবই উপকার হয়।

শিক্ষকমশায় মাওয়ের মেধাকে বিশ্বাস করেন, মাও যে পড়াশোনায় উন্নতি করবে সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। বিনা দ্বিধায় তাকে সুপারিশ-পত্র লিখে দিলেন শিক্ষকমশায়।

মাও আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে তখনও দুলছে। এই সুপারিশের জোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে কিনা সেই চিন্তায় সে বিভোর। অনেক ভেবেচিন্তে একদিন জাহাজে উঠে বসল মাও। জাহাজ ছুটল চ্যাংসার পথে।

টাংসান ছিল মাওয়ের কাছে বিরাট একটি শহর। চ্যাংসায় এসে মাওয়ের ধারণা গেল বদলে। পৃথিবীর চেহারাটাও দেখতে পেল নতুন করে। কিন্তু যে ভীতি নিয়ে এসেছিল চ্যাংসায় সে ভীতি কাটাতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। মাও সহজেই স্থানলাভ করেছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। চ্যাংসার নর্মাল বিদ্যালয়ে স্থানলাভ করে মাও হল পরিতৃপ্ত, জ্ঞানলাভের যে অদম্য তার পিপাসা এবার বুঝি তার পরিপুষ্টি ঘটবে!

খবরের কাগজ।

রোজ সকালে খবরের কাগজ আসে অনেকের ঘরে। পাঠ্য বইয়ের মত একই কথা বারবার পড়তে হয়না সংবাদপত্রে। নিত্য নতুন পাঠ্য বস্তু নিয়ে হাজির হয় পাঠকের দরজায়। স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা করে একটা কাগজ নিতেন রোজ। মাও সুযোগ পেলেই কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে নিত কিন্তু একেবারে নিজস্ব করে পড়তে পেত না।

একদিন শিক্ষকদের কাছে আবেদন করল, স্যার কাগজখানা যদি রোজ আমাকে পড়তে দিতেন তা হলে—

তা হলে কি হয়?

কি হয়। তাব লতে পারি না। তবে অনেক খবর জানতে পারি। জানার ইচ্ছা থাকলে কাগজ কিনতে হয়। কাগজ কিনে পড়তে হয়। অত পয়সা থাকলে কি আপনাদের কাছে কাগজখানা চাইতাম। পয়সা যে নেই স্যার। যার পয়সা নেই সে কি শিখতে জানতে পারবে না?

শিক্ষকমশায় মাথা চুলকে বললেন, আচ্ছা ছুটির পর আধ ঘন্টা করে কাগজখানা নিয়ে তুমি পড়তে পার। তবে ছিঁড়োনা যেন। আর ভীড় জমিও না।

মাও যত্ন সহকারে কাগজখানা পড়ে ফেরৎ দিত। যা পড়ত তা নিয়ে তুমুল আলোচনা করত পরদিন সহপাঠীদের সঙ্গে। কোন সময় তর্কের মীমাংসা না হলে শিক্ষকদের শরণাপন্নও হতে হতো। বিশেষ করে কাগজখানা ছিল সান ইয়াত সেনের দলীয় মুখপত্র। সেজন্য তর্ক গড়াত অনেক দূর।

জাতীয়তাবাদের জোয়ারে তখন গোটা চীনদেশ কানায় কানায় ভর্তি, আর এই জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ পূজারী সান ইয়াত সেন ছিলেন নবযুবকদের 'হিরো'। সান ইয়াত সেনের দলীয় মুখপত্র শিক্ষিত চীনাদের বেদ। এই পত্রে যা ছাপা হতো তা নিয়ে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠত শিক্ষিত সমাজ।

এই কাগজের সংবাদ পড়ে লাফিয়ে উঠল মাও, এই দেখ হুয়াং সিং ক্যান্টন আক্রমণ করেছে। এবার মাঞ্চু বংশ নিপাত যাবে।

বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলেছিল, সম্রাজ্ঞীর কাছে এসব দস্যুদের পরাজয় নিশ্চিত।

কখনই নয়, জোর দিয়ে বলেছিল মাও।

সবাই হেসেছিল।

সত্যিই ক্যান্টনের অভ্যুত্থান দমন করেছিল সরকার। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টায় সান ইয়াত সেনের এই হল শেষ পরাজয়।

মাওয়ের হিসাব যে ভুল তা বুঝতে পেরে কিছু দিন কোন

আলোচনায় যোগ দিল না মাও। পরবর্তী ঘটনার জন্য সে দিন গুণছিল।

চ্যাংসার পাঠ্যাবস্থা ছিল স্বল্পকালীন। কিন্তু এই স্বল্পকালেই বহু-কালের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল মাও। তার মনে সমাজের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছিল ঠিকই কিন্তু তার গতি ও প্রকৃতি কোন বৈজ্ঞানিক ধারায় প্রবাহিত হতে পারেনি। আংশিক কারণ চীনের অতীত তার মনের অবচেতন ক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। আবার তার মমতাভরা মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ঘটাত ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিসত্ত্বা। তবুও মাও এখান থেকেই প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকে।

দশই অকটোবর উনিশ শ' এগার সাল।

সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে মাও বলল, এই দেখ, এবার তো প্রজাতন্ত্রীদের জয় হয়েছে।

সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলল, শেষ না দেখে কি করে বলবি।

শেষ হয়ে গেছে। সরকারী ফৌজ আত্মসমর্পণ করেছে। এরপর আর দেখার কি আছে।

আছে আছে। রাজধানী থেকে নতুন সৈন্য আমদানী করে এদের শায়েস্তা করবে সরকার।

তোরা কি প্রজাতন্ত্র চাস না?

প্রজাতন্ত্র বলতে কি বুঝায় তাই তো জানি না। এক রাজা গেলে আরেক রাজা আসবে এই তো আমরা জানি।

রাজা আর থাকবে না রে।

তা হলে রাজ্য চালাবে কে?

দেশের লোক। সবাই মিলে যুক্তিবুদ্ধি করে চালাবে।

তা হলেই হয়েছে। রাজা নেই, রাজ্যও নেই। ওসব কথা বলে লোক ভুলাতে পারবি না।

তুং মেং-হুই-এর নাম শুনেছিস ?

শুনেছি। তুই বুঝি তার সদস্য ?

না। তবে এবার হব। সত্যিই যদি চীনকে বিদেশীর খপ্পর থেকে মুক্ত করে আমরা দেশকে ঐশ্বর্যশালী ও সুখী করতে চাই তা হলে সবার উচিত এই তুং মেং-হুই-এর সদস্য হওয়া, সবার উচিত এই লড়াইয়ে সামিল হওয়া।

আস্ত পাগল। প্রাণের কিছু দাম আছে। আমরা সদস্য হতে রাজি কিন্তু যেদিন সরকারী ফৌজ এসে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে মাথা নামাবে ঘাড় থেকে সেদিন ঘাড়ের ওপর মাথা বসাবার দায়িত্ব তুই নিতে পারবি কি ? মুখে বড় বড় কথা বলা যায়, কাজের সময় দেখবি সব পালিয়েছে।

ক্রুদ্ধভাবে মাও বলল, তোরা হোনানের কলঙ্ক। চীনে যতদিন একজন হোনানী বেঁচে থাকবে ততদিন সম্পূর্ণভাবে জয় করা কারও সাধ্য নেই। অথচ তোরা হোনানী হয়ে দেশের এই দুর্দিনে বিলাস ব্যঙ্গ পরিহাসে দিন কাটাচ্ছিস। তোদের আর কি বলব !

মাওকে কিছুই বলতে হয়নি।

পরদিন স্কুলের দেওয়ালে সান ইয়াত সেন আর তুং মেং-হুই-এর প্রশংসার প্রশস্তি লিখে মাও টাঙ্গিয়ে দিল। মাওয়ের জীবনে এই প্রথম সবল লেখনী ধারণের দুর্বল চেষ্টা। ছেলেরা পড়ল তার বক্তব্য। তার যুক্তি খণ্ডন করতে না পারলেও সবাই তাকে সমর্থন জানায়নি সেদিন। গোপনে দু একজন তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন রইল না।

বাইশে অকটোবর। সূর্য তখনও ওঠেনি। কেমন থমথমে ভাব শহরে। সরকারী ফৌজ মাঝে মাঝে টহল দিচ্ছে শহরের পথে। সাধারণ নাগরিকদের চোখে প্রশ্ন। গতরাত থেকেই কিসের যেন প্রস্তুতি চলছে।

হোস্টেলের ছেলেদের সামনে এসে শিক্ষকরা বলল, তোমাদের পিতামাতা ও অভিভাবক আমাদের হেপাজতে তোমাদের পাঠিয়েছে।

তোমাদের নিরাপত্তা রক্ষা আমাদের কর্তব্য। আমাদের মনে হচ্ছে শহরে আজ গোলমাল হতে পারে।

গোলমাল কেন হবে?

কেন হবে সে প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি তোমাদের নিরাপদ স্থানে পাঠাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে। তোমরা দুদিনের খাবার সঙ্গে করে পেছনের ঐ পাহাড়ে আশ্রয় নেবে, পরিস্থিতি ভাল মনে করলে ফিরে আসবে, নইলে পেছন পথ দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে যাবে। দেরী করো না। শীগ্গীর।

শীগ্গীর বললেই শীগ্গীর হবে কি?

হতেই হবে। আর সময় নেই।

দূরে গোলমাল শোনা যেতেই শিক্ষকরা বললেন, তাড়াতাড়ি। যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে যাও। আর দেরী করো না।

ছেলেরা যে যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমনিভাবে ছুটে চলল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ে পৌঁছবার আগেই শোনা গেল বন্দুকের শব্দ। শোনা গেল ভয়ঙ্কর গোলমাল। শহরের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ তখন নিরাপদ এলাকায় পালাতে ব্যস্ত।

শহরের একটি দেউড়ি দিয়ে চিয়াও তা-ফেং তার বিপ্লবী সৈন্যদল নিয়ে বিনা বাধায় প্রবেশ করল শহরে। অপর দেউড়ি দিয়ে চএন সাও-মিন প্রবেশ করল তার বাহিনী নিয়ে। কোথাও কেউ বাধা দিল না। যা সামান্য বাধা দিয়েছিল কিছু সরকারী সৈন্য তারা নিমেষেই আত্মরক্ষার জন্য পালাতে লাগল। চিয়াও ও চএন মিলিত হল শহরের মধ্যস্থলে। সেখান থেকে উভয়ে এক সঙ্গে আক্রমণ করল প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রাসাদ।

প্রাসাদ সুরক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট থাকলেও বিপ্লবীদের সম্মুখীন হতে সাহস পেল না প্রাসাদরক্ষী শাসনকর্তার দেহরক্ষীরা। শাসনকর্তা তার বিপদ বুঝতে পেরেছিল আগেই। সেই জন্য প্রাসাদ প্রাচীরের পেছনে আগেই একটি ফুটো করে রেখেছিল। বিপ্লবীরা প্রাসাদ আক্রমণ

করতেই শাসনকর্তা সেই ছিদ্রপথে সপরিবারে পালিয়ে গেল শহর থেকে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিপ্লবীরা হোনানের রাজধানী দখল করল। বলতে গেলে অতি সামান্যই রক্তপাত ঘটেছিল সেদিন।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা ও অনেক শহরবাসী প্রত্যক্ষ করল এই অভিনব যুদ্ধ ও তার ফলাফল। এত সহজে ও সংক্ষেপে যে একটা যুদ্ধপর্ব শেষ হতে পারে তা ভাবতেও পারেনি কেউ।

মাও দেখতে পেল সাদা ফেষ্টুন উড়ছে শত শত। তাতে বড় বড় হরফে লেখা আছে "তা হান সিন-কুয়ো ওয়ান সুই"—হান প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।

বিপ্লবীরা চিৎকার করছে 'সিন-কুয়ো'—প্রজাতন্ত্র। জয় প্রজাতন্ত্রের জয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বদলে গেল চ্যাংসার জীবন। শহর-বাসীরা সাদরে গ্রহণ করল বিপ্লবীদের, মেনে নিল প্রজাতন্ত্রের নির্দেশ।

সবাই ধীরে ধীরে ফিরে এল যে যার বাসস্থানে।

মাও দেখা করল চিয়াও ও চএন-এর সঙ্গে। এরা দুজনেই মাও-এর স্কুলেরই ছাত্র। এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করেই চিয়াও ও চএন বিপ্লবী কর্মধারায় আত্মসমর্পণ করেছে। আজকের এই যুদ্ধে এরাই ছিল নেতা। এদের অভিনন্দন জানাতেই গিয়েছিল মাও। আশ্চর্য হয়ে গেল তার সেই সব সহপাঠীদের দেখে যারা গতরাত্রেও তার সঙ্গে তর্ক করেছে বিপ্লবের অসাফল্যকে আহ্বান জানিয়ে। তারা সবসময়ে বলে এসেছে, সমাজদ্রোহী, গুণ্ডা ইত্যাদি বলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঐসব ছেলেরাই সবার আগে এসেছে চিয়াও এবং চএনকে অভিনন্দন জানাতে। মাও থমকে দাঁড়াল। সে নতুন এসেছে শহরে। স্কুলের ছাত্র ভিন্ন খুব বেশি লোকের সঙ্গে জানাশোনা নেই। যারা তাকে জানে তারা আজ তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

সিন্‌-হাই একই স্কুলের ছাত্র।

দূর থেকে মাওকে দেখে কাছে এগিয়ে এল।

তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে মাও?

দেখছি। দেখতে এসেছি, দেখেই ফিরে যাচ্ছি।—মৃদুস্বরে উত্তর দিল মাও।

চিয়াও-চএন-এর সাথে দেখা করবি না?

কি লাভ?

ওরা যে আমাদের স্কুলেরই ছাত্র ছিল। আমাদের গৌরব ওরা বৃদ্ধি করেছে, অভিনন্দন জানাবি না। এ কেমন কথা।

তোরা তো অভিনন্দন জানিয়েছিস।

আমরা হুজুগে মেতে যা করার তা করিনা. যা না করার তা করি। আমাদের কথা ছেড়ে দে। তোর আগ্রহ আছে, তুই বুঝিস প্রজাতন্ত্র—রাজতন্ত্র। তোর সঙ্গে ওদের পরিচয় থাকা দরকার। চল আমরা দুজনেই দেখা করব মুখোমুখি।

মাওয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সিন্‌-হাই। অনেক ভীড় ঠেলে অনেক সময় নষ্ট করে দুজনে যখন পৌছল তাদের কাছে তখন শহরের বড় বড় লোকেরা ব্যস্ততার সঙ্গে এই দুই বীর নেতাদের পরিচর্যা করতে ছুটোছুটি করছে। ওদের দেখেই যেতে বাধা দিল তারা। বলল, তোমাদের কি চাই?

আমরা চিয়াও এবং চএন-এর সঙ্গে কথা বলব, বলল সিন্‌-হাই।

কথা বলার সময় নেই ওদের। দূর থেকে দেখেই ফিরে যাও।

তোমরা কথা বলছ কি চিয়াও আর চএন-এর সঙ্গে?—জিজ্ঞেস করল মাও।

অবাক হয়ে গেল শহরের ধনী ব্যক্তিটি। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমরা কথা বলব না তো কি তোরা বলবি?

মাও অবাক হয়ে গেল লোকটির কথা শুনে। প্রজাতন্ত্রের বড় প্রজা শহরের ধনীসম্প্রদায় এবং প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়েছে যেন ঐ

ধনীদের জন্যই। মাও বিরক্তির সঙ্গে বলল, তোমরা কথা বলতে পার আর আমরা পারি না। কেন, পারি না? তোমাদের জন্য প্রজাতন্ত্র না সবার জন্য। আমরা কথা বলবই।

গোলমাল শুনে চএন এগিয়ে এল।

কি চাই তোমাদের?

তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। আমরা নর্মাল স্কুলের ছাত্র। তোমরাও এই স্কুলের ছাত্র ছিলে তাই এসেছি। কিন্তু এরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে দেবে না বলছে।

চএন খুশী হল মাওয়ের কথা শুনে। হাসতে হাসতে বলল, এসবে রাগ করতে নেই। শীগ্‌গীরই আমরা তোমাদের স্কুলে যাব। তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। কেমন খুশী তো?

নিশ্চয়।

খুশী মনেই ফিরে এল তারা দুজন।

স্কুলে এসেই রাষ্ট্র করে দিল চএন-এর প্রতিশ্রুতি। তখন প্রতিযোগিতা স্থুরু হল চএন ও চিয়াকে কি ভাবে অভিনন্দন জানান হবে। প্রস্তুতিও চলল।

প্রস্তুতি শেষ হবার আগেই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। চিয়াও ও চএনকে তার বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে।

কেন?

এই কেন অজ্ঞাত ছিল না কারও কাছে। তখন ত্রাসের রাজ্য চলছে।

তান ইয়েন-কাই হত্যা করিয়েছে এদের। তান জমিদারদের প্রতিনিধি আর চএন-চিয়াও হল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। জমিদারদের স্বার্থহানীর সম্ভাবনা দেখা দিল চএন-চিয়াওয়ের শাসনব্যবস্থায়। গোপনে সৈন্য বাহিনীতে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চলতে থাকে। জয়ের নেশায় তখন বিপ্লবী সৈন্যরা মশগুল। ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতিয়ার হল তারা। অর্থের লোভে প্রকাশ্যে

বিনা অপরাধে দুই বিপ্লবী বীরকে হত্যা করল তারা। তাদের মৃতদেহ সদর রাস্তায় ফেলে রাখল যাতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাও নিজেও দেখে এল তাদের মৃতদেহ।

ছাত্ররা গোপনে আলোচনা করল, এদেশের সাধারণ মানুষের যারা উপকার করতে চাইবে তাদের ভাগ্যে থাকবে মৃত্যু। মাঞ্চু রাজবংশ যা করেছে তাই করছে জমিদারি প্রভাবান্বিত প্রজাতন্ত্রের ভেকধারী বিপ্লবীরা। চএন ও চিয়াও ছিল দরিদ্র, তাদের লড়াই ছিল দরিদ্রকে শোষণমুক্ত করার। হয়ত তাতে ছিল না কোন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কিন্তু সেজন্য তারা মোটেই ছোট নয়। তাদের দরদী প্রাণই বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিল জনসাধারণের মনে অথচ তাদেরই প্রাণ দিতে হল ধনীর কোপে। ভবিষ্যতে ধনবানদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য তান ইয়েন-কাই এই জঘন্য নৃশংস রক্তের নেশায় মেতেছিল। এতে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সমাজব্যবস্থা তখন অনুকূল ছিল।

মাও গভীর ভাবে চিন্তা করেছে সেদিন।

মৃত্যু ওদের প্রাপ্য ছিল কিনা তাও ভেবেছে, কোন উত্তর খুঁজে পায়নি।

আবার আলোচনা সভা বসল ছাত্রদের। এদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল এই সশস্ত্র বিপ্লবে ছাত্ররা যোগ দেবে কিনা।

বেশির ভাগ ছাত্রই সৈন্যদলে যেতে নারাজ তবে অন্যভাবে বিপ্লবকে সাহায্য করতে আগ্রহী।

মাও কিন্তু সৈন্যদলে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করল।

বন্ধুরা বলল, কেন তুই সৈন্যদলে যোগ দিবি ?

দেশকে রক্ষা করতে হলে শক্তিশালী দেশরক্ষা বাহিনী দরকার, উত্তর দিয়েছিল মাও।

সবাই যদি যুদ্ধ করতে যায় তা হলে অন্য কাজ কে করবে ?

সবাই তো যাচ্ছে না।

শক্ত সমর্থ চাষীর ঘরের ছেলে, দিন মজুরের ছেলে এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করতে। ভদ্রসন্তানদের কজন গেছে বল দেখি।

যাওয়া উচিত। যুদ্ধবিদ্যা শেখা বাধ্যতামূলক হলে তবেই দেশের উন্নতি।

তুই যেন জন্ম থেকেই লড়াই করতে ভালবাসিস। রক্তের ওপর তোর কেমন একটা নেশা। আমরা কিন্তু সহজে তা পারব না।

তোরা ধনীর সন্তান। তোদের ভবিষ্যৎ আছে। আমি চাষীর ছেলে, আমি যুদ্ধে গেলে কেউ হা-হুতাশ করবে না। যখন ফিরে আসব তখন আবার হাল-লাঙ্গল তুলে নেব হাতে। আমাদের সব সমান। আর ভদ্রলোকরা যদি দেশকে ভালবাসতে না শেখে তা হলে যাদের আমরা অভদ্র মনে করি তারা কেন আসবে, কেমন করে তারা বুঝবে দেশের স্বাধীনতার মূল্য। সেনাপতি যদি রণক্ষেত্রের পেছনে থাকে তা হলে সৈন্যরা কেন প্রাণ দেবে। কারও প্রাণের মূল্য কি কম! বিপ্লবকে সম্পূর্ণ ও ত্বরান্বিত করতে চাই।

তুই যা ভাল বুঝিস কর, আমরা পারব না।

সত্যিই মাও সে-তুং সৈন্যদলে নাম লেখাল। তার ইচ্ছা ছিল হুপেই গিয়ে য়ুনানের সৈন্যদলে নাম লেখাবে। শেষ পর্যন্ত তা আর হল না, স্থানীয় সৈন্য বিভাগেই নাম লেখাল মাও সে-তুং। কিন্তু চএন ও চিয়াওয়ের হত্যাকারী তান ইয়েন-কাইয়ের কাছে মাথা নত করতে হল, স্বীকার করল তার প্রাধান্য।

মাও কর্ণেল চাও হেং-তির অধীনে কাজ পেল সেপাইয়ের। মাওয়ের বয়স তখন আঠার।

সকাল বিকেল মার্চ করছে। বন্দুক কামান চালানো শিখছে।

বেশ আনন্দেই আছে মাও।

বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল তার নতুন জীবনের ধারা। মাও খুব খুশী। কিন্তু খুশীর আমেজ বেশি দিন রইল না। ছয় মাসের মধ্যেও তাকে পাঠান হল না কোন যুদ্ধক্ষেত্রে। শত্রুর মুখোমুখি হবার কোন

সুযোগই পেল না মাও। অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল, বাহিনীর অফিসারকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু যুদ্ধ করা বা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ হবার আগেই বিপ্লব সাফল্যলাভ করল। মাঞ্চু রাজবংশ উচ্ছেদ হল।

সৈন্য বাহিনীতে থাকবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। মাও বিদায় চাইল বাহিনী থেকে। তার আবেদন গ্রহণ করল সৈন্য বিভাগ। মাও ফিরে এল অসামরিক জীবনে। মাত্র ছয় মাসের সৈন্য জীবনে শৃঙ্খলা-বোধ শিখল, শিখল যুদ্ধের নিয়মকানুন, শিখল মারণাস্ত্র ব্যবহার। বাস্তবত যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে না হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে মাও অনেকটা এগিয়ে গেল ছয় মাসের সৈনিক জীবনে।

মাও বন্ধু পেল অনেক।

খনি শ্রমিকদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় করার সুযোগ পেল। লোহারদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেল।

সেপাই মাও পেত দশ ডলার বেতন। ফৌজের সেপাইরা নিজের জন্য খাবার স্নান করার জল এনে নিত কিন্তু মাও মনে করত সে যে পরিবারের ছেলে এবং যে রকম শিক্ষিত তার পক্ষে এই জল আনা অসম্মানজনক। সেই জন্য জল আনার চাকর রেখেছিল, তার কাছ থেকে জল কেনার জন্য কয়েক ডলার ব্যয় করত, বাকি টাকা দিয়ে অবসর সময় যাপনের জন্য সংবাদপত্র ইত্যাদি কিনত।

জাপান থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছিল চিয়াং ক-ওয়াং-হু। জাপান থেকে এসেই কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে চিয়াং ক-ওয়াং-হু চৈনিক সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেছিল। তার লেখা পত্র-পত্রিকা পড়তে পড়তে সমাজতন্ত্রের দিকে মাও গভীরভাবে আকৃষ্ট হল।

সহদৈনিক লি-লিন হুইকে একদিন ডেকে বলল, চিয়াং, ক-ওয়াং-হুর পত্র-পত্রিকা পড়েছিস?

লি অবাক হয়ে মাওয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি চিয়াং-এর নামই শুনিনি।

হতভাগা কোথাকার! সমাজতন্ত্র নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে অথচ তার খোঁজ রাখিস না।

দরকার হয় না। আমরা এসেছি দেশকে সেবা করতে। ডাক্তার সান্ যেমন নির্দেশ দেবে তাই করা হল আমাদের কাজ। বড় কাজ হল অফিসারদের হুকুম তামিল করা। তাই করছি।

আশ্চর্য হয়ে গেল মাও তার কথা শুনে তবু বলল, সমাজ বলতে কি বুঝিস?

তুই যা বুঝিস আমিও তাই বুঝি।

আমি বুঝি মানুষের সমাজ। সেই সমাজে কেউ ছোট, কেউ বড়, কেউ মাঝারি—কত রকম লোক আছে।

এতো চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে।

সমাজতন্ত্র বলছে তা থাকবে না। ছোট-বড় কেউ থাকবে না। সবাই সমান হবে।

লি হাসতে হাসতে বলল, তা কখনও কি হয়। তোকে যদি দেশের রাজা করে দেওয়া হয় পারবি তুই রাজ্য চালাতে। ভগবানের করুণা না থাকলে কেউ রাজা হতে পারে কি? তা পারে না।

নিশ্চয় পারে। আমাদের দেশে এখন রাজা নেই, রাজ্য কি চলছে না?

রাজা না থাকলেও রাষ্ট্রপতি আছে। একই কথা। আমাকে রাষ্ট্রপতি করে দিলে আমি তা হতে পারব কেন? সমাজে ছোট আছে বলেই তো বড়কে দেখতে পাচ্ছিস। বড় যে কত বড় তা বুঝতে হলে ছোট থাকার দরকার।

আমরা তা মনে করি না।

কেন?

আমরা মনে করি অপরকে ছোট করে রেখে ওরা বড় হয়েছে। অপরের কাঁধে পা দিয়ে ওরা ওপরে উঠেছে। তা অসহ্য।

কি যে বলিস মাও। তোর দেখছি মাথা খারাপ হবার জোগাড়।

সবাই যদি সেনাপতি হয় সৈন্য পাবি কোথায়? সৈন্যদের কাঁধের ওপরই সেনাপতি থাকে চিরকাল। মাথাটা ঘাড়ের ওপর থাকে, পা ছুটো ঘাড়ের ওপর থাকে না। যেখানে যা দরকার তাই থাকে।

যুক্তি দিয়ে লি-কে বোঝান যাবে না তা সহজেই বুঝল মাও। হাল ছেড়ে দিল সমাজতন্ত্র শেখাবার।

স্কুলের বন্ধু ইয়াংকে একখানা পত্র লিখল সৈন্য ব্যারাকে বসে। তাতে বিশদ ভাবে লেখার চেষ্টা করল সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে। উত্তরে ইয়াং তাকে লিখল, তোর ভীমরতি ধরেছে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন মানে সোনার পাথরের বাটি। তা কখনও হতে পারে না।

মাও প্রত্যেকের কাছেই বিরূপ মন্তব্য শুনতে থাকে। তবুও তার উৎসাহ কমে না। সহ সৈনিকদের কাছে পেলেই সমাজতন্ত্র বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তার সমাজতন্ত্র শুনতে শুনতে সহ সৈনিকরা বিরক্ত হয়ে উঠল। মাওকে দেখতে পেলেই তারা গা-ঢাকা দিত। বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত তার চিঠির উত্তর দেওয়া বন্ধ করল।

সৈন্যবাহিনী থেকে ছুটি পাওয়ার পর মাওয়ের উৎসাহে ভাটা পড়ল। স্থির করল আবার স্কুলেই ফিরে যাবে। কিন্তু যে জাতীয় শিক্ষা এতকাল গ্রহণ করেছে তাতে সে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। এখন তাকে এমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যা ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপযোগী করে তুলতে পারে তাকে। বিশেষ করে পুরাতন ধারার লেখাপড়া নিয়ে অগ্রসর হবার মোটেই আকাঙ্খা ছিল না তার। পুরাতন শিক্ষাধারা মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে কোন প্রকার সাহায্যই করতে পারেনা এ বিষয়ে তখনকার চৈনিক সমাজ বেশ সজাগ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কি হবে পাঠ্য? কোন শিক্ষা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে? কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না মাও। একবার মনে করে এটা ভাল, আরেক বার মনে করে ওটা ভাল কিন্তু কোনটাই সে নির্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে পুলিশ হবার আকাঙ্ক্ষায় নাম পঞ্জীভুক্ত করল। আবার ঠিক করল সাবান তৈরী করতে শিখবে, তখুনি গিয়ে সাবান তৈরীর স্কুলে গিয়ে নাম লেখালো।

আইনের ছাত্র একটি বন্ধু বলল, ওহে উকীল হলে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে পারবে। আমার মত আইনের স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও।

কতদিন পড়তে হবে ?

তা তিন বছর। তবে ভাল করে না পড়লে পাশ করতে তো পারবে না। তাই ভাল করে পড়তে হবে। যারা উকীল তারা সমাজে সম্মানিত আর মান্দারিণ বলে গণ্য হয়।

কিন্তু অনেক টাকার দরকার।

তোমার বাবার তো অনেক পয়সা আছে। তাকে লিখে দাও। আইন পাশ করলে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা ছবি যদি তার সামনে ধরতে পার তা হলে নিশ্চয়ই তোমার বাবা টাকা দেবেন। তুমি লিখেই দেখ না।

মাও চিঠি লিখল তার বাবাকে।

চিঠির উত্তর পাওয়ার আগেই বিজ্ঞাপন দেখল ব্যবসা বাণিজ্যে কৃতিত্ব লাভ করতে হলে যে ট্রেনিং দরকার সেই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে একটা বাণিজ্যিক বিদ্যালয়। মাও ভর্তি হল সেই বিদ্যালয়ে কিন্তু এক মাসের বেশি সেখানে পড়া চালানো কঠিন হল তার পক্ষে, কারণ সেখানে লেখাপড়া শেখান হয় ইংরেজিতে আর ইংরেজিতে মাওয়ের জ্ঞান ছিল যৎসামান্য।

কোনটাতেই মাও একাগ্রভাবে যোগ দিতে পারল না। অস্থির তার মনের অবস্থা। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর আশা ছেড়ে মাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। তাতেও ঠিক থাকতে পারল না, ছয় মাসের মধ্যে স্কুল ছেড়ে এসে বসল ঘরে। তার বিশ্বাস জন্মাল বাড়ি বসেই পড়াশোনা করার সুযোগ সে পাবে। পরবর্তী ছয়মাস ঘরে বসেই পড়াশোনা করতে থাকে। হুনান প্রাদেশিক গ্রন্থাগারে বসে সারাদিন পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ মনীষিদের রচনা পড়তে থাকে। এই কটা মাস বেশ কেটে গেল। জানার আনন্দে মশগুল।

মাও সে-তুং-এর বাবা বিঘ্ন ঘটাল এই পড়ুয়া জীবনে।

যে কোন কাজেই মানুষ এগোতে চায় তার পেছনে থাকে অর্থের প্রশ্ন। মাওকে নির্ভর করতে হতো তার পিতার আর্থিক সাহায্যের ওপর। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলাফেরা করতে দিতে মোটেই আগ্রহী ছিল না তার বাবা-মা। মাও একটি বছর ঘরে বসে পড়াশোনা করার যে পরিকল্পনা তা মোটেই সুচক্ষে দেখেনি তার বাবা মা। তাই আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করল তারা।

তোমাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তার জন্যই আমরা অর্থ ব্যয় করছি। তোমার খেয়াল খুশী মত চলতে দিতে আমরা রাজি নই। এর জন্য অর্থ সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পিতার এই অনুজ্ঞা মাওকে চিন্তিত করল।

ব্যবসায়ী, উকীল, সাবানের কারিগর হওয়া তার জীবন নয়, মাও মনে করল তার উপযুক্ত জীবন হল শিক্ষকতা করা। আর শিক্ষকতা করতে হলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ হল বিধেয়। তার এতদিনের পড়ুয়া জীবনে যে ভাবে বিনা পরিকল্পনায় গড়াশোনা করতে হয়েছে তাতে জ্ঞানলাভ ঘটলেও আধুনিক বিধি সম্মত শিক্ষা গ্রহণ তখনও তার বাকি। কাগজে কলমে যদি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার ছাপ না থাকে তা হলে কোথাও কর্মসংস্থান হবে না তা বুঝতে তার দেরী হল না। বাধ্য হয়েই মাওকে পরিবর্তন করতে হল তার দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবর্তন ঘটাতে হল তার জীবনের গতি ও প্রকৃতি।

মাও চতুর্থ নর্মাল বিদ্যালয়ে ভর্তি হল।

এই বিদ্যালয় থেকে আঠার সালে মাও স্নাতক হল। সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর এই বিদ্যালয়ে থাকাকালীন মাও এশীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে যেমন পরিচিত হল তেমনি সে চীনের আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার

সঙ্গেও পরিচিত হল। এই পাঁচ বছর ছিল মাওয়ের শিক্ষালাভ জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান মুহূর্ত।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগে তার নিজস্ব রাজনৈতিক শিক্ষণ যেমন এগিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি সে লাভ করেছিল তার পরবর্তী জীবনের বন্ধু ও সহকর্মী। এই সময়ে যাদের সঙ্গে মাওয়ের পরিচয় ও হৃদ্যতা ঘটেছিল তারাই তার সঙ্গে ছিল চীনের মুক্তি দিবসের উৎসব দিন অবধি।

মাও বিদ্যালয় থেকে বের হয়েই শিক্ষকতার কাজ নিল। তার অস্থির জীবনে একটিবার এই প্রথম সে স্থির একটি জীবনের সন্ধান পেল। মাও হল শিক্ষক।

বাল্যের সেই পাঠশালার পণ্ডিতের চেহারাটা মাওয়ের মনে ছিল কিনা তা জানা যায়নি তবে নর্মাল স্কুলের পড়ুয়া জীবনে যে দুজন শিক্ষকের প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার জীবনে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যেত মাওয়ের কার্যকলাপে।

মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ হয়েছে ঠিক-ই কিন্তু চীন এখনও মুক্ত হয়নি ইউরোপীয়দের অত্যাচার থেকে।—বলেছিল ৎসাই হো-সেন।

ৎসাই মাওয়ের সহপাঠী। তার বাবা কাজ করত সাংঘাইয়ের অস্ত্র কারখানায়। পিতামাতার ছয়টি সন্তানের জ্যেষ্ঠ। অবস্থা মোটেই ভাল নয় কিন্তু পড়াশোনায় ছিল ভাল। একই ক্লাশে পড়ত দুজন। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত মাঝে মাঝে পড়াশোনার।

আরও একজন প্রতিযোগী ছিল তাদের ক্লাশে। নাম তার হেসিআও হেসি-তুং।

তিনজনই যেমন সাহসী ছিল তেমনি ছিল বুদ্ধিমান ও মেধাবী।

ৎসাই মন্তব্য করতেই হেসিআও বলল, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বল বন্ধু। ওরকম ভাসা ভাসা কথা অচল।

ইউরোপে যুদ্ধ চলেছে এতদিন। আমাদের পাঠ্যজীবন নিয়ে তখন ব্যস্ত ছিলাম।

অবশ্য।

যুদ্ধ শেষ, আমাদের পাঠ্যজীবন শেষ।

অবশ্য।

জার্মান পরাজিত। নাকে খত দিচ্ছে।

তাও ঠিক।

জার্মান পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে যে সব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তা কেড়ে নিয়েছে ইংরেজ, ফরাসী, জাপান আর আমেরিকা।

হেসিআও বাধা দিয়ে বলল, এ সব তো পুরানো কথা। নতুন কি ঘটেছে তাই বল।

প্যারিসে শান্তি সম্মেলন বসেছে তা নিশ্চয়ই জানো।

জানি।

তাতে কি স্থির হয়েছে তা নিশ্চয় খেয়াল আছে। আমাদের সানটুং প্রদেশ ছিল জার্মানের প্রভাবাধীনে। যুদ্ধে পরাজিত জার্মানের অধিকৃত এই সানটুং প্রদেশ চীনকে ফেরৎ দেওয়া উচিত কিন্তু চীন সরকার তার জন্য কোনরূপ আগ্রহী নয়। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করছে না। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা স্থির করেছে জার্মানের যে সব অধিকার ছিল সানটুং-এ তা দেবে জাপানকে।

মাও চুপ করে বসে শুনছিল তাদের কথা। এইবার সে যোগ দিল তাদের কথায়।

এ হতে পারে না। চীনের ভূমি চীনকে ফেরৎ না দিয়ে আরেকটা সাম্রাজ্যবাদীর হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ চীনকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণে চিরকাল আটকে রাখা। চীনের শাসকরা প্রতিবাদ না করলেও চীনের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানাবে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ শুনবে কে?

শাসকরা।

ফল ?

ফল হবে শাসকরা জনমতের চাপে শান্তি সম্মেলনে দাবী জানাবে।

ৎসাই হেসে বলল, বলাটা যত সহজ কাজটা অত সহজ নয়। জনমত গঠন করতে করতে বাজীমাৎ করবে জাপান। তাকে কায়েমী ক্ষমতা দিলেই বন্দুক কামান নিয়ে জাপান এসে বসবে চীনের জমিতে। তারপর তাকে হটাতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি চীনের নেই। জাপান সুযোগ পাবে তার আগ্রাসী নীতিকে বিছিয়ে দেবার। সানটুং থেকে কিয়াংসু হোপেই গ্রাস করতে অকটোপাশের মত হাত পা ছড়িয়ে দেবে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু জনমত গঠন না করতে পারলে এদের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। একমাত্র উপায় বুদ্ধিজীবি সমাজকে সজাগ করা, সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো।

ঠিকই বলেছ মাও। এখন আমরা আর ছাত্র নই। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে যাওয়া খুব সম্ভব হবে না। তবে তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। প্রচার ব্যবস্থাকে জোরদার করা হোক।

ঠিক বলেছ। প্রচার ব্যবস্থাকে জোরদার করতে পারলে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারব নিশ্চিত। বিশেষ করে ছাত্র সমাজে তার প্রভাব পড়বে।

মাও দৃষ্টি ফেরাল ছাত্রদের দিকে। জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে ছাত্ররা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। জনমত সৃষ্টিতে তারা যতটা এগোবে ততটা এগোতে পারবে না স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা। তারা মনে মনে অখুশী হলেও মুখ ফুটে বলতে চাইবে না সহজে।

সেদিন মাওয়ের সঙ্গী ছিল আর একজন। তার সঙ্গেও আলোচনা করেছিল মাও। পরবর্তী জীবনেও বহুকাল এই সঙ্গীটি ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। এই সঙ্গী হলেন ম্যাদাম ইয়াং কাই-হুই। মাওয়ের শিক্ষক ইয়াং-এর কন্যা এবং মাওয়ের প্রিয়তমা। কাই-হুইকে বিয়ে

করেছিল মাও। মাও অপরিসীম ভালবাসত এই মহিলাটিকে। তাদের ভালবাসা মনে হয় কোন পৌরাণিক রূপকথা।

কাই-হুই ছিল সাথী, সচিব। কাই-হুই ছিল স্বামীর সকল কর্মের অংশীদার।

মাও ম্যাদাম কাই-হুই-এর সঙ্গেও আলোচনা করেছিল।

ম্যাদাম কাই-হুই আবেগের সঙ্গে বলেছিল, আমার হাতে যদি একটা বন্দুক থাকত।

তা হলে কি করতে?

ছুটে গিয়ে পিকিংয়ের নপুংসকদের গুলি করে মারতাম।

তাতে লাভ হতো না কাই-হুই। আসল সমস্যা ঠিক ওখানে নয়। আসল সমস্যা হল আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম আর এই অক্ষমতার সুযোগ নিচ্ছে বিদেশী শক্তি।

আমরা কেন নিজেদের শক্তিশালী করিনি?

কেন? সে অনেক কথা। এগার সালের বিপ্লবে আমিও বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সেদিন আমি ভেবেছিলাম মাঞ্চু বংশ ধ্বংস করলে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবে। তাতে সাধারণ মানুষ সুখে থাকবে। তখন ভাবতে পারিনি রাজশক্তির চেয়েও প্রতিক্রিয়াশীল আরেক দল কায়েমী-স্বার্থের লোক গিয়ে বসবে সিংহাসনে। এরা যুদ্ধবাজ কিন্তু তাদের যুদ্ধ নিরস্ত্র অসহায় প্রজাদের বিরুদ্ধে। যারা দেশের সর্বনাশ করছে তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তোলার সামর্থ্য নেই এই সব যুদ্ধবাজদের। উপরন্তু আত্মকলহে আর ব্যক্তিস্বার্থের জোয়ারে ওরা ভাসছে, সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝবার ক্ষমতা ওদের নেই, সে ইচ্ছাও নেই। তাই ওদের গুলি করে মারলে চীনের দুর্দশা মোচন হবে না। সিংহাসন খালি থাকবে না। একটি দস্যু গেলে আরেকটি দস্যু এসে আস্তানা করে নেবে।

তা হলে কি ভাবে সমাধান ঘটবে?

সমাধান অত সহজ নয় কাই-হুই। মানুষের মনের ওপর যদি

আমাদের কথা কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তা হলে আমাদের দুর্দশার শেষ হবে না। আমরা সবাই কি জানি আমরা কোন অবস্থায় বাস করছি। আমরা নিজেদের নিজেরাই চিনি না। অপরের কাছে তুলে ধরবার আগে নিজের কাছে যে ব্যাখ্যা প্রয়োজন তাই তো আমাদের নেই। অনাহারে মহামারীতে, শোষণে মানুষ জর্জরিত। তাদের পথ দেখাতে হলে যে শক্তিকে সংহত করা প্রয়োজন সে শক্তি আমরা সঞ্চয় করতে পারিনি। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন সমাধান আকাশকুসুম।

সেদিনের আলোচনা অসমাপ্ত থাকলেও জনমনে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি সমাজ গুমরে গুমরে উঠছিল। যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব। সবাই অপেক্ষা করছে একটি নির্দিষ্ট দিনের।

চৌঠা মে।

উনিশ শ' উনিশ সাল।

এই নির্দিষ্ট দিনটি এগিয়ে আসছে।

ছাত্র সমাজে প্রস্তুতি চলছে।

সারা চীনের ছাত্র জমায়েত হচ্ছে পিকিং শহরে। বিদেশী কূটনৈতিক দলের সদস্যরা বেশ চিন্তিত। এতদিন যারা অস্ত্রশক্তি দিয়ে ধমকে এসেছে দুনিয়ার মানুষকে, হরণ করেছে দুর্বল জাতির স্বাধীনতা তারা চিন্তাও করেনি চীনের গণমানসে কিসের আগুন জ্বলছে।

শয়ে শয়ে ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছে।

হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী পথে নেমেছে।

লক্ষের ওপর তাদের সংখ্যা।

পিকিংয়ের রাজপথ তাদের পদভরে কম্পিত। কোথায় ছিল এত শক্তি, কে জোগাল এত শক্তি, ভাবতে হয়েছে নেতাদের অনেক কাল। ডাক্তার সান ইয়াত সেনের বিপ্লব বাহিনী মাঞ্চু রাজাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে চীনকে মুক্ত করার দিনও তো এত জনসমাবেশ ঘটেনি চীনের কোন শহরের পথে।

নতুন চীনের স্বপ্নে এরা মেতে উঠেছে। সবার মুখে একটি বাক্য, জাপানকে হঠাও, সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমীশক্তির প্রতারণা সহ্য আমরা করব না।

রাষ্ট্রশক্তি যাদের হাতে তারা এই ছাত্র-ছাত্রীদের শায়েস্তা করতে সৈন্য ও পুলিশ সমাবেশ করতে কোন ত্রুটি করেনি অথচ নায্য দাবী আদায়ের কথায় চুপ মেরে থেকেছে।

চৌঠা মের এই গণ-জাগরণ বিশেষ করে ছাত্র জাগরণ চীনের আত্মার প্রতিচ্ছবি। এই আন্দোলনের, এই মিছিলের যা আসল রূপ তা যারা দেখেছিল তারা উৎসাহিত হল, তারা বুঝল চীন এখনও মরেনি। চীনের মৃত্যু অসম্ভব। এই প্রাণশক্তিকে শুধু কাজে লাগাতে হবে। আর যারা অন্ধ তারা ব্যঙ্গ করেছিল, কতকগুলো বিপথগামী ছাত্র-ছাত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করে তৎকালীন সরকারকে এইসব সমাজবিরোধী কাজ কঠোর হস্তে দমন করার সু-উপদেশ ও বহুচিন্তিত প্রস্তাব দিয়েছিল।

এই বিরাট জনসমাবেশে যে ভাবে বিক্ষোভ দেখান হয়েছিল তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। চীনের গ্রামে গ্রামে লোকমুখে সংবাদ পেঁাছে গেল। চীনের মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করল। অবশ্য জাপানকে প্রতিরোধ করতে পারল না তারা। জাপান সম্বন্ধে চীনের মনে ছিল অবিশ্বাস ও ঘৃণা। এবার সেই অবিশ্বাস ও ঘৃণা আরও দৃঢ় হল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে শান্তির বীজ রোপিত হল না, অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বীজ বপন করল তারা চীনের ভূমিতে।

'আমার জীবনে আমার শিক্ষক ইয়াং চ্যাং-চি'র প্রভাব সর্বাধিক।' এক সময় বলেছিল মাও।

ইয়াং চ্যাং-চি পড়াতেন ওপরের ক্লাশে। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল অনেক পরে। কিন্তু ইয়াং-এর পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিগত চরিত্র মাওকে আকর্ষণ করত প্রথমাবধি।

প্রতিদিন পড়াতে বসে ইয়াং ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতেন কি ভাবে চরিত্র গঠন করতে হয়। সব সময় বলতেন ন্যায়পরায়ণ হতে, নীতিবাদী হতে, ধার্মিক হতে এবং সমাজসেবী হতে। ইয়াং শুধু উপদেশ দিতেন না, ব্যক্তিগত জীবনেও ইয়াং এইসব মানবতাবোধকে অভ্যাস করতেন।

এখানেই ম্যাদাম কাই-হুইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় মাওয়ের।

শিক্ষক ইয়াং-এর মেয়ে কাই-হুই।

মাওয়ের তীক্ষ্ণ ও তীব্র যুক্তি, সমাজ সচেতনতা, তৎসহ অমায়িক ব্যবহার আকর্ষণ করেছিল সুন্দরী যুবতী ম্যাদাম কাই-হুইকে।

যোগ্যতায় কাই-হুই মোটেই ছোট নয়। পিতার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি তার জীবনে। ম্যাদাম কাই-হুই যথেষ্ট পড়াশোনা করেছে, সৎভাবে জীবন যাপনের শিক্ষা পেয়েছে। সর্বোপরি পিতা-মাতার কাছে পেয়েছিল স্বামীর একনিষ্ঠ কর্মসঙ্গিনী হবার দীক্ষা।

এমন একটি মেয়েকে মাও যে ভালবাসবে, এ মোটেই আশ্চর্য নয়। ভালবাসা নিয়েই পরিতুষ্ট হয়নি তারা। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য শিক্ষক ইয়াং-এর মৃত্যুর পর।

সেইদিন থেকে মাওয়ের প্রতিটি কাজের সঙ্গে ম্যাদাম কাই-হুইয়ের ছায়া থাকত। মাওকে ভাবতে হলে ম্যাদাম মাওকে বাদ দেওয়া যেতনা কোন সময়ই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিল অচ্ছেদ্য—তাদের এই প্রগাঢ় ভালবাসা কেমন একটি ঐতিহাসিক রূপকথা অথচ সত্য।

ইয়াং বলত, তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা আচার আচরণের ধারা পালটাতে হবে। পশ্চিমী শিক্ষার সার বস্তুকে গ্রহণ করতেই হবে দেশীয় শিক্ষাও গ্রহণ করতে ভুল করনা।

কিন্তু সে শিক্ষা গ্রহণ করতে বিপরীত ফলও তো হতে পারে।

আশ্চর্য নয় মাও। কিন্তু আগেই তো বলেছি সার বস্তু গ্রহণ করতে হবে। আমরা যখন বিদেশীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব তখন নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা চীনের মানুষ। চীনের সভ্যতা প্রাচীন,

চীনের ঐতিহ্য গৌরবময়, চীনের রক্তে রয়েছে স্বাতন্ত্র্যবোধ। তা হলেই আমরা এগোতে পারব।

কিন্তু বাবা, বাধা দিল কাই-হুই, বলল, আমাদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে আমাদের যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি আমরা কি বিদেশীর কাছে লাভ করতে পারব!

বিদেশী শিক্ষাকে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো ভয় পাবার মত কিছু দেখছি না। তোমাদের আত্মিক বল সৃষ্টি করতে এই শিক্ষা প্রয়োজন—আমাদের শক্তির প্রয়োজন, Our nation is wanting in strength. The military spirit has not been enouraged. The physical condition of the population deteriorates daily.—সবল একটা জাতির দরকার পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান—সামরিক শক্তিবৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রত্যেকটি চীনাবাসীর স্বাস্থ্য গঠনও দরকার। স্বাস্থ্যহীন জনসমুদ্র নিয়ে কোন জাতি বাঁচতে পারে না। এগুলো কি করে করা যায় তা শেখবার জন্যও বিদেশীদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন।

মাও মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, শরীর সুস্থ রাখাই সামরিক বীরত্ব প্রদর্শনের প্রধান উপায়। স্বাস্থ্য রক্ষা করতে না পারলে সামরিক শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। দেহের ও মনের দিক থেকে বলিষ্ঠ না হলে কোন জাতির উন্নতিই সম্ভব নয়। কতকগুলো ভাড়াটিয়া স্বাস্থ্যবান লোক নিয়ে তো দেশের প্রয়োজন মিটতে পারে না, সার্বিক উন্নতির প্রয়োজন।

ইয়াং বলল, একটা কথা ভুলনা। চীন বিদেশীকে অথবা বিদেশীর প্রভুত্বকে কোন কালেই মেনে নেয়নি। এমন কি বিদেশী মাঞ্চু রাজারা যখন চীনের সিংহাসনে বসেছিল তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ওয়াং ফু-চি। আমাদের দুর্ভাগ্য যারা চীনের পরাধীনতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল, যারা স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য সর্বক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছিল পরবর্তী কালে আমাদের দেশ তাদের মর্যাদা দেয়নি। এইসব অতীতের কথা ভুললে জাতীয় গৌরবকে অসম্মান করা হয়।

মাও বৃদ্ধ ইয়াং-এর সুদীর্ঘ দাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকত, অভিনিবেশ সহকারে শুনত তার কথা, মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা জানাত। যখনই কোন বিষয় আলোচনা করত বৃদ্ধ ইয়াং তখনই মাও এবং কাই-হুই এসে বসত। ইয়াং-এর এই শিক্ষা উভয়ের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, পরবর্তী তাদের যৌথ জীবনে ইয়াং-এর শিক্ষার প্রভাব ছিল সর্বাধিক বেশি। এই সত্যকে মাও স্বয়ং স্বীকার করেছে তার পরবর্তী জীবনে।

কুমারী কাই-হুই বলল, মাও তুমি যেন যুদ্ধের প্রতি বেশি আগ্রহী। রক্তপাত না ঘটিয়ে কি কোন কিছুই করা যায় না?

ভবিষ্যতে যাকে স্বামীর আদর্শের জন্য ফাঁসির দড়ি গলায় পড়তে হয়েছিল সেই কাই-হুই বিয়ের আগে বেশ তর্ক করত মাওয়ের সঙ্গে।

মাও বলত, নেপোলিয়নকে আমার ভাল লাগে।

সে ছিল সাম্রাজ্যবাদী।

তা হলেও ধীর। সমর বিশারদ। যদি সাম্রাজ্যবাদী না হতো নেপোলিয়ন তা হলে তার পক্ষে এমন একটি সমাজব্যবস্থা পত্তন করা সম্ভব ছিল যা পৃথিবীর লোক কখনও কল্পনাও করতে পারত না। প্রতিভা বিপথগামী হলেও নেপোলিয়নের বীরত্বকে, ফরাসী জাতিকে সম্মানের আসনে বসাবার প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখা কি উচিত।

আমাদের দেশেও তো এমন বীরের অভাব ছিল না।

সেখানেও ছিল সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা। যারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ করেছে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। আমরা চীনের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তনের দ্বিতীয় একটা পথ দেখাও। আমার বিশ্বাস সাহস শক্তি আর সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিই চীনের মুক্তির উপায়। যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করতে না পারি তাহলে আমরা যে বৃহৎ সমাজের অংশীদার আর যে সমাজে লুকিয়ে আছে সকল শক্তি সেই সমাজকে প্রাণবন্ত ও কর্ম চঞ্চল করতে পারব না আমরা। ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও বিশ্লেষণ হল সব চেয়ে বড় কাজ

'what the superior man seeks is in himself' (Confucian) আমি এতেই বিশ্বাস করি। নইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

তুমি ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর বেশি জোর দিতে চাও।

সমষ্টির চিন্তাতে ব্যক্তি প্রধান। ব্যক্তির যদি দেহ মন সুগঠিত হয় তা হলে সমষ্টি হয় বলশালী। সেই বলশালী একটি সমষ্টির কথাই আমি বলছি।

কাই-হুই কোন প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে এই যুক্তি স্বীকার করল না। কেননা ব্যক্তি বলতে যা বুঝায় তা যদি ব্যক্তিস্বার্থের নর্দমায় নাসিকা প্রবেশ করায় তা হলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। সেদিনের আলোচনায় কাই-হুই খুব আগ্রহ দেখাল না।

অধ্যাপক ইয়াং-এর প্রভাব যে তাকে মহৎ কার্যে প্রেরণা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও একজন শিক্ষক তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মহৎ কাজে। হ্সু তে-লি হুনানের ছেলে। বড় হয়ে জাপানে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষালাভ করতে। সেখানকার শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকতাকে জীবিকা ও ব্রত বলেই গ্রহণ করেছিল। মাও প্রথম জীবনে হুনানের গণ্ডী ছেড়ে কোথাও যায়নি। চীনা ভাষা ভিন্ন অপর কোন বিদেশী ভাষায় তার জ্ঞান ছিল না, সেজন্য তাকে বিদেশী গ্রন্থের চীনা তর্জমার ওপর নির্ভর করতে হতো, আর নির্ভর করতে হতো বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষকদের ওপর। হ্সু ছিল জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক। তার পূর্বপুরুষ ছিল চাষী। জাপানে থাকার সময়ই ডাক্তার সান্ ইয়াত সেনের হুং মেং হুই দলের সদস্যপদ লাভ করে।

হ্সু ছিল আদর্শবাদী শিক্ষক।

মাও যে বিদ্যালয়ে পড়ত সে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে আসত রিক্শা চেপে, আবার কেউ কেউ ডুলি চেপে আসত কিন্তু হ্সু আর ইয়াং আসত পায়ে হেঁটে। মানুষের পিঠে চড়ে বিদ্যালয়ে আসা তারা অগৌরবের মনে করত।

এই হ্সুর প্রভাব ছিল মাওয়ের জীবনে।

ভবিষ্যতে দেখা গেল যিনি এককালে শিক্ষক ছিলেন তিনিই ছাত্রের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন রাজনৈতিক বিষয়ে। রাজনৈতিক কর্মজীবনে হুসু ছিল মাওয়ের অতি অনুরক্ত অনুরাগী ও অনুচর। মাওয়ের শিক্ষাকে প্রচার করার দায়িত্বও নিয়েছিল হুসু।

নরম্যাল স্কুলে পড়ার সময় সংগঠন গড়ে তুলতে চেষ্টা করত মাও। ছাত্র সংসদের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। সেই সময়ই ছাত্র সংসদ গঠন করে স্কুল কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজে বাধা দিতে ছাত্ররা বদ্ধপরিকর হল মাওয়ের নেতৃত্বে।

চীনের মুক্তির কথা ভাবত মাও সর্ব সময়ে।

একদিন খবর পেল হুনানের নানাস্থানে বিভিন্ন মতাবলম্বী সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শক্তিক্ষয় করছে। তাদের বিদ্যালয়ের ওপরও হামলা হতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে।

মাও স্কুলের সব ছাত্রদের ডেকে সভা করল।

তোমরা বোধহয় জানো কয়েকটি ভিন্ন মতাবলম্বী সৈন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শক্তিক্ষয় করছে। জনমনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

ছাত্ররা সমস্বরে বলল, জানি।

আমাদের বিদ্যালয়ের ওপর হামলা হতে পারে এমন সংবাদ শুনছি।

একজন ছাত্র বলল, বিদ্যালয় রক্ষা করতে হবে।

কি ভাবে রক্ষা করা যায় তাই স্থির করতে আমরা আজ সমবেত হয়েছি।

তুমি ছাত্র সংসদের নেতা। তোমার মতামত শুনতে চাই।—বলল ছাত্রের দল।

মাও অনেকক্ষণ ভেবে বলল, আমাদের বিদ্যালয়ে চারিদিকে উঁচু প্রাচীর রয়েছে। সহজে কেউ ভেতরে যে আসতে পারবে না এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবে দেওয়াল টপকে কেউ কেউ ভেতরে আসতে পারে। আমাদের সদর দরজায় যেমন পাহারা বসাতে হবে তেমনি যাতে কেউ দেওয়াল টপকাতে না পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

তা কেমন করে সম্ভব ? ওদের হাতে অস্ত্র থাকবে।

আমাদেরও অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। কাঁচা বাঁশ সংগ্রহ করে বাঁশের মাথা ছুঁচালো করতে হবে। যখন কোন দুষ্ট লোক দেওয়াল টপকাতে উঠবে আমাদের কাজ হবে ঐ ছুঁচালো বাঁশ দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দেওয়া। সেজন্য সবাই প্রস্তুত হও।

সবাই প্রস্তুত হল। বাঁশ এনে গাদা দিল। বাঁশের মাথাগুলো ছুঁচালো করে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল ছাত্ররা কিন্তু কোন লোকই বিদ্যালয়ের দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতে মোটেই চেষ্টা করেনি। প্রস্তুতির অভাব না থাকলেও কোন কাজ করার সুযোগ ছাত্ররা পায়নি।

মাও তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সব সময় আলোচনা করত নিজের দেশকে কি ভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে পারে। বন্ধুরা বলত, আমরা যদি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করি অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করতে পারি তা হলেই দেশের কিছু উপকার করতে পারব।

মাও বাধা দিয়ে বলল, নির্বাচন মানে টাকা আর আভিজাত্য তা আমাদের কারও আছে বলে মনে হয়না। আর যদি তা না থাকে তা হলে নির্বাচনে জয়লাভ অসম্ভব।

তা হলে আমাদের উচিত শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করা। তা হলে আমরা পরবর্তী বংশধরদের তৈরী করতে পারব। তারাই দেশের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

মাও হেসে বলল, কত বছরে তা সম্ভব ?

দশ বিশ।

দশ-বিশ বছর অনেক দিন। তাতেও কতটা সাফল্য আসবে তা বলা কঠিন। অতদিন অপেক্ষা করতে হলে দেশ রসাতলে যাবে।

তোমার মত কি ?

লড়াই করতে হবে। হাতিয়ার তুলে নিতে হবে হাতে। লিং শান পো'র বীরদের আদর্শ সামনে তুলে ধরতে হবে। লিং শান পো'র দুর্গে যে সব দস্যু বাস করত তারা লড়াই করেছিল দেশে সুবিচার ও

শৃঙ্খলা কায়েম করতে। আমাদেরও সেই লিং শান পো'র দস্যুদের মত অস্ত্র হাতে নিয়ে অবিচার ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা হলেই আমাদের দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। অত্যাচারের হাত থেকে সাধারণ মানুষ বাঁচবে।

বন্ধুরা তার মত সমর্থন না করলেও যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারল না। মাও বুঝতে পারল সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসার মত লোকের বড় অভাব। এদের মানসিক পরিবর্তন আনতে মাও প্রতিষ্ঠা করল একটি পরিষদ, নতুন মানুষরা যাতে জ্ঞান লাভ করতে পারে তার জন্য এই পরিষদ আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাবধারাকে প্রচারে উদ্যোগী হল।

এই পরিষদে যারা সেদিন সাগ্রহে যোগ দিয়েছিল তারাই পরবর্তী কালে মাও সে-তুং-এর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টিকে শক্তিশালী করেছিল। তাদের বুনিয়াদ তৈরী হয়েছিল সেই New Peoples' Study Society-তে। মাও বিশ্বাস করত শরীর ও মনকে যদি শক্তিশালী করা না যায় তা হলে দেশের কোন কাজেই কেউ কোন চিহ্ন রাখতে পারে না। ব্যক্তির ওপর অত্যাচার অথবা ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার জন্য যে চেষ্টা তাহল সামাজিক অপরাধ—তার জন্য ধর্ম ব্যবস্থার অত্যাচার, ধনতন্ত্রের অত্যাচার, স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদরূপী দানবকে জয় করতে হবে। তার জন্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মাও কনফুসিয়াস ধর্মমতকে কোন প্রকারেই গ্রহণ করতে পারেনি। ধর্মের নামে রাজার প্রাধান্য, নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য, এমন কি পুত্রের ওপর পিতার প্রাধান্যকে মাও মোটেই স্বীকার করতে পারেনি।

মাও এগিয়ে চলেছে তখন। তার অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল চৌঠা মের ছাত্র বিদ্রোহ। তার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান নিয়েছিল মানুষের দুঃখ মোচনের ব্রত। আঠার সালে মাও স্নাতক অভিজ্ঞান যখন লাভ করল তখন মাও খুব একটা বড় কিছু করার মত নিজেকে গঠন করতে

না পারলেও, মাও রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন ছিল। তাই পরবর্তী দেড় বছর সে পিকিংয়ে বাস করে যখন হুনানে ফিরে এল তখন মাও সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। মাওয়ের অসমাপ্ত বাস্তব জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল পিকিং-এর রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এবং তা থেকে মাও বিপ্লবের পথে পা দিতে শিখেছিল।

আমি তো মার্কস্‌কে চিনতাম না বন্ধু। আমাকে চিনিয়ে দিল রাশিয়ার অকটোবর বিপ্লব। বলেছিল মাও তার বন্ধুদের।

বন্ধুরাও বেশ উত্তেজিত হয়েছিল জার্মান অধিকৃত স্থান জাপানকে দেওয়াতে। পশ্চিমী শিক্ষার ওপর তাদের যতই বিশ্বাস থাকুক, পশ্চিমী আচরণে সবাই তখন ক্ষুব্ধ। জার্মানের সামরিক শক্তিকে প্রশংসা করেছে চীনের মানুষ, আবার কেউ কেউ ফরাসী গণতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আবার কেউ কেউ ইংরেজের কার্যকলাপের দিকে উৎসুক দৃষ্টিপাত করেছে। কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের গতি ও সাফল্য দেখে মাও বিস্মিত হয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই মার্কস্‌বাদ নিয়ে পড়াশোনা ও আলোচনায় নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছিল।

তাই মাও বলেছিল, অকটোবর বিপ্লব আমাকে মার্কসের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু মার্কসের চিন্তাধারা অকটোবর বিপ্লবের অনেক আগেই চীনের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল, চীনের মানুষ মার্কসীয় বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিল।

কিন্তু তার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তা বিদূরিত হয়েছিল অকটোবর বিপ্লবের পর। দেশের মানুষ তাই যেমন আগ্রহী হল মার্কসের শিক্ষাপদ্ধতি জানতে, তেমনি আমিও আগ্রহী হলাম মার্কসের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হতে। আমার বিশ্বাস আমরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে পারব অতি শীঘ্রই।

পিকিংয়ে এসে মাও সঙ্গী পেল লি তা-চাও আর চেন তু-সিউকে। এদের সঙ্গেই মাও প্রতিষ্ঠিত করল চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি। বলতে গেলে লি তা-চাও আর চেন তু-সিউই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তখনও মাও বিশেষ স্থান করে নিতে পারেনি। কারণ তার চিন্তাধারা ঠিক বৈজ্ঞানিক ধারা লাভ করেনি তখনও।

মাও পিকিংয়ে এসে নিরাশ্রয় হয়েই বেড়াচ্ছিল। তার কাজের প্রয়োজন, অন্তত আহার্যের প্রয়োজনেও কোন কাজ দরকার। পিকিং শহরে মাও অপরিচিত। হঠাৎ চাকরি পাওয়া খুব সহজ নয়। কিছু-কাল পথে পথে ঘুরতে হয়েছিল তাকে। একদিন সংবাদ পেল তার শিক্ষক ইয়াং চ্যাং-চি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে সবে মাত্র পিকিংয়ে এসেছে। মাও তার সঙ্গে দেখা করল।

মাওকে দেখে ইয়াং চ্যাং-চি খুশী হল। জিজ্ঞেস করল, কি করছ মাও?

কিছুই করছি না স্যার। একটা চাকরি খুঁজছি। শহরে বাস করার ব্যয় সংকুলান হচ্ছে না। চাকরি না পেলে আবার নিজের গ্রামেই ফিরে যেতে হবে। আমার উচ্চাশা পূরণের কোন পথই থাকবে না।

তাইতো হে, কিছু করবার মত অবস্থা তো দেখছি না। আমি তো মাত্র কয়েকদিন হল কাজে যোগ দিয়েছি, এখনও বিশেষ পরিচয় হয়নি। তবুও চেষ্টা করব।

মাও বিদায় নিয়ে বাইরে বের হবার সময় মুখোমুখি দেখা ইয়াং কাই-হুইয়ের সঙ্গে। মাওকে দেখেই কাই-হুই বলল, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। কেমন আছ মাও?

খুব ভাল নয়। তোমার খবর কি?

এইতো সবে এসেছি। পড়াশোনা করছি। আর আমাদের কি খবর থাকতে পারে। তুমি কি কলেজে ভর্তি হয়েছ?

না। ভর্তি হতে চাইও না। তবে একটা কাজের দরকার। মাষ্টার-মশায়কে বলতে এসেছিলাম। পিকিংয়ে থাকতে হলে যে কোন একটা

চাকরি দরকার। তারই চেষ্টা করছি। তুমি একবার বলে দেখ যাতে একটা কাজ পাই। কেমন?

কাই-হুই বলল, তোমার চাকরির দরকার। আশ্চর্য!

পিকিংয়ে থাকতে হলে চাকরি দরকার শুধু বেঁচে থাকার জন্য। বেকার ছেলেকে বাবা কি এভাবে থাকতে দেবে। টাকার জন্য এই বয়সে বাবার দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয়।

আমার বাবার দ্বারস্থ হতে হবে আমাকে, এই তো। দেখছি। কাল একবার আসবে।

মাও চলে যেতেই কাই-হুই গেল তার বাবার কাছে।

বলল, তোমার কাছে মাও সে-তুং এসেছিল বাবা?

হাঁ। ছেলেটা খুব ভাল। কাজ খুঁজছে। কিন্তু আমি তো নতুন লোক এখানে। অত তাড়াতাড়ি কাজ জোটানো কি সহজ।

কিন্তু ওর কাজের দরকার, নইলে পেট চলবে না। তুমি আজই একটু খবরাখবর করবে। মাও তোমার প্রিয় ছাত্র, তার জন্য কিছু করা উচিত নয় কি!

নিশ্চয় নিশ্চয়। দেখি কি করতে পারি।

বিকেল বেলায় অধ্যাপক ইয়াং চ্যাং-চি মেয়েকে ডেকে বলল, একটা কাজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কাজটা খুব সম্মানের নয়, বেতনও কম। মাও করবে কি?

কি কাজ?

লাইব্রেরীতে কতকগুলো সহকারী দরকার। বেতন মাসে আট ডলার। কাজটা পিওনের কাজের মত। মাও কি পারবে তা করতে। হয়ত করতে চাইবে না। তুই একবার বলে দেখিস। যদি রাজি থাকে তা হলে কালকেই কাজে লাগিয়ে দিতে পারব।

পরের দিন সকাল থেকে দরজার ওপর চোখ রেখে বসে রইল কাই-হুই। মাও আসতেই তাকে ডেকে নিল নিজের ঘরে।

কোন খবর আছে কাই-হুই?

আছে। কিন্তু তোমার মনঃপূত হবে কিনা তাই ভাবছি।

ভেবে দরকার নেই, বলেই ফেল। আমার মতামতও সঙ্গে সঙ্গে দেব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ক'জন সহকারী নেবে। কাজটা খুব সম্মানের নয়, অনেকটা পিওনের মত কাজ। বেতনও কম। মাত্র আট ডলার প্রতি মাসে।

মাও বলল, তোমার কি মত ?

আমার মতামত তুমি শুনবে কি ? আর আমার মতামতের দামই বা কতটুকু।

তোমার মতামতের যে দাম নেই এমন কথা তো তোমাকে বলিনি। তুমি কি বলতে চাও তাই বল। তোমার মতকে শ্রদ্ধা জানাতে আমি সচেষ্ট।

তাই নাকি ! বলতে বলতে কাই-হুইয়ের গাল দুটো রাঙা হয়ে উঠল। মুখ নীচু করে বলল, বাঁচার জন্য মানুষ অনেক কিছু করে। আর কাজ করে যদি খেতে হয় তাতে অসম্মানের কিছু থাকে না। কাজ কখনও ছোট হয় না। যতদিন ভাল কাজ না পাও ততদিন এই কাজ করতে অসুবিধা কি থাকতে পারে তা ভেবে পাচ্ছি না।

মাও অনেকক্ষণ ভেবে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কিছু মিশন আছে। সেই মিশনকে পূর্ণ করতে হলে নিশ্চিত আমাকে কোন কাজ করতেই হবে। তাতে কাজ ছোট কি বড় তা চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই বরং সৎভাবে কাজ করার চেষ্টাই বড় কথা। আমি কাজ করব। তুমি তোমার বাবাকে, মানে মাষ্টারমশায়কে বলতে পার। আমিও বলব।

বাবা বলেছেন আজকেই কাজে যোগ দিতে হবে।

আমি রাজি। চল মাষ্টারমশায়ের কাছে।

দুজনে ইয়াং চ্যাং-চির সামনে হাজির হল।

কাই-হুই বলল, মাও কাজ করতে রাজি।

ইয়াং গম্ভীর স্বরে বলল, আমি মাওকে জানি। তার মত মেধাবী প্রগতিবাদী ছাত্র আমার জীবনে খুব কমই পেয়েছি। তার এই সম্মতি তার মত ছেলেরই উপযুক্ত। কাজ হল কাজ। আসল দরকার সৎ ভাবে কাজ করা। তা পারবে তুমি। আজকেই যেতে হবে। একটা দরখাস্ত নিয়ে আমার সঙ্গেই চল। এসব শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়।

মাও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কাই-হুই ডেকে নিল মাওকে তার ঘরে। কাগজ তুলি কালি তার সামনে রেখে বলল, দরখাস্ত লেখ। আর স্নানটা করে দুটো মুখে দিয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাও। বিকেলে খবর দিও কেমন কাজ পেয়েছ।

আমি তো দরখাস্ত লিখতে জানিনা। আমি চাকরি করব তা হয়ত আমার ভাগ্যলিপি। কিছুকাল যে পাঠশালায় মাষ্টারী করেছি তার জন্য দরখাস্ত করতে হয়নি। এবার যখন দরখাস্ত করতেই হবে তখন তুমি তা লিখে দাও। কি ভাবে দরখাস্ত লিখতে হয় আমি জানিনা।

আমি বুঝি জানি! আমি কি কোন দিন চাকরি করতে গেছি অথবা চাকরির উমেদারী করেছি। লিখতে আরম্ভ কর। এই তো আরম্ভ। কত দরখাস্ত লিখতে হবে তার কি হিসাব আছে। জীবন তো গোটাটাই পড়ে আছে সামনে। সারা জীবন দরখাস্ত লিখলে শেষ বয়সে হয়ত একটা চাকরি হতে পারে।

ঠাট্টা করনা কাই-হুই। সত্যিই দরখাস্ত লিখতে আমি জানি না। তুমি একটু সাহায্য কর।

কাই-হুই হেসে বলল, ঠিক আছে। তুমি স্নান-খাওয়া করে নাও। দরখাস্ত আমিই লিখে দেব।

সেইদিনই মাও চাকরি পেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সহকারীর, বেতন মাসিক আট :ডলার। তার উপরওলা হলেন অধ্যাপক লি।

মাও চাকরি পেয়েই হুনানের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে একটা ঘর ভাড়া করে বাস করতে থাকে। বাসস্থানের দৈন্য ও অতি পরিমিত জীবিকার দৈন্য মাওকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি, পিকিংয়ের সৌন্দর্য আর পরিবেশ মাওকে মুগ্ধ করত সর্বাধিক। আর এই দৈন্যদশাকে আরও সুন্দর করেছিল কাই-হুই। অধ্যাপক কন্যা কাই-হুই যে মাওয়ের মত নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীকে ভালবাসবে তা ছিল অকল্পনীয়। প্রিয় ছাত্রকে ইয়াং মাঝে মাঝেই বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেত। এই যাতায়াত যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল কাই-হুইয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার। মাও ভালবেসেছিল কাই-হুইকে। বিনিময়ে কাই-হুইও মাওকে গভীর ভালবাসার পরিচয় দিয়েছিল।

মাও আন্তরিকতার সঙ্গেই তার কাজ করত। সারাদিন কাজ করার পর অতি অল্প সময় পেত সে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার। হুনানের যে সাতজন ছাত্র বাস করত তার সঙ্গে তাদের আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগ দিত। মাও চিন্তাও করেনি এইসব ছাত্ররা লেখাপড়ায় পারদর্শী না হলেও মর্যাদায় তার চেয়ে উঁচু পদের দাবীদার। মাওয়ের চাকরি তাদের কাছে ছিল নিম্নস্তরের কাজ তাই মাও যখন কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করত অথবা গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করত তখন তারা তাকে নিরুৎসাহ করত, এমন কি অনেক সময় গ্রন্থাগারের পিওন মনে করে ভাল করে আলোচনা তো দূরের কথা, বাক্যালাপ করতেও দ্বিধা করত।

গ্রন্থাগারে বহু পণ্ডিত লোক আসত। মাও চেষ্টা করত এইসব পণ্ডিতদের সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু সবাই উপেক্ষা করত তাকে। এই অনাদরের বেদনা মাওকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করত তবুও সে আত্মসংযত করে কাজ করত। একবার অধ্যাপক হু-সির সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছিল। অধ্যাপক যখন জানতে পারলেন আলোচনাকারী গ্রন্থাগারের পিওন তখন তার কথার কোন জবাব পর্যন্ত দেননি। মাও মনে মনে আহত হয়েছিল কিন্তু

বাইরে কিছু প্রকাশ করেনি। নরম্যাল স্কুলের বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় যে অতি নগণ্য তাও বুঝেছিল, আর বুঝেছিল কর্ম ও অর্থ দিয়ে মানুষের মর্যাদা স্থির করে সাধারণ ব্যক্তিরাও।

একমাত্র সান্ত্বনা হল অধ্যাপক ইয়াং। মাওয়ের মেধা ও উচ্চাশাকে অধ্যাপক ইয়াং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। মাও যখন বেদনায় ভেঙ্গে পড়ত তখন তাকে প্রবোধ দিতেন। অধ্যাপক ইয়াং-এর বিশ্বাস ছিল মাও একজন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবে ভবিষ্যতে এবং সেই জন্যই মাওকে কখনও অমর্যাদা করেননি। তার জীবিত কালেই বুঝতে পেরেছিলেন মাওকে ভালবাসে তার মেয়ে কাই-হুই। কিন্তু প্রকাশ্যে তাতে কখনও বাধা দেননি।

তবে দমে যাবার মত লোক মাও নয়। মাও লি তা-চাও প্রতিষ্ঠিত "Marxist Study group"-এ অংশ গ্রহণ করে তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।

লি তা-চাও কিন্তু মাওয়ের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি। প্রায়ই তর্কবিতর্ক হতো মাওয়ের সঙ্গে। মার্কসীয় দর্শনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করত লি তা-চাও তা মোটেই গ্রহণ করতে পারত না মাও।

মাও বলত, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না মিষ্টার লি।

কেন? মার্কস্‌বাদকে বিশ্বাস করলে তুমি ব্যক্তি-সত্ত্বাকে বিশ্বাস করবে না কেন? ব্যক্তি-সত্ত্বাই হল সব চেয়ে বড়। ব্যক্তিকে বড় করতে না পারলে মার্কস্‌বাদের পরিপূর্ণতা আসতে পারে না।

এটা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। ব্যক্তির প্রাধান্য ঘটলে সমষ্টির প্রশ্ন অতলে ডুববে। মানুষ যখন ব্যক্তিস্বার্থের দাস হবে তখন বৃহৎ চিন্তা থেকে সে বিচ্যুত হবেই হবে।

তাদের কথার মাঝে কথা জুড়ে দিলেন চেন তু-সিউ। তৎকালে মার্কস্ সম্বন্ধে উনি ছিলেন বড় ভাষ্যকার। চেন বলল, মার্কস্‌বাদ আর সন্ত্রাসবাদ দুটোই দেশের অনুপযোগী। চীনে গণতন্ত্র হল সবচেয়ে

উপযোগী রাজনৈতিক কর্মপন্থা। আমাদের দেশে প্রয়োজন সংবিধান, যে সংবিধান অধিকার দেবে জনসাধারণকে তাদের মনোমত গণতন্ত্রী সরকার গঠন করতে। চীনের যে সব সমস্যা তাতে মার্কস্‌বাদ প্রয়োগের চেষ্টা বাতুলতা। হাজার হাজার বছর ধরে চীন থেকেছে সামন্ততন্ত্রের আওতায়। চীনের জনমনে রয়েছে তার প্রভাব। রাতারাতি তারা শ্রেণীহীন সংগ্রামে নামবে এ আশা যারা করে তারা পাগল। আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করা যায় তাতে দেখা যাবে একদল স্বৈরাচারী স্থানচ্যুত হয়ে আরেকদল স্বৈরাচারী স্থান করে নিয়েছে। এমত অবস্থায় চীনের পক্ষে একমাত্র উপযোগী ব্যবস্থা হল সংসদীয় গণতন্ত্র।

মাও চেনকে শ্রদ্ধা করত কিন্তু তার এই বিশ্লেষণ ও মতবাদকে মোটেই গ্রহণ করতে পারল না। প্রতিবাদ জানাল তীব্র ভাষায়। বলল, গণতন্ত্র বলতে তোমরা যা বলছ তা এমন কি তন্ত্র যাতে 'গণ' কোন সময়ই থাকে না। অর্থবান প্রতিপত্তিশালী লোকেরা গণতন্ত্রের নামে শাসনক্ষমতা দখল করে। আর সেই সব শাসকরা দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ব্যাভিচারে মত্ত হয়। সাধারণ মানুষের কোন উপকার তাতে হয় না। এ ব্যবস্থা চীনের উপযোগী নয়। সামন্ততন্ত্র, জমিদারী ব্যবস্থা, যুদ্ধবাজদের একচেটিয়া অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন মতেই তাতে গরীব দুঃস্থ মানুষরা উপকৃত হতে পারে না।

লি বলল, তুমি বলতে চাও একমাত্র মার্কস্‌বাদেই চীনের দুঃখ ঘুচবে?

আমার বিশ্বাস তাই। তবে মার্কস্‌বাদকেও চীনের উপযোগী করেই প্রয়োগ করতে হবে। ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতির লক্ষণ দেখে স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা উৎফুল্ল হয় এবং তথাকথিত গণতন্ত্রের মহিমায় পঞ্চমুখ হয় সে প্রগতি হল দুটো ষাঁড়ের লড়াই। তাদের লড়াইতে যে জেতে সে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে পরাজিতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে কিন্তু তাদের লড়াইতে পায়ের চাপে যে সব

উলুখাগড়ার জীবনান্ত হয় তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবার কোন অবসর তাদের থাকে না। কারণ, তাদের অস্তিত্ব যারা রক্ষা করে তাদের প্রতি তাদের কোন মমতা থাকে না। যদি আমরা এমন একটা সমাজের সৃষ্টি করতে পারি যাতে মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয় তা হলে তাকেই শ্রেষ্ঠ মতবাদ আমরা বলতে বাধ্য। সে অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে মার্কসীয় দর্শন ও তার যথাযথ প্রয়োগ।

মাও বলা শেষ করতেই চেন বলল, তুমি উগ্রপন্থী কিন্তু তাতে চীনের কোন উপকার হবে না। তুমি তোমার মতবাদ প্রচার করতে পার কিন্তু সাফল্য আসবে বলে কখনও আশা রেখ না। আমরাও চাই বর্তমান শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি; আমরাও চাই চীনের গৌরব বৃদ্ধি, জনতাকে মুক্ত করতে চাই দারিদ্র্য থেকে। কিন্তু তার প্রকৃষ্ট পন্থা হল আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমার বিশ্বাস এ কাজে তোমার সমর্থন থাকবে এবং তুমি তোমার ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করে আমাদের আদর্শে নিজেকে নিযুক্ত করবে।

মাও বলল, আমার বিশ্বাস গণতন্ত্রকে যে অবস্থায় আমরা দেখছি তাতে কোনক্রমেই মানুষের কোন উপকার করতে পারবে না, বরং একদল অত্যাচারীর হাত থেকে আরেক দল অত্যাচারীর খপ্পরে পড়বে জনসাধারণ।

লি বলল, তুমি ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে চলতে চাও অথচ ব্যক্তির মতকে অপরের ওপর চাপাতে চাও। এই কি শ্রেণীহীন সমাজের লক্ষণ। গণতন্ত্রে সবার মত দেবার সমান অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার ব্যক্তিগত অধিকার। তাকে নষ্ট করে যে সমষ্টির কথা বলছ তা হাস্যকর ব্যাপার। তোমার ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হলেই আমরা সুখী হব।

মাও বলল, তোমার শিক্ষা আমি ভুলব না লি, আমি চীনের মহান ঐতিহ্যকে স্বীকার করি, চীনকে আমি ভালবাসি, ততোধিক ভালবাসি চীনের দারিদ্র্য-অত্যাচার নিপীড়িত জনতাকে। তাদের

মুক্তির যে পথ তোমরা দেখাচ্ছ তাতে আমার বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধাও নেই।

লি শান্ত ভাবে বলল, আমার সামনে এক সময় দুটো প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়েছিল। জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং তাদের বিকাশ সাধন বড় অথবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা বড়। আমি বলেছিলাম অত্যাচারী স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে থেকে রাষ্ট্রসত্বা রক্ষাই বড়। রাষ্ট্র নেই অথবা রাষ্ট্রবিহীন মানুষের ক্রীতদাসত্ব হল সব চেয়ে সর্বনাশা বস্তু। সাধারণ মানুষের মুক্তির নামে রাষ্ট্রসত্বাকে বিপন্ন করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।

তোমরা চীনের মানুষের কথা কম চিন্তা করছ। তোমরা চীনের অতীত গৌরবকে যত বড় করে দেখছ অত বড় করে দেখছ না জনতার বাস্তব অবস্থাকে। তা যদি দেখতে তা হলে জনমুক্তিকেই সব চেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে করতে।

তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি কাজ কর। আমরা মার্কস্‌বাদকে ছোট মনে করি না, কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষেত্র চীন নয় বলেই বিশ্বাস করি। যদি কোন কালে তোমার আদর্শ সত্য প্রমাণিত হয় সেদিন আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বলে মনে করব।

এই সব আলোচনা মাওয়ের মনে বেশ তরঙ্গ সৃষ্টি করত। নির্দিষ্ট মতে অনেক সময় আসতে পারত না। তার মনে লি ও চেন-এর মতবাদ উঁকিঝুঁকি দিত। মাঝে মাঝেই সে মনে করত তার চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত কোথাও কিছু গলদ থেকে গেছে। মাও তখন থেকে কিছুটা উদার চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। Marxist Study Society-তে মাও যেমন সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব আলোচনা করত তেমনি পাশাপাশি প্রাচীন চৈনিক চিন্তাধারাকেও ব্যাখ্যা করে উভয়ের সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ চেষ্টা করত। সে চেষ্টা ব্যর্থ বলে তখন মনে হয়নি কারণ, তার আলোচনায় বহুজন তার প্রশংসা করত। অনেকেই তার গুণমুগ্ধ হয়ে তার আদর্শকে মোটামুটি অনুসরণও করত।

এই সময় মাও তৎকালীন খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সমরবিশারদ ৎসেং কুয়ো-ফানকে আদর্শ মনে করত অবশ্য তার সব কিছু সে মেনে নিয়েছিল এমন নয় তবে হুনানের একজন কৃতী সন্তান এই ৎসেং যে অনমনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে রাজনীতিতে স্থান করেছিল তার জন্য মাওয়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল ৎসেংএর প্রতি। হয়ত তা এক প্রদেশবাসী বলেই সম্ভব হয়েছিল।

মাওয়ের অস্থির চিন্তাধারা ধীরে ধীরে স্থির রাজনৈতিক মতে আসতে থাকে। অনেকেই তার অনুগামী হয়। পিকিংয়ের জীবন মাওকে আর আকর্ষণ করতে পারল না। মাও স্থির করল পিকিং ছেড়ে অন্যত্র যাবে তার কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে। এই সময় থেকেই মাও তার নিজস্ব ধারায় মতবাদ উত্থাপন করতে থাকে, এবং শিক্ষিত যুবকদের ওপর তার মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

মাও সংবাদ পেল তার অনেক বন্ধু চলেছে ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করতে। মাও নিজেও ইচ্ছুক ছিল পশ্চিমী শিক্ষা পেতে। সে ছুটে গেল সাংঘাইতে। সেখান থেকেই অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সে ফ্রান্সে যাবে স্থির করে মার্চ মাসের প্রথমে হাজির হল সেখানে।

ফ্রান্সে যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল হুনানের ছেলে। পিকিংয়ে এদের সঙ্গে বহু আলাপ আলোচনাও হয়েছে। এরা সবাই মাওয়ের মতবাদকে শ্রদ্ধা করত এবং মাওয়ের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়েছিল অকপটে। এইসব মেধাবী ও সুশিক্ষিত যুবকরাই মাওয়ের বড় অনুরাগী। তাদের সঙ্গে ফ্রান্সে গেলে মাও হয়ত কিছু শিখতে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারত কিন্তু মাও মত বদলে যাওয়াতে অনিচ্ছা জানাল কেন? মাও চীনভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানত না। বিদেশে গেলে বিদেশী ভাষা না শিখে কোন প্রকারেই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয় তা মাও বুঝেছিল সে জন্য বিদেশে যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিল মাও। সাংঘাইতে মাও বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল।

বিদায় জ্ঞাপন করে তাদের সাফল্য কামনা করেছিল।

জাহাজ ঘাটায় দাঁড়িয়ে মাও রুমাল উড়িয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল।

জাহাজের রেলিং-এ যারা দাঁড়িয়েছিল সেদিন তাদের অন্যতম হল চৌ এন-লাই আর মাওয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাই হো-সেন।

চৌ বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিল মাওকে তার সঙ্গে যেতে কিন্তু মাও সম্মত হয়নি।

মাও স্বপ্ন দেখেছিল যে ভবিষ্যতের তার গোড়াপত্তন হল সাংঘাইতে। বন্ধুদের জাহাজে তুলে দিয়ে মাও আর ফিরে গেল না পিকিংয়ে। সোজা গেল চ্যাংসায়।

চ্যাংসায় পৌঁছে পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল।

পুরাতন বন্ধুদের বেশ উত্তেজিত মনে হল। তারা অভিযোগ করল প্রাদেশিক শাসনকর্তা জেনারেল চ্যাং চিং-ইয়াওয়ের বিরুদ্ধে।

তোমরা উত্তেজিত হয়েছ কেন? প্রশ্ন করেছিল মাও।

চ্যাং একজন নিষ্ঠুর জহ্লাদ।—উত্তর দিয়েছিল একজন বন্ধু।

কেন?

চ্যাং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। জেনারেল তিয়ান চি জুইয়ের যে আনফু দল আছে তার অনুগত ব্যক্তি এই চ্যাং। জেনারেল তিয়ান কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করছে ফলে জেনারেল চ্যাং তার অনুগত ভৃত্যের মত জাপান বিরোধীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাচ্ছে। জাপানকে সানটুং দেবার সময় শান্তির নামে যে অশান্তির আগুন জ্বেলেছে চীনের দুর্বল চিত্তের নেতারা তার পেছনে রয়েছে উৎকোচ গ্রহণকারী একদল যুদ্ধবাজ হীন ব্যক্তি।

তোমরা নিশ্চয়ই জান চীনের ছাত্রদল আন্দোলন আরম্ভ করছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

জানি।

আগামী চৌঠা মে পিকিংয়ে সক্রিয় ভাবে ছাত্ররা আন্দোলন করবে স্থির করেছে। তোমরাও প্রস্তুত হও। যেদিন খবর পাবে

পিকিংয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে সেই দিনই তোমরাও আন্দোলন শুরু কর এখানে।

আন্দোলন যদি শান্তিপূর্ণ না হয় ?

না হওয়াই স্বাভাবিক।

শাসক তাহলে অত্যাচার শুরু করবে আন্দোলন দমন করতে।

সেই অবস্থাকে স্বীকার করেই আন্দোলনে নামতে হবে। তার জন্য যদি তোমরা প্রস্তুত না হও, বরং ভয় পাও তা হলে আন্দোলন করে লাভ নেই। যদি অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে চাও তাহলে সুযোগ বুঝে আঘাতের পর আঘাত করতে হবে। মৃত্যুকে ভয় করে কোন কাজেই যেতে পারবে না। যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগোতে পারে তারাই সবচেয়ে বেশি সেবা করতে পারে সমাজকে। অবশ্যই এই আন্দোলনকে গুণ্ডামির পর্যায়ে নিয়ে যেতে বলছি না। তবে আঘাতকে প্রত্যাঘাত করার অধিকার সবারই আছে।

পিকিং আন্দোলনের সংবাদ চ্যাংসায় পৌঁছাল সময়মত। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাংসার জোয়ান ছাত্ররা জাপান বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে পথে নামল। শাসনকর্তা জেনারেল চ্যাং তার সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলন দমন করতে ত্রুটি করল না। গুলি চলল, গ্রেপ্তার হল।

তেসরা জুন পিকিংয়ে ধরপাকড় আরম্ভ হল। দলে দলে ছাত্রকে ধরে এনে জেল ভর্তি করল পুলিশ আর সেনাবাহিনী। জাপানকে যারা সমর্থন করেছিল তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল পিকিংয়ের ছাত্ররা। ছাত্রদের খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে বেত মারা হল প্রাতশোধ নিতে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হল এই সব সংবাদে। দুদিন পরেই সাংঘাই শহরের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা হরতাল পালন করল। কদিনের মধ্যেই সারা দেশের বড় বড় শহরেও ধর্মঘট হল। শাসকরা শঙ্কিত হল।

কিন্তু লাভ হল বামপন্থী চিন্তাবিদদের। চীনের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা এই সুযোগে জন সংগঠন গড়ে তুলতে লাগল। সামাজিক বহু সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করে দিল জনতাকে, জনতাও তাদের যুক্তির

তীক্ষ্ণতায় বিশ্বাস স্থাপন করল, ধীরে ধীরে তারাও সংগঠিত হল। চীনের নৈতিক দুর্বলতার জন্য যে অধঃপতন তা জন সমক্ষে প্রমাণিত হল।

মাও চুপ করে বসে ছিল না। এই সব আন্দোলন মুখ্যত কেন্দ্র করেছিল শহরে। মাও চ্যাংসায় জনমত সৃষ্টি করত জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে। যারা জাপানের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের বিরুদ্ধেও জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হল। মাও আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিল অন্য ভাবে।

জাপানে প্রস্তুত সব মাল বয়কট করে দেশে উৎপন্ন মাল ব্যবহারের সমিতি গঠন করল মাও।

পিকিং সরকারের জাপানী তোষণ নীতি এবং জেনারেল চ্যাং-এর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই মাও সক্রিয়ভাবে আন্দোলন এগিয়ে নেয়। জনসংগঠনকে জোরদার করে জাপান বিরোধী কাজে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

সেদিন কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা করেনি মাও। সেদিন তার এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, এমন কি গোপনে কোন কোন ধনা ব্যক্তিও। অবশ্য কোন মহৎ চিন্তার বাহকরূপে সবাই আসেনি, এসেছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতে।

মুখের কথায় আর প্রচারপত্র মাঝে মাঝে বিলি করে জনসংগঠন স্থায়ী করা কঠিন। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করাই হল বড় কাজ। তা করতে হলে দরকার একটা মুখপত্র। মাও গড়ে তুলেছিল সংযুক্ত ছাত্র সমিতি। উনিশ সালের চোদ্দই জুলাই মাও সম্পাদক রূপে এই সমিতির মুখপত্র বের করল, পত্রিকার নাম হল, "হোসিয়াং-চিয়াং পিং-লুন"। মাও কলম তুলে নিল হাতে। সর্বহারা একনায়কত্বের যে স্বপ্ন ছিল মাওয়ের মনে তার বুনিয়াদ স্থাপিত হল এই পত্রিকার মাধ্যমে।

সেদিন আমার কর্মক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত ছিল ছাত্রদের মাঝে, বলেছিল মাও সে-তুং।

আবার বলেছিল, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখনই ভেবেছি দেশের মুক্তি যুদ্ধের পুরোভাগে যদি ছাত্ররা এসে না দাঁড়ায় তা হলে যুদ্ধজয় সম্ভব নয় তাই ছাত্রদের নিয়েই আমার আন্দোলন আরম্ভ। আমার পাশে তারাই এসে দাঁড়িয়েছিল সে সময়।

প্রশ্ন হল, সেদিন যে মনোভাব ও উত্তেজনা ছিল তার পেছনে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা ছিল কি?

তা ছিল না। কিন্তু জাতীয়তাবোধের মাধ্যমেই গণসংযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গণসংযোগই মহৎ আন্দোলনের পথ খুলে দিয়েছিল।

মাও লিখত রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের সাফল্য, লিখত লালফৌজের সাফল্যের মূল কারণ, সব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করত মার্কসের মতবাদের ভিত্তিতে কিন্তু সেদিনও চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়নি, সোদনও সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেনি। মাও চেনকে একসময় আদর্শ মনে করত। তাই বিনা দ্বিধায় প্রচার করল চেনের প্রবর্তিত গণতন্ত্র সত্যিই চীনের উপযোগী। সেদিনের মানুষ মাওয়ের এই প্রচার ব্যবস্থায় বিস্মিত হয়নি, কারণ সেদিন চীনের মানুষ রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল তাই গণতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করাকে মোটেই অন্য দৃষ্টিতে দেখেনি। কিন্তু সেই লেখার ও প্রচারের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সর্বহারা একনায়কত্বের চিন্তাধারা। গোপনে অথচ বিশদভাবে মাও তার এই পত্রিকায় তার মনের ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রকাশ করত।

মাওয়ের দৃষ্টি ছিল না কৃষক সমাজের ওপর, অন্তত সেই সময় কিন্তু তার ওপরওলা লি তা-চাও কৃষকদের দিকে দৃষ্টি দিতে বলত মাঝে মাঝে। কৃষকরাই যে চীনের মেরুদণ্ড সে কথা বুঝিয়ে দিত মাঝে মাঝে। মাও

বিশ্বাস করত চীনের সমগ্র জনসাধারণ একটা বিরাট শক্তির বাহক। এদের বিপ্লবের পথ দেখাতে পারলেই চীনের মুক্তি ঘটবে। মাও মত পরিবর্তন করেছে অনেক সময়। অনেক সময়ই মাও সমাজ ব্যবস্থার কোন দিক প্রগতিশীল, আর কোনদিক প্রতিক্রিয়াশীল, তা নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু কোন সময়ই 'বিপ্লব'কে ছোট করে দেখেনি এবং সব প্রচারের পেছনেই ছিল চীনের জনবিপ্লবের ইঙ্গিত।

পত্রিকার অধিকাংশই লিখত মাও নিজে। পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনুগামীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা ছাপা হয়েছিল দু হাজার কপি এবং তা একদিনেই বিক্রি শেষ হতেই পরবর্তী সংখ্যা ছাপা হয়েছিল পাঁচ হাজার কপি। তাও নিঃশেষ হতে বিলম্ব ঘটেনি। পত্রিকার জনসমাদর যতটা বৃদ্ধি পেল ততটা স্থান লাভ করল মাও জনমানসে।

কিন্তু ?—মাও দুঃখ করে বলল।

কিন্তু কি বন্ধু ?

আমাদের পত্রিকা যথেষ্ট প্রচার লাভ করলেও তা থেকে যাচ্ছে একটি শ্রেণীর মধ্যে। চীনের শতকরা নব্বই জন মানুষ হল অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাদের মধ্যে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে তো পারছি না।

আমরা মুখে মুখে প্রচার করব।

তাতেও অসুবিধা আছে বন্ধু। আমরা যে ভাষায় পত্রিকা বের করছি তার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিল নেই। পোষাকী ভাষা বুঝতে অনেকেরই অসুবিধা। তাই মনে করেছি যে ভাষা সবার বোধগম্য হবে অর্থাৎ কথ্য ভাষায় পত্রিকা বের করতে হবে তা হলেই সাধারণ মানুষকে পড়ে শোনালে সহজেই তারা বুঝতে পারবে।

সবাই সমর্থন জানাল মাওয়ের প্রস্তাবকে।

মাও তার বক্তব্য ছাপতে লাগল কথ্য ভাষায়। সামান্য শিক্ষিত লোকেরা আকৃষ্ট হল পত্রিকার প্রতি।

লোকে বলল, সাহিত্যে নতুন যুগ আনল মাও। এর আগে কেউ তো সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্য রাখেনি জনসমাজে।

মাও হেসে বলল, সাধারণ মানুষ যা বোঝে না তা বলার মত বেকুবি কিছু নেই।

যারা পুরাতনপন্থী তারা নাক সিঁটকে বলল, ট্রাস্। যত সব ছোটলোকের কাণ্ড!

মাও হেসে বলল, তোমরা যে ভাষায় কথা বল তা যদি ছোট-লোকের ভাষা হয় তা হলে তোমরাও তো ছোটলোক।

উত্তর দেয়নি তারা তবে মনে মনে চটেছিল নিশ্চয়ই।

মাও বলল, আমার বক্তব্য পাঠ করে যদি জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি না হয় তা হলে সে বক্তব্য ছেপে জনতার সামনে তুলে ধরাও মুর্খতা। যুক্তি ও বাস্তবতা বিহীন ঘটনা যদি পেশ করতে হয় আর যদি তা সাধারণের অবোধ্য ভাষায় পেশ করতে হয় তা হলে কাগজ কালি ও ছাপার জন্য খরচ করে অর্থনষ্ট অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু মাও অগ্রসর হতে পারল না।

পঞ্চম সংখ্যা বের হবার পর ষষ্ঠ সংখ্যা নিয়ে মাও তখন ব্যস্ত।

সন্ধ্যা বেলায় ফৌজ এল সরকারী পরোয়ানা নিয়ে।

প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হল।

কেন?

তোমাদের পত্রিকায় যা ছাপা হচ্ছে তা সরকারের অনভিপ্রেত।

আর কিছু?

তোমাদের কাগজ ছাপা বন্ধ। কাগজ বাজেয়াপ্ত। তোমাদের ছাত্র সমিতি বেআইনী।

কার আদেশ?

এই দেখ গভর্ণর চ্যাং চিং-ইয়াওয়ের আদেশ।

ফৌজ তালা বন্ধ করল ছাপাখানায়। ছাপা কাগজ, পাণ্ডুলিপি সব বস্তাবন্দী করে নিয়ে গেল ফৌজের অধিকর্তা। সবাই হায় হায় করল।

মাও চিন্তিত হল না।

পরের সপ্তাহেই তার সম্পাদনায় বের হল নয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা সিন হুনান। মাওয়ের কলম থেকে বের হতে লাগল সমাজ সংস্কারে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। এটাও ছাত্রদের মুখপাত্র। তাই ছাত্র সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

জেনারেল চ্যাং চিং ইয়াও চুপ করে বসে ছিল না। কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আবার ফৌজ বাজেয়াপ্ত করল, সিন হুনান পত্রিকা।

এবারও মাও কিন্তু চুপ করে রইল না।

চুপি চুপি দেখা করল চ্যাংসার দৈনিক পত্রিকা 'তা কুং পাও' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। বলল, তোমার কাগজে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখতে চাই বন্ধু।

তোমার লেখা ছাপতে তো আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার লেখা খুবই বিতর্কমূলক। তাই ছাপতে ভয় হয়। কখন বা জেনারেল চ্যাং আমার ওপর তার নিষ্ঠুর আদেশ দেয় তারই বা ঠিক কি! সেজন্য খুব সাবধানতার সঙ্গে লিখতে হবে।

দেখ বন্ধু, আমিও খুবই সাবধানে লিখছি তবে জেনারেল চ্যাংকে ভাল করে শিক্ষা দেবার ইচ্ছা আমার আছে। তা হবে অন্য ধরণের। বর্তমানে আমি সমাজে নারীর অবস্থা নিয়েই যা কিছু লিখব। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

তুমি আবার মেয়েমানুষ নিয়ে লিখবে কেন?

বুঝতে পারছ না বন্ধু। নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এ যুগের উপযোগী ধর্ম। আমাদের সমাজে মেয়েদের স্থান অতিশয় হীন। মেয়েদের ওপর আমরা যে অত্যাচার করি তার নিরসন প্রয়োজন। একটা খবর শুনেছ কি?

সম্পাদক কপালে চোখ তুলে বলল, কোন খবর ?

মিস চাও আত্মহত্যা করেছে।

সম্পাদক হেসে বলল, এ তো হামেশাই হয়। এ তো নতুন খবর নয়।

কিন্তু কেন সে আত্মহত্যা করল তা কি ভেবেছ কখনও ?

দরকার হয়নি।

আজ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে হলে এসব চিন্তা করতে হবে বন্ধু। মিস চাওয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল একটি অপ্রার্থিত পুরুষের।

সম্পাদক বাধা দিয়ে বলল, আমাদের দেশে চিরকালই পিতামাতার ইচ্ছা অনুসারেই কন্যার বিয়ে হয়ে থাকে। সামাজিক এই বিধি হাজার হাজার বছর ধরে আমরা দেখে আসছি।

হাজার হাজার বছর ধরে যদি অন্যায় করে থাকি সেই অন্যায়কে চিরকাল ন্যায় বলে গ্রহণ করতে হবে কি ? মিস চাও যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে বিয়ে দিলে মিস চাও সুখী হতো অথচ একটা প্রাণ বাঁচত। আমরা মেয়েদের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। প্রাচীন যুগ থেকে আমরা মেয়েদের ক্রীতদাসী মনে করে এসেছি, আজও তাই মনে করছি। এর পরিবর্তন চাই।

বেশ। তুমি সে বিষয়ে লিখতে পার।

মাও সেদিনই লিখল : গতকাল যে মহিলাটি আত্মহত্যা করেছে তার কারণ আমাদের সমাজে লজ্জাজনক বিবাহ ব্যবস্থা। আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের জন্য এরকম ঘটনা ঘটে, ব্যক্তির স্বাধীন সত্ত্বাকে সম্মান করা হয় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সব বিবাহ ব্যবস্থা যেমন পারিবারিক অশান্তি আনে তেমনি আনে ব্যক্তির জীবনে দুর্যোগ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারীর সম্মান রক্ষা করতে ও তাদের সম অধিকার দিতে মাও কলম তুলে নিল। তার প্রবন্ধ ছাপা হল দৈনিক 'তা কুং পাও'তে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ওপর কঠিন আঘাত দিয়ে বক্তব্য পেশ করতে লাগল

মাও। ফলে নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা করতে হল বুদ্ধিজীবিদের।

লেখা নিয়ে মাও নিশ্চেষ্ট রইল না।

জেনারেল চ্যাংকে উচিত শিক্ষা দেবার পথ খুঁজছিল মাও। লেখা বাদেও অবসর সময়ে মাও রাজনৈতিক কাজ নিয়েই মেতে থাকত, বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের দিকে বেশি নজর দিত।

নভেম্বর মাসে মাও ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনা করে জেনারেল চ্যাংকে অত্যাচারের প্রত্যুত্তর দিতে মোটেই ত্রুটি করল না। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংঘবদ্ধভাবে স্কুল পরিত্যাগ করে জেনারেল চ্যাংকে জানিয়ে দিল তাদের ঘৃণা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয় ক্ষোভ। ছাত্রদের মতলব বুঝতে পেরেছিল চ্যাং তাই ধর্মঘটের কয়েকদিন আগে সব ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সভায় ডেকে এনেছিল। উপস্থিত সবাইকে ডেকে চ্যাং বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসেছে তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো।

এই সভায় মাও উপস্থিত ছিল। যদিও মাও ছাত্র নয় তবুও সে ছাত্রদের এই সভায় এসেছিল চ্যাং-এর বক্তব্য শুনতে। চ্যাং বলা শেষ করে সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলল, সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচারণ মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহীর শাস্তি মৃত্যু। তোমরা যদি নির্দেশ মত না কাজ কর তা হলে আমি তোমাদের মাথা কেটে ফেলব।

চ্যাং-এর গর্বভরা উক্তি শুনে একজন ছাত্রী ভয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

মাও বসেছিল তার পাশে।

কাঁদছ কেন বোন ?

আমার মাথা কেটে নেবে বলছে।

এখনও তো কাটেনি। যখন কাটবে তখন কাঁদবে। কুকুরের চিৎকার শুনে যারা ভয় পায় তাদের বাঁচা মরা সমান।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েটি বলল, স্বয়ং জেনারেল বলছে।

এমন অনেক কুকুর বলে থাকে। তুমি কেঁদ না। চুপ করে বস।

সেদিনের সভায় যে ভাবে ধমকানি দিয়েছিল চ্যাং তাতে মনে হয়েছিল ছাত্ররা নিশ্চয়ই আর কোন রকম রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাবে না। কিন্তু ধর্মঘট হতেই চ্যাং বুঝতে পারল এভাবে ধমকে কিছু হবে না। যারা রাজনীতিকে ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে তাদের বিতাড়িত করতে হবে তার প্রদেশ থেকে। চ্যাং-এর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে লাগল দিন দিন। মাও তার সহকর্মীদের ডেকে মন্ত্রণা সভায় বসল।

চ্যাংকে জব্দ না করলে দেশের লোক বাঁচবে না। একটা পথ খুঁজতে হবে চ্যাংকে এ দেশ থেকে চিরতরে বিদায় করতে।

কেউ বলল গোপনে গুলি করে হত্যা করা হোক।

তাতে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তার চেয়ে আমরা কেন্দ্রের কাছে আবেদন করব, কেন্দ্র ইচ্ছা করল চ্যাংকে এই দেশ থেকে বিদায় করতে পারে।

তা হলে একটা ডেপুটেশন পাঠাতে হয় পিকিংয়ে। কে কে থাকবে এই ডেপুটেশনে তা তোমরা স্থির কর। স্মারকলিপিও একটা প্রস্তুত কর।

স্মারকলিপি তৈরী হল। ছাত্রদের আগ্রহে মাওকে যেতে হল তাদের সঙ্গে পিকিংয়ে।

পিকিং এসে মাও জনসমাজে আরও বেশি পরিচিত হবার সুযোগ পেল। আগের মত অখ্যাত একজন ছাত্র আর সে নয়। তার লেখা প্রবন্ধগুলো বিশেষ করে পিকিংয়ের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংবাদপত্রসেবীদের দৃষ্টিও পড়েছিল মাওয়ের ওপর। তার বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিময় প্রবন্ধগুলো সত্যই একটা নবযুগের ইঙ্গিত দিয়েছিল তৎকালীন চীনা বুদ্ধিজীবি মহলে।

অধ্যাপক ইয়াং চ্যাং-চি মারা গেছেন।

মাও তাঁর বাড়িতে ছুটে গেল কাই-হুইকে সমবেদনা জানাতে। সেই সময়ই প্রথম তারা দুজন নিজেদের মনের কথা বলতে পেল একে অপরকে। তাদের ভালবাসা দানা বাঁধল সেই সময় থেকে।

এতদিন মাও নানা মতের চাপে কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় পৌঁছতে পারেনি। হয়তবা সে ক্ষমতা তার ছিল না। এবার পিকিং এসে মাও প্রথম মার্কসের লেখা পড়ল। কিরকুপের অনুবাদ পড়তে পড়তে বাহ্যজ্ঞান হারাবার উপক্রম। সঙ্গীরা সব সময়ই দেখত মাও গভীর ভাবে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেসটো পড়ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই বলত এতদিন পথ খুঁজে পাইনি। এবার পথের সন্ধান পেয়েছি। এই চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে যেতে পারছিনা। যতই পড়ছি ততই মোহিত হচ্ছি। মানব জাতির ইতিহাসে এমন একটি যে মুক্তিমন্ত্র থাকতে পারে তা আগে জানতাম না।

কিন্তু আমরা যে জন্য এসেছি সে কাজ তো হয়নি মাও।

চ্যাংকে বিতাড়িত করা। আমরা স্মারকপত্র দিয়েছি।

তাতে কাজ হবে না। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তা বিনা তা কি সম্ভব।

প্রভাবশালী ব্যক্তি! তাই তো। হাঁ, মনে পড়েছে। নর্মাল স্কুলে যখন পড়তাম তখন আমার শিক্ষক ছিলেন আই পেই-চি। বর্তমানে তিনি কুয়োমিনটাং দলের বেশ প্রভাবশালী সদস্য। তিনি থাকেন হেং ইয়াং-এ। তার কাছে যেতে হবে। উনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। চল তার কাছে।

তাহলে সাংঘাই যেতে হবে।

অবশ্যই।

সবাই চলল হেং ইয়াং-এ আই পেই-চির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

মাওকে দেখেই আই পেই-চি বলল, কি খবর মাও?

স্যার একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে এসেছি আপনার সাহায্য পেতে।

কি গুরুতর বিষয়!

আমাদের গভর্নর চ্যাং চিং ইয়াও অত্যাধিক অত্যাচারী। তাকে বদলী করাতে হবে হুনান থেকে। আমরা একটা স্মারকলিপি দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আপনি তদ্বির করলে আমরা এই নিষ্ঠুর লোকটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

তুমি তো ভাল কথাই বলছ মাও কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। জান তো কুয়োমিনটাং-এ জেনারেলদের ক্ষমতা অপরিসীম। আমাদের রাষ্ট্রশীর্ষ চিয়াং কাইশেকও একজন জেনারেল। তার কাছে আরেক জন জেনারেলের বিরুদ্ধে বললে তা শুনবে কেন!

তাহলে আমাদের সহ্য করতে হবে এই স্বৈরাচারীর অত্যাচার।

সেও তো কথা। তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি বা আশা দিতে পারছিনা। তবে আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। তুমি কদিন পরে এসে খবর নিও।

মাও সঙ্গীদের নিয়ে বিদায় নিল।

সাংঘাতেই থাকতে হল কদিন। যে কদিন সাংঘাইতে ছিল সে-কয়দিন সে খুঁজেছে চেন তু-সুইকে। চেন ছাত্র বিদ্রোহের সহযোগিতা করেছিল। চেন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean of faculty, সে সমর্থন করেছিল ছাত্রদের। এই অপরাধে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

ছয় মাস কারাবাসের পর চেন সবে মুক্ত হয়েছে। পিকিং ছেড়ে এসে বসবাস করছে সাংঘাইতে। মাও এসব সংবাদ শুনে কাই-হুইয়ের কাছে। সাংঘাই এসেই চেনের খোঁজ করেছে। অবশেষে চেনের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছে। শুধু সাক্ষাৎ নয় দিনের পর দিন আলোচনা করেছে মার্কস্‌বাদ নিয়ে।

চ্যাংকে বিতাড়িত করার চেষ্টা থেকে মাও নিরস্ত হয়নি। মাঝে মাঝেই আই পেই-চির সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। অবশেষে বিশ সালের জুন মাসে আই পেই-চি এল চ্যাংসায়। চ্যাং বিতাড়িত হল, শাসন ক্ষমতা গেল তান ইয়েন-কাই ও চাও হেং-তির হাতে। আই পেই-চি

বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় নর্মাল স্কুল সমূহের ডিরেকটার পদে নিযুক্ত হওয়াতে মাওয়ের কিছু সুবিধাও হল।

মাও বেকার। কাজ নেই, আহার্য সংস্থান এখন তার পক্ষে দুরূহ কার্য। আই পেই-চির কাছে গেল কাজের আশায়।

আই পেই-চি এখন সমাজে ও শাসন ব্যবস্থায় বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। মাও চাইল একটা কাজ।

আমাকে একটা কাজ দিতে হবে স্যার। আমার পকেট শূন্য। না খেয়ে থাকতে হবে এরপর।

আই বলল, ব্যস্ত হোয়োনা। একটা ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

ব্যবস্থা করেছিল আই পেই-চি। মাওকে প্রাথমিক নর্মাল স্কুলে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিরেকটার নিযুক্ত করেছিল।

চাকরি পেয়ে মাও বেঁচে গেল অনাহারের কবল থেকে।

গুরুতর সমস্যা এসে দেখা দিল মাওয়ের জীবনে।

কাই-হুইকে প্রস্তাব দিল মাও।

প্রস্তাব গ্রহণ করে কাই-হুই গেল অভিভাবকদের কাছে সম্মতি নিতে।

আমি মাও সে-তুংকে বিয়ে করতে চাই, বলল কাই-হুই।

চমকে উঠল অভিভাবকরা। বলল, তা কি করে সম্ভব। তোমার বাবার এত সম্পদ, সমাজে তার ছিল সম্মানীয় প্রতিষ্ঠা। তুমি যে পরিবারের মেয়ে তোমার পক্ষে মাও সে-তুং-এর মত দরিদ্র চালচুলো-বিহীন ছেলেকে বিয়ে করা উচিত নয়, সম্ভব নয়। আমরা সম্মতি দিতে পারি না। তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও সম্মতি দিতেন না।

আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। তোমাকে প্রতিপালন করার ক্ষমতাও মাওয়ের নেই। জেনে শুনে কোন ভিখারীর হাতে তুলে দিতে পারব না।

আমার বাবার সম্মতি ছিল। বাবার জীবিতকালে আমি বাবাকে

বলেছিলাম। কোন রকমেই অসম্মতি জানাননি কোন দিন। মাও ব্যক্তিগত ভাবে সামান্য চাকুরে হলেও তার পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। মোটেই সে ভিখারী নয়। তোমরা যে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছ তা মোটেই ঠিক নয়। আমিও বাগদত্তা। এ ক্ষেত্রে তোমাদের আপত্তি শুনলে আমার জীবন নষ্ট হবেই হবে। তাই কি তোমরা চাও?

তুমি সুখী হবে জেনেই বলছি তুমি মত বদল কর। অন্য কোন অর্থবান পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে আমরাও সুখী হব।

না। এ কথা আর কখনও বলো না তোমরা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কিছু করতে চাও তা হলে আমি আত্মহত্যা করব। আমার বাবা কখনও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে শেখায়নি। যুক্তিহীন কোন কাজ করতে বলেনি। আমি তোমাদের জুলুমবাজি সহ্য করতে রাজি নই। আমি মাওকেই বিয়ে করব।

অভিভাবকরা থামতে বাধ্য হল।

জ্যোতিষ ডাকা হল, দিন ঠিক হল। উৎসবের কোন ত্রুটি ঘটল না। মাওয়ের সঙ্গে কাই-হুইয়ের বিয়ে হল। বিয়েতে কন্যাপক্ষ অথবা বরপক্ষ কেউ যে বিশেষ খুশী হয়েছিল এমন নয় তবে পাত্র-পাত্রী উভয়েই খুশী হয়েছিল, সুখীও হয়েছিল তাদের দাম্পত্য জীবনে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিরেকটারের পদলাভ মাওয়ের পক্ষে আশীর্বাদ। বহু জনের সঙ্গে পরিচয় করার সুযোগ যেমন সে পেল তেমনি মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে পড়াশোনা করার সুযোগও পেল অনেক বেশি। সেই সময় মাও বন্ধুদের বলেছিল, I had become in theory and to some extent in action a Marxist, and from this time on I considered myself a Marxist—মাওয়ের শিক্ষকতা জীবন ও দাম্পত্য জীবন মাওয়ের বৃহত্তর জীবনের পথ প্রদর্শক।

ছাত্র সংগঠন নিয়েই এতকাল ব্যস্ত ছিল মাও। এবার তার কর্ম-ধারাকে শ্রমিক সংগঠনের দিকে পরিচালিত করল। শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে প্রচার চালাতে লাগল। সমষ্টির শ্রমলব্ধ অর্থকে চুরি করে মালিক ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করছে এ কথা বার বার শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরতে থাকে। শ্রমিক মনে চেতনা সৃষ্টি হতে থাকে ধীরে ধীরে।

মাও এই সামান্য অগ্রগতিতে মোটেই খুশী হতে পারেনি। মাও তখন হুনানকে ছেড়ে গোটা চীনের কথা চিন্তা করছে। সমগ্র চীনের শ্রমিক কৃষক ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন একটি মার্কস্-বাদী দল। এই দল ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র চীনে, তবেই তার স্বপ্নের সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

মাও চাইনিজ কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনে আত্মনিয়োগ করল।

তারই প্রথম প্রকাশ একুশ সালের জুলাই মাসে।

কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশন বসল এই জুলাইতে। মাও আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

উত্তরে পিকিং, মধ্যস্থলে সাংঘাই আর দক্ষিণে ক্যান্টন। এই তিনটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল কম্যুনিষ্ট প্রচার ব্যবস্থা। সর্বপ্রথম সাংঘাই এগিয়ে এল, তারপরই পিকিং, ক্যান্টন তখন অনেক পিছিয়ে। পিকিং ও সাংঘাইতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মাও তার নিজের প্রদেশ হুনানেও গড়ে তুলল কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, চ্যাংসায় প্রতিষ্ঠিত করল এই পার্টির কার্যালয়। সমাজতান্ত্রিক যুব সংগঠন গড়ে তুলল মাও। এই দুটোই মাওয়ের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকে। পরিপূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা অথবা কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রসার ঠিক সেই সময় হয়নি। তখনও এই পার্টির ভ্রূণ অবস্থা। একুশ সালের জুলাই মাসেই পার্টির জন্ম।

কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিল মাত্র তেরজন প্রতিনিধি। সাংঘাই, পিকিং, চ্যাংসা, য়ুনান, ক্যান্টন ও সিনান কেন্দ্রগুলি থেকে

দুজন করে আর জাপানে প্রবাসী চীনাদের তরফ থেকে একজন। অবশ্য তখন প্যারিসে চীনা ছাত্ররা যে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়েছিল তা থেকে কোন প্রতিনিধি আসতে পারেনি। চ্যাংসার প্রতিনিধি মাও স্বয়ং, চ্যাং কুয়ো-তাও নেতৃত্ব করেছিল পিকিং কেন্দ্রের, তুং পি-উ এসেছিল য়ুনান থেকে, চেন কুং-পো তখন ক্যান্টনের নেতা। কিন্তু মাওয়ের গুরু হল তা-চাও এবং চেন তু-সিউ আসতে পারেনি এই কংগ্রেসে। লি তখন ছিল পিকিংয়ে আর চেনকে শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করে সান ইয়াত সেন পাঠিয়েছিল ক্যান্টনে। বাহির থেকে দুজন যোগ দিয়েছিল এই কংগ্রেসে, একজন রুশীয় প্রতিনিধি, অপরজন ওলন্দাজ। ওলন্দাজ প্রতিনিধি হেনরিকাস স্লিভনিয়েট চীনের বিপ্লবে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের সংবাদ সরকার জানতে পেরেছিল। যাতে কংগ্রেসের অধিবেশন না হয় তার জন্য বিশেষভাবে চীন সরকার নানা কৌশলও অবলম্বন করেছিল কিন্তু নাটকীয়ভাবে অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করে কংগ্রেস উদ্যোক্তরা সাংঘাই শহরের ফরাসী অধিকৃত স্থানে অধিবেশনের ব্যবস্থা করল। ফরাসী অঞ্চলে চীন সরকারের এক্তিয়ার ছিল না, তবুও নিরাপদে বিনা বাধায় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়নি। পুলিশ অবশ্যই প্রতিনিধিদের আটক করতে ত্রুটি করেনি, জনসমাবেশ রোধ করতেও পুলিশ চেষ্টা করেছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েই ফরাসী এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের জুলুমে এখানেও প্রতিনিধিরা শেষ ও প্রকাশ্য সম্মেলনে যোগ দিতে পারেনি। এই প্রথম ও ঐতিহাসিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বসল চেকিয়াং প্রদেশের চিয়াসিং-র নিকটবর্তী সাউথ লেকে একটি নৌকায়। ছুটির দিনে অনেকেই এই লেকে আসে নৌ-বিহার করতে। প্রতিনিধিরা নৌ-বিহারীদের মত নৌকা ভাড়া করে কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন সম্পন্ন করেছিল।

এই কংগ্রেসেই বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিতাড়ণ করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, আরও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সর্বহারাদের বিপ্লবী একটি মুক্তি ফৌজ গড়ে তোলার।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ করে মাও ফিরে এল চ্যাংসায়।

তখন হুনানের শাসনকর্তা তান ইয়েন-কাই।

মাও প্রতিষ্ঠা করল প্রগতিশীল পুস্তক সমিতি (Cultural Book Society) পিকিং ও সাংঘাইতে সে সময় যথেষ্ট প্রগতিবাদী গ্রন্থ আসত কিন্তু সুদূর হুনানে তা পৌঁছত না। যাতে এইসব পুস্তক হুনানেও যথেষ্ট প্রচার হয় তার জন্য এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।

মাও মাঝে মাঝেই শাসনকর্তা তান ইয়েন-কাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত।

একদিন বলল, হুনানের প্রতি অবিচার করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের উচিত হুনানকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত (Autonomy) প্রদেশে পরিণত করা। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে তোমার পূর্ণ সম্মতি আছে।

শাসনকর্তা তান বেশ উৎফুল্লভাবেই বলল, আমার মনের কথাই তুমি বলেছ। সামরিক শাসনের দাপটে চীনের প্রদেশগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। অসামরিক শাসনব্যবস্থা চালু রাখা উচিত মনে করি। আর এই অসামরিক শাসকদের হাতে প্রচুর ক্ষমতাও থাকা উচিত। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় যুদ্ধবাজরা একথা শুনবে কি ? তারা নিজেদের ক্ষমতাকে মোটেই সঙ্কুচিত করতে রাজি হবে না।

তোমার যুক্তি ঠিক কিন্তু অসহ্য এই সামরিক শাসন। তাও যদি জেনারেলরা একমত হয়ে কাজ করত তা হলেও দেশের দুঃখ দৈন্য ঘুচত কিন্তু তাদের একজন আরেকজনকে পছন্দ করে না। অনবরত ষড়যন্ত্র আর খেয়োখেয়ি। এ নিয়ে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলতে পারে না।

আমিও এই মনে করি, বলল তান।

কিন্তু একটা পথ দেখতে হবে যাতে এই জুলুমবাজীর হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই।

বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয় মাও। আমি প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারব না। তোমরা যদি কিছু কর তা হলে আমি চোখ বুঁজে থাকব। কোন কাজেই বাধা দেব না। তোমরা আন্দোলন কর। আমার নীরব সমর্থন থাকবে সব সময়।

মাওয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল শাসনকর্তার এই প্রস্তাবে। মাও জানে, তান কোন জনপ্রিয় সরকার কোন কালে গড়ে তুলবে না। কিন্তু তাকে যদি নীরব দর্শক করে তুলতে পারে তা হলে নিশ্চিত মাও তার কাজে এগিয়ে যাবে। পুলিশ অথবা ফৌজ কোনক্রমেই কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। এই সুযোগ সৃষ্টি করতেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব দিয়েছে মাও। আরও উদ্দেশ্য ছিল এই ভাবে তানের গণতন্ত্রের অসারতাকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে পারবে। বিশেষ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নামে যে শোষণ চলছে তার আসল চেহারাটা যদি লোকে জানতে পারে তা হলে সর্বহারা একনায়কত্বের পথ উন্মুক্ত হবে।

মাও ভুল করল এই স্বায়ত্ব শাসনের ধুয়ো তুলে। তানের পরই শাসন ক্ষমতায় এল চাও হেং-তি। চাও হেং-তি প্রদেশের জন্য নতুন সংবিধান তৈরী করল। এই সংবিধানে সর্বময় কর্তৃত্ব পেল গভর্ণর। অপ্রতিহত গতিতে চাও অত্যাচার চালাতে থাকে জনসাধারণের ওপর। মাও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করল। চাও-এর শাসন ব্যবস্থাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করতে লাগল। মাও বুঝল, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যতদিন না সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিযুক্ত হয় ততদিন তা থাকে কায়েমীস্বার্থের মানুষদের শোষণের জন্য। তারা গণতন্ত্রের বুলি শোনায়, শোষণ চালায়, বুর্জোয়াদের তোষণ করে। সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে হুনানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বেনামে।

ভুল সংশোধন করার আর কোন উপায় নেই।

মাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজের অবসরে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে মন দিল। অবশ্য এই কাজেও মাও বেশিদিন নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। মাও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্যই কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনে ব্রতী হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের পর কর্মধারার যথেষ্ট পরিবর্তনও ঘটল।

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের সঙ্গে ছিল প্রতি মাসে পার্টির গতি ও প্রচার নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করে তা পাঠাতে হবে ইরকুটস্কে থার্ড ইনটারন্যাশ্যানালের কেন্দ্রে। এই ভাবে সোভিয়েতের সঙ্গে সংযোগও সৃষ্টি হল নতুন পার্টির। সে সময়ই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধবাজবিরোধী যে ম্যানিফেসটো তৈরী হয়েছিল তা যদিও প্রকাশ করা হয়নি তবুও তার প্রকৃতি ও বক্তব্য সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত সবাই ওয়াকিবহাল ছিল এবং সেই ধারাতেই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে টেনে নেবার জন্য আগ্রহী হয়েছিল পার্টির সদস্যরা।

মাঞ্চু সম্রাটদের হাত থেকে সান ইয়াত সেন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু সেই প্রজাতন্ত্রে ছিল কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার ব্যবস্থা। মাও সব সময়ই সান ইয়াত সেনকে মনে করত একজন যুদ্ধবাজ। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে সামন্তবাদী বুর্জোয়া শাসনের পরিপোষক হয়েছে এই সান ইয়াত সেন। যখনই কোন আলাপ আলোচনা হতো চীনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তখনই মাও চুপ করে থাকত, কোন সময় মতামত দিলেও তার মনের কথা কোন সময়ই ব্যক্ত হতো না। মাও যে কি ভাবে পার্টিকে নিয়ে চলতে চায় তা অন্যান্য সদস্যরা স্থির করতে পারত না। তাদের মনেও ধাঁধা সৃষ্টি হতো মাওয়ের কথাবার্তা ও কর্মপদ্ধতি দেখে। মাও যে কোন পথ অবলম্বন করবে তাও স্থির করতে পারত না অনেকেই।

মাওকে বুঝতে অনেকেই ভুল করেছিল সে সময়। চীনের তৎকালীন অবস্থাই মাওকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে বাধ্য করেছিল বাস্তব অবস্থাকে।

সান ইয়াত সেন চীনের অবিসম্বাদিত নেতা হতে পারেনি। চীনের শাসন ক্ষেত্রে সমরবিভাগের প্রাধান্য ছিল। সান ইয়াত সেন জাতীয়তাবাদী। সমর বিভাগের প্রধান ন্যাশান্যাল বুর্জোয়াদের সমর্থক। এমন কি সান ইয়াত সেনকেও আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে সাংঘাইতে যেতে হয়েছিল। সান ইয়াত সেন নির্ভর করত চেন চিউং-মিং-এর সামরিক সাহায্যের উপর। হঠাৎ এক সময় চেন হয়ে পড়ল সানের বিরুদ্ধবাদী। তখন বাধ্য হয়ে সান গ্রেপ্তার এড়াতে সাংঘাইতে আশ্রয় নিল। জাতীয়তাবাদী সান ইয়াত সেন জনসংযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি, তাকে বেশি করে নির্ভর করতে হয়েছিল সমরবিভাগের প্রধানদের ওপর। তাই সান ইয়াত সেনকে আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটতে হয়েছিল। রাজনীতির এই ভুলই তাকে এগোতে দেয়নি।

মাও তখন হুনানের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। কিন্তু পার্টির সদস্য সংখ্যা অতি নগণ্য। এমন কি গোটা চীন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা মাত্র সত্তর জন। মাওয়ের সম্মুখে তখন বিরাট কর্তব্য। বিশেষ করে সংগঠনকে প্রসার করাই হল বড় কাজ। সদস্য চাই, কিন্তু সদস্যরা যে খাঁটি কম্যুনিষ্ট হবে এমন কোন স্থিরতা নেই, তাই যাচাই করে নিতে হবে তাদের। পার্টির কাজ, শ্রমিকদের সংগঠন ছাড়াও মাও তখন আত্মনিয়োগ করল মার্কস্‌বাদ শিক্ষা দেবার কেন্দ্র স্থাপন করতে। যাতে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে দেশের অবস্থা জানতে পারে, যাতে তারা বাস্তব অবস্থা দেখে মার্কসীয় দর্শনকে আয়ত্বে আনতে পারে তার জন্যই Self Study University স্থাপন করেছিল মাও। তার প্রধান কর্মস্থল হল চুয়ান-শান মুয়ে-সি'র প্রাঙ্গণে। এখানে কেবলমাত্র মার্কসীয় দর্শন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাই হল না, প্রাচীন চীনের ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরা হতো। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের বীর যোদ্ধা তৈরীর কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

বাইশ সালে মস্‌কোতে সম্মেলন হল। তাতে যোগ দিল কুয়ো-

মিনটাং নেতারা। তার সঙ্গে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারাও যোগ দিয়েছিল এই সম্মেলনে। এই সম্মেলনে জিনোভিয়েভ বিপ্লবে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। এর ফলে মাও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সমঝোতা করে সংগঠনকে জোরদার করার বিষয় ভাবতে শুরু করল।

এদিকে মাও যেমন পার্টি সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিল তেমনি শ্রমিক সংগঠনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিল। শ্রমিক নেতাদের ওপর সরকারী অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সময় থেকে।

মাও পেল তুজন সঙ্গী।

তুজনেই হুনানের অধিবাসী। কম্যুনিজমের ওপর তাদের ছিল অসীম বিশ্বাস। এই তুইজন হল লি লি-সান এবং লিউ শাও-চি। শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা করতে এদের অবদান ছিল যথেষ্ট।

কদিন আগে শ্রমিকদের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ হয়েছে।

মাওয়ের কাছে সংবাদ এল এই সংঘর্ষে যে তুই জন শ্রমিক নেতৃত্ব করেছে, সরকারী আদেশে তাদের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে।

সংবাদ শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মাও সে-তুং।

এর প্রতিকার করতে হবে লিউ।

লিউ শাও-চি সংবাদ শুনে অধোবদনে ভাবছিল। মাওয়ের উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে বলল, নিশ্চয়। এই হত্যার বদলা নিতে হবে মাও।

কিন্তু কি ভাবে।

সমগ্র প্রদেশে শ্রমিক ধর্মঘট করাতে হবে।

আমাদের সংগঠনশক্তিতে তা সম্ভব কি ?

নিশ্চয় সম্ভব। তবে তার জন্য দিবারাত্র মেহনত করতে হবে। এক-একজনকে এক-এক ফ্রন্টে নামতে হবে। পর পর বহু ধর্মঘট করতে পারলে তবেই অত্যাচারী শাসকরা সংযত হবে। ভবিষ্যতে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।

কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে তারা পেছ পা হবে না।

তবুও আমাদের সংগঠনের শক্তি পরীক্ষার জন্যও এই কঠিন কার্যে ব্রতী হতে হবে।

সেইদিনই কর্মপদ্ধতি স্থির হল।

লিউ শাও-চি, লি-সান, ম্যাদাম কাই-হুই সবাই নেমে পড়ল কর্মক্ষেত্রে। মাও বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে শ্রমিকদের প্রস্তুত করে।

তারপর একদিন।

য়্যানিয়ুন খনির মজুররা কাজে গেল না।

মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে তারা শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে বিক্ষোভ জানাতে লাগল। চীনের ইতিহাসে চৌঠা মের পর এই দ্বিতীয় জনবিক্ষোভ। সেদিন পুরোভাগে ছিল ছাত্ররা, আজ পুরোভাগে এসেছে মজুররা। এই ধর্মঘট মিটতে না মিটতে হাংকাও রেলপথের কর্মীরা ধর্মঘট করল বেশি মজুরীর দাবীতে। পুলিশ, ফৌজ ছুটছে ধর্মঘট বানচাল করতে। কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে মজুররা ধর্মঘটে অবিচল রয়ে গেল। মাও কিন্তু চুপ করে রইল না এই দুটো সাফল্য-জনক ধর্মঘটকে ভিত্তি করে।

পাথরের মিস্ত্রি, ছাপাখানার কর্মী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা এই সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

সমাজের প্রচুর সম্পদ তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাও?—বলল মাও।

হাঁ।

কে ভোগ করছে সম্পদ?

কয়েকজন লোক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। উত্তর দিল তারা।

এই সম্পদ তারা পেল কি করে? চাষী আর মজুররা এদের সম্পদ

সৃষ্টি করে দেয় অথচ চাষী ও মজুররা বাঁচার মত নিম্নতম মজুরীও পায় না। চাষী ও মজুর শ্রেণী যদি সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য না করে তা হলে ধনীর সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব নয়। রাশিয়াতে কৃষক ও মজুরকে এইভাবে শোষণ করেছে ধনী সামন্ততন্ত্রীরা। কিন্তু সেখানকার মানুষ এই শোষণ সহ্য করেনি। কৃষক ও চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছিল সেখানে। ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, বুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া আর যুদ্ধবাজরা সে দেশ থেকে নির্মূল হয়েছে। আমাদের দেশেও তা সম্ভব। আমাদের কৃষক ও মজুররা সংঘবদ্ধভাবে ধনীর শোষণকে রুখতে পারে, সে শক্তি আছে তাদের। তাদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। তাদের বিপ্লবের মন্ত্র শেখাতে হবে, তা হলে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা আমরাও কায়েম করতে পারব। আমরাও সোভিয়েতের মত সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারব। তোমরা এগিয়ে এস, আমাদের কাজে সাহায্য কর ভয় পেও না কেউ।

শ্রমিক আর কৃষকরা এ রকম বাস্তব তথ্যপূর্ণ বক্তব্য শোনেনি কারও কাছে আজ পর্যন্ত। তারা আকৃষ্ট হল মাওয়ের প্রতি তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি। মাওয়ের আহ্বানে এবং বিশ্লেষণের দৃঢ়তায় সাফল্যলাভ করল শ্রমিক ধর্মঘট। অত্যাচারী শাসক চিন্তিত হল।

মাও তখনও চিন্তা করছে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে। কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্ট পার্টির আঁতাত কিন্তু সবাই ভাল চোখে দেখেনি। কম্যুনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরেও ভিন্ন মত দেখা দিয়েছিল। আশঙ্কা ছিল কুয়োমিনটাং-এর বুর্জোয়া তোষণ নীতির সঙ্গে আপোষ করলে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরবে। আবার কুয়োমিনটাংও ভীত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে কম্যুনিষ্টদের তাদের দলে প্রবেশ করতে দিতে। তারাও ব্যক্তিগতভাবে কোন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য যদি তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করে তাহলে আপত্তি জানাবে না বলে স্থির করেছিল। এও করেছিল শুধু সহযোগিতার ভিত্তিতে, আদর্শের ভিত্তিতে নয়।

ওলন্দাজ হেনরিকাস এই আঁতাতের বিপক্ষে ছিল। ওলন্দাজ উপনিবেশ যাভা সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদীরা ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সারেকাত ইসলামের অঙ্গ। যখনই কোন আন্দোলনে এগিয়ে গেছে সমাজবাদীরা জাতীয়তাবাদীদের সহযোগিতায় তখনই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে উভয় দলে, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হয়নি। সহযোগিতার প্রশ্নে আঁতাত কখনও সুফল প্রসব করে না, কারণ আদর্শ ভিন্ন হলে তাতে কুফল দেখা দেয় আর অত্যাচার ভোগ করে সাধারণ মানুষ। পৃথিবীর যে দেশেই এই ভিন্ন মতাবলম্বীরা সহযোগিতার ফর্মুলা নিয়ে এগিয়েছে সেই সব দেশেই সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা ও অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতার দরুণ হেনরিকাস কোনক্রমেই কুয়োমিনটাং-এর সহযোগিতার ওপর কোন আস্থা রাখতে পারেনি।

কিন্তু সহযোগিতার প্রশ্নেই কম্যুনিষ্ট পার্টি কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। অতি নিকট ভবিষ্যতে দেখা গেল কম্যুনিষ্ট পার্টি শহর এলাকায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অচিরেই নষ্ট হয়ে গেছে। বলতে গেলে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ও কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে পড়েছিল এই আঁতাত করাতে। প্রাক্‌বিপ্লব কোন সময়ই শহর এলাকায় খুব শক্ত সংগঠন গড়তে পারেনি কম্যুনিষ্ট।

অনেকেই সখেদে বলেছে, আদর্শের যেখানে সংঘাত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে আঁতাত করলে আদর্শচ্যুত হওয়া ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। সর্বহারা একনায়কত্বের যেখানে সমস্যা সেখানে বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে এক আসনে বসলে সমস্যা সমাধান না হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরাই বেশি সুযোগ পায় ও শক্তিশালী হয়।

এই ভুল কেন হল? মাও নিজে সংশোধনবাদী ছিল না। সংশোধনবাদীর পক্ষে এই ভুল মোটেই ভুল নয়। এ তাদের নীতি। চীন সর্বতোভাবে পশ্চাদপদ দেশ। চীনের অবস্থা, "Since China is economically backward, the number of her industrial

workers (industrial prolitariat) is not large. Of the two million industrial wokers, the majority are engaged in five industries, i. e. railways, mining, maritime. Transport, textiles and ship-building, most of them work enterprises owned by foreign capital.' আসল সর্বহারা হল চীনের কৃষক, তারা গ্রামীন আর শ্রমিকদের বৃহদাংশই হল শহরের অধিবাসী। এদের মধ্যে কৃষকদের অবস্থাই ছিল সর্বাধিক অসহনীয়। তাদের মুক্তির পথ দেখাতে হলে সর্বতোভাবে তাদের মধ্যেই কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি নজর দেওয়া হয়েছিল শ্রমিকদের ওপর। শ্রমিকদের একটা অংশ মোটামুটি স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে মালিকের দয়াতে এবং মালিকের স্বার্থে, সেখানে সংগঠন গড়ে তোলার সঙ্গে বুর্জোয়া সংঘাতের আশঙ্কা থাকে। এরা কমবেশি জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষক। তারা কোনক্রমেই শ্রমিক আন্দোলনে সহযোগিতা করতে পারেনা। যদি করে তা হবে আত্মহত্যা তুল্য। সে জন্য কম্যুনিষ্টদের কোনক্রমেই উচিত হয়নি কুয়োমিনটাংকে বিশ্বাস করা এবং মেহনতী মানুষের আন্দোলনে তাদের সহযোগিতালাভের চেষ্টা করা। এই ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই শুধু ভুল নয়, এই ভুল সামাজিক দৃষ্টিতেও ভুল। সংগ্রামী মানুষকে বিপন্ন করাই হল এর কুফল, এতে এদের মনোবল নষ্ট হয়। যা হয়েছিল চীনে।

চীনের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের গতি যে কোন পথ ধরবে তা এখনও স্থির করতে পারেনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা। সহযোগিতার প্রশ্নে অনেক সমস্যা দেখা দিল।

শ্রমিক শ্রেণীর অবদান যে সামান্য নয় এবং তা উপেক্ষা করা উচিত নয় তাও সবাই বুঝেছিল।

আমাদের কর্তব্য হল কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করা।

কেন? প্রশ্ন করল লি লি-সান।

কুয়োমিনটাং প্রগতিশীল দল। তাদের লক্ষ্য হল যুদ্ধবাজদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করা। পিকিংয়ের সমর নেতারা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। আর কুয়োমিনটাং দক্ষিণ দেশে প্রতিষ্ঠিত করছে জনতার রাজ্য। আমাদের উচিত সর্ব প্রকারে কুয়োমিনটাংকে সাহায্য করা।

তোমার কথা স্বীকার করতে পারছিনা মাও। কুয়োমিনটাংকে সাহায্য করতে আমরা যদি কুয়োমিনটাং-এর কুক্ষিগত হই তা হলেই সর্বনাশ। যদি আমাদের মতে তাদের টানতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের লাভ কিন্তু আমাদের আশঙ্কা আছে আমরা যে প্রতিক্রিয়াশীলকে প্রশ্রয় দেব তা আমাদের চূর্ণ বিচূর্ণ করবে। (If we fail to do so, we might be crushed by the machine which we ourselves had helped to create.)

মাও স্বীকার করল না তাদের যুক্তি। সর্বান্তকরণে এবং উৎসাহ সহকারে মাও কুয়োমিনটাং দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে চলল।

তার এই কাজ সমর্থন করতে পারেনি কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক সদস্য।

স্টালিনও সে সময় ভুল করল। স্টালিনও মনে করেছিল কুয়োমিনটাং একটি প্রগতিশীল দল। বোধ হয় সোভিয়েতের এই মনোভাবই মাওকে সহযোগিতার পথে এগিয়ে নিয়েছিল। মাও সে-তুং নির্বাচিত হল কুয়োমিনটাং দলের সংবিধান রচনা কমিটিতে। মাও সেই সময় কুয়োমিনটাং কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য।

এর মধ্যে মাওকে যেতে হল সাংঘাই। যাবার সময় মাও একটি বিবৃতি দিয়ে কুয়োমিনটাং দলের আসল চেহারা উদঘাটিত করল, মাও বলল, অসার এই দল, hallow organisation এই দল।

কুয়োমিনটাং-এর আদর্শের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট আদর্শের গুরুতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কি করে এটা সম্ভব হল তা ভাবতে হয়েছে দেশের তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের।

মাও প্রস্তাব দিল, কুয়োমিনটাং-এর শক্তি যে সব এলাকায় সংহত সে সব এলাকায় দলের শতকরা সত্তর ভাগ অর্থ ও সামর্থ্যকে নিয়োগ করা হোক। বাকি অংশ যে সব এলাকায় দলের কাজ দুর্বল সেইসব এলাকায় নিয়োগ করা হোক।

মাও এক ধারে কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় উচ্চ পদাধিকারী সদস্য। অপরদিকে কুয়োমিনটাং-এরও সদস্য। সাংঘাইতে দুই দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও কোন ক্রমেই দু দলের সমন্বয় ঘটাতে পারেনি মাও।

আর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী লি লি-সান সকল সময়ই মাওয়ের এই দুই দলের সদস্যপদের সর্বনাশা ফলাফলের কথা শুনিয়েছে। সমালোচনাও হয়েছে কঠোর ভাবে। লি বলতে বাধ্য হয়েছে, তুমি কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যত বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছ তাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ বিষয়ে সতর্ক না হলে পরিণামে আপশোষ করতে হবে।

মাও প্রথম প্রথম এ সব সমালোচনায় বিশেষ বিব্রত হতো না কিন্তু পার্টি সদস্যদের বার বার সতর্কতামূলক আলোচনায় মাওকে ভাবতে হয়েছে কতটা সে ভুল করেছে অথবা করছে।

আমাদের পার্টির স্বাতন্ত্র্য তুমি যেন বিক্রি করতে বসেছ কুয়োমিনটাং-এর কাছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। উত্তরের যুদ্ধবাজদের সঙ্গে লড়াই করে অখণ্ড চীন গণতন্ত্রের যে স্বপ্ন দেখছ তাকে সার্থক করার ক্ষমতা নেই কুয়োমিনটাং-এর। এরা বর্ণচোরা সামন্ততন্ত্রবাদী বুর্জোয়া। এদের বিশ্বাস করার অর্থ নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। আমরা তা হতে দেব না।

মাও যুক্তি দিয়েছিল, ওরাও প্রগতিশীল। ওদের দক্ষিণে নিজস্ব

আস্তানা আছে। সংগঠন আছে। আমরা যদি সহযোগিতা করি তা হলে ধীরে ধীরে আমাদের পার্টিরও প্রসার ঘটবে।

আমরা এই থিওরীতে বিশ্বাস করিনা। ইতিমধ্যে কুয়োমিনটাং দল শ্রমিক এলাকায় স্থান করে নিয়েছে। কৃষকদের মধ্যেও করছে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে ওরা যদি একবার শক্ত ভাবে-চেপে বসতে পারে সাধারণ মানুষ তখন বিচার করার অবসর পাবেনা তাদের আসল উদ্দেশ্য। ফলে আমাদের যে অগ্রগতি তা বাধা পাবে পদে পদে। আমরা খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনছি। মাও তুমি ভুল করছ।

আমি মনে করছি, এটাই প্রশস্ত পথ কুয়োমিনটাংকে গ্রাস করার।

কেউই সহজে মাওকে সমর্থন করল না। যারা মাও সম্বন্ধে কিছুটা দুর্বল তারা কোন মতামত না দিলেও ভেতরে ভেতরে কেউ-ই মাওকে সমর্থন করতে পারছিল না।

মাও নিজেও তখন ক্লান্ত। দুটি দলের কাজ, নিজের দলের সমালোচনা— দেহ ও মনকে ক্লান্ত করেছিল এই কাজ ও মানসিক দ্বন্দ্ব। সাংঘাই ছেড়ে মাও ফিরে গেল তার গ্রামের বাড়ি সাওসানে। সঙ্গে গেল তার স্ত্রী কাই-হুই। বিশ্রামের প্রয়োজন মাওয়ের।

মাও বিশ্রাম পেল না।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করল কয়েক বছর আগে গ্রামের দরিদ্র চাষীরা যেমন সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাত না, বর্তমানে ঠিক সেই অবস্থা নেই। চাষী ক্ষেতমজুররা আগের চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতিতে আগ্রহী। কিন্তু এদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি বিশেষ নজর দেয়নি, বরং কুয়োমিনটাং এই জনজাগরণের বেশি সুযোগ নিয়েছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এল জমিদারের দুলাল পেং-পাই। এসেই তার কার্য ক্ষেত্র করে নিল চাষীদের মধ্যে। কুয়োমিনটাং চাষীদের জন্য আলাদা একটা বিভাগ খুলতেই তার কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দিল পেং-পাই। তাকেই কমিটির সেক্রেটারী মনোনীত করল দলের সদস্যরা। কৃষকদের

মধ্যে কুয়োমিনটাং ভাবধারাকে প্রচার করার জন্য একটি শিক্ষায়তন খোলা হল তারও অধ্যক্ষ হল পেং-পাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সব সদস্য কুয়োমিনটাং-এর সহযোগিতা করছিল তারা স্বীকার করতে চাইল না যে চীনের মত দেশে চাষীদের মধ্যে কাজ করার মত কিছু থাকতে পারে কম্যুনিষ্টদের জন্য। একজন নেতা প্রকাশ্যে বলল, 'Over half the peasants ore petty bourgeois landed proprietors who adhere firmly to private property conciousness. How can they accept communism?' যাদের অর্ধেক হল ব্যক্তি স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ আধা বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই সব চাষীরা কম্যুনিজমকে গ্রহণ করবে কেন? চীনের চাষী ও চাষের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এই ভুল ধারণাই কম্যুনিষ্টদের পিছিয়ে রেখে কুয়োমিনটাং এগিয়ে গেল। অথচ Peasant International থেকে নির্দেশ এল চাষী সমস্যাই হবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সকল নীতির প্রধান নীতি।

সোভিয়েত চায় চীনের কম্যুনিষ্ট সদস্য কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলুক আর এই ইচ্ছা পূরণ করতে বহু কম্যুনিষ্ট সদস্য কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কিন্তু বহু সদস্য এই সহযোগিতাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা সন্দেহের চোখেই দেখত এই ব্যবস্থাকে। উপরন্তু তাদের ভয় ছিল এই ব্যবস্থায় কুয়োমিনটাং কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার চিন্তাধারার সর্বপ্রকার সর্বনাশ করতে মোটেই ত্রুটি করবে না।

সান ইয়াত সেন ছিল বিচিত্র চরিত্রের লোক। বলতে গেলে অস্থির চীত্রের লোক ছিল সান।

সে চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিন্তু তার সহকর্মীরা তাতে সায় না দেওয়াতে কুয়োমিনটাং-এর প্রথম কংগ্রেসে যে দলিল আনা হল তা থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্যগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করা হল। সেই দলিলে যা লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত করা হল তাতে জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কোন

কথাই রইল না। রইল কতকগুলো কথার মারপ্যাঁচ—empty phrascology. এমন কি চীন সোভিয়েত মৈত্রীর যে মূল কথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই তাকে শুধু মাত্র কায়েমী স্বার্থের চাপে সান ইয়াত সেন তার দলিল থেকে বাদ দিল। উত্তর চীনের ক্ষমতায় বসে রয়েছে জাপানের সমর্থক সাম্রাজ্যবাদের দালাল আর দক্ষিণে রয়েছে নব্য চীনের নেতা সান ইয়াত সেন।

উত্তর থেকে তুয়ান চি-জুই সান ইয়াত সেনকে নেমন্তন্ন করল রাজনৈতিক আলোচনার জন্য। তুয়ান উত্তর-দক্ষিণ চীনকে এক সূত্রে বাঁধার জন্যই সান ইয়াত সেনকে ডেকেছিল। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সান রওনা হল পিকিংয়ের পথে। যাবার সময় জাপানের পথে পিকিং গিয়েছিল। জাপানে গিয়ে সান ইয়াত সেন জাপানের প্রশস্তি করে বহু সভায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল। কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা এই বক্তৃতা শুনে চমকে উঠল। সান ইয়াত সেন এতকাল বিপ্লবের কথা বলেছে, এতকাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলেছে, সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা বলেছে, কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া পুঁজির ধ্বংস কামনা করেছে অথচ জাপানে পা দিয়েই সান ইয়াত সেন সাম্রাজ্যবাদের পারিষদে পরিণত হল, আশ্চর্য।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা চিন্তিত, ভীত ও তাদের প্রয়োজন হল তাদের নীতি আবার বিবেচনা করা। অবশেষে তাদের মুখপত্রে প্রবন্ধ বের হল, তাতে তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করল, সান ইয়াত সেনের ওপর তাদের কোন আস্থা নেই এবং সান ইয়াত সেন বিপ্লবের পরিপন্থী।

কম্যুনিষ্ট পার্টি সান ইয়াত সেনের কার্যাবলী সমর্থন করতে পারল না। তাদের মনে সন্দেহ ধূমায়িত হতে থাকে, তারা প্রকাশ্যে সান ইয়াত সেনের বিরোধিতা আরম্ভ করল। এই বিরোধ বেশি দিন থাকে নি। হঠাৎ সান ইয়াত সেন মারা গেল পিকিংয়ে পঁচিশ সালের মার্চ মাসে। সানের উপর যাদের ব্যক্তিগত অনাস্থা ছিল তারাও তখন তার নাম নিয়ে মেতে উঠল। তখন কম্যুনিষ্টরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে

দিল কুয়োমিনটাংকে। কিন্তু যারা আদর্শবাদী কম্যুনিষ্ট, যাদের দূর-দর্শিতা ছিল তারা ভাবতে থাকে, কারণ এই সহযোগিতার সুযোগে কুয়োমিনটাং তার রাজনৈতিক সংগঠন ও সামরিক শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি করতে পারে। সোভিয়েটের সঙ্গেও কুয়োমিনটাংয়ের সম্পর্ক কিন্তু ভাল চলছিল না, কম্যুনিষ্ট নেতা চেন তু-সিউও কুয়োমিনটাংকে ভাল চোখে দেখছিল না। বাইরে যে কোন অবস্থাই থাকুক ভেতরে ভেতরে তিনটি দল ভিন্ন মত ধরে চলছিল।

মাও তখনও কুয়োমিনটাংকে সাহায্য করতে উৎসাহী।

উনিশ শ' পঁচিশ সাল।

তারিখ পঁচিশে মে।

মাওয়ের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হল সেই দিন।

সাংঘাই শহরের একটি কারখানা।

কারখানার ফোরম্যান একজন জাপানী। এই ফোরম্যান নিরপরাধ একজন চীনা শ্রমিককে হত্যা করল। ঘটনার গতি অন্য পথে মোড় নিল। সাংঘাই শহরের শ্রমিক ও ছাত্ররা এই হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বের হল রাস্তায়। এই কারখানা ছিল ইংরেজ অধ্যুষিত ও শাসিত এলাকায়। ইংরেজ পুলিশ অফিসারের আদেশে পুলিশ গুলি করল নিরস্ত্র জনতাকে। বিক্ষোভকারীদের দশ জন প্রাণ হারাল, পঞ্চাশ জন আহত হল। চীনের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর এই ঔদ্ধত্যে। কিন্তু নিরুপায়। ইংরেজকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ঐ অঞ্চলে, সেখানে চীন সরকারের কোন এক্তিয়ার ছিল না। তবুও চীনা চেম্বার অব কমার্স পরদিন স্থির করল, বিদেশীদের যত কলকারখানা আছে সে-সবের কোন শ্রমিক যেন কাজ না করে, আর সাংঘাই শহরে তারা সাধারণ হরতাল ঘোষণা করল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বন্দুক আবার গর্জে উঠল। পরপর কয়েকদিন গুলি চলল জনতার ওপর। বহু লোক হতাহত হল কিন্তু

এতে জনতার মনোবল মোটেই ভাঙল না বরং মনোবল বৃদ্ধি পেল। চীনের অধিবাসীরা তাদের সংগঠনকে জোরদার করল।

আবার জুন মাসে বিপুল শক্তি নিয়ে ছাত্র-শ্রমিকরা সাংঘাইতে বিক্ষোভ শুরু করল, সেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল ক্যান্টনে। ক্যান্টনে ইংরেজ ও ফরাসীরা বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছে বহুকাল থেকে। তারা এই গণজাগরণকে দমন করতে গুলি চালাল। গুলিতে বাহান্ন জন নিহত হল, কয়েকশত লোক আহত হল কিন্তু জনতার মনোবল শিথিল হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। উপরন্তু তারা ধর্মঘটের ডাক দিল। এই ধর্মঘটের ফলে হংকং আর কোয়াংটুং-এর সব যোগাযোগ ছিন্ন হল।

এতকাল মাও কুয়োমিনটাং-এর সমর্থক ছিল। এই নরহত্যায় কুয়োমিনটাং-এর অসহায় অবস্থা ও বেদরদী মনোভাব তাকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। মাও এতদিনে বুঝল শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজন। নিজেই স্বীকার করল, "Formerly I had not fully realised the degree of class struggle among peasantry but after way 30 incident and during the great wave of political activity which followed it, the Hunanese peasant become very militant" -মাও বাড়ি ফিরে এসেই কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিল। অচিরেই তার মোহ ভঙ্গ হল, কুয়োমিনটাং-এর ওপর তার আস্থা নষ্ট হল। কিন্তু সাংঘাই ও ক্যান্টনের এই বিক্ষোভ জনমনে যে রাজনৈতিক চেতনা এনে দিয়েছিল তারই ঢেউ এসে লাগল চীনের কৃষক জীবনে। আর তারই ফলে বিশেষ করে হুনানের কৃষকরা জঙ্গী ভাবাপন্ন হয়ে উঠল মাওয়ের শিক্ষায় ও প্রেরণায়। মাও তারপরই বাড়ি ছেড়ে বের হল। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল, গ্রামের মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বেশ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে লাগল হুনানের পল্লী অঞ্চলে।

এই কাজে সব সময় সঙ্গী ছিল তার স্ত্রী কাই-হুই, স্বামী-স্ত্রী

অক্লান্তভাবে ঘুরতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কখনও আশ্রয় পেয়েছে, কখনও পায়নি। তবুও বিরাম নেই।

মাও কুয়োমিনটাংদের মিটিং-এ প্রকাশ্যে বলেছিল, চীনের মুক্তি আনতে হলে চীনের চাষীদের সংগঠিত করতে হবে। ভূমি সংস্কার বিনা বিপ্লব সাফল্যলাভ করতে পারে না।

মাও ফিরে এল ক্যান্টনে।

কৃষক আন্দোলনের কথাই বেশি করে চিন্তা করেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি কৃষক আন্দোলনের দিকে বিশেষ আগ্রহশীল নয় মনে করেই কুয়োমিনটাং-এর কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। মুখ্যত চিয়াং কাইশেকের কার্যাবলীকেই যেন বেশি সমর্থন করেছিল।

মাও কৃষক সমস্যাকে বড় করে দেখত। কুয়োমিনটাং-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস বসল ছাব্বিশ সালেরজানুয়ারীতে। মাও তার পরই কুয়োমিনটাং দলের প্রচার বিভাগে আত্মনিয়োগ করল। সেই সময় Peasant Movement Training Institute-এ হুনানের ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার মধ্যে তার সহোদর মাও সে-মিন এসেও যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারপরই আরম্ভ হল ঠাণ্ডা লড়াই। একদিকে সোভিয়েতে নির্দেশ, আরেক দিকে চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং আদর্শ আর সবার শেষে সংঘাত সুরু হয়েছে কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শের সঙ্গে।

মাও তার প্রচার ব্যবস্থায় বলল, যদি চীনের উন্নতি করতে হয় তা হলে অবনমিত চাষীর উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন—The centre of gravity of the Kuomintang is hidden among the countless masses of the exploited peasanty. মাওয়ের এই তথ্যকে মোটেই অস্বীকার করতে পারেনি কেউ-ই।

চব্বিশ সালে মাও প্রবন্ধ লিখল: কে আমাদের শত্রু আর কে আমাদের বন্ধু? যে শত্রু ও মিত্রকে চিনে নিতে পারেনা, সে কখনও বিপ্লবী হতে পারে না কিন্তু কাজটাও সহজ নয়। চিনে বের করব

বললেই চেনা যায় না। মিত্রের বেশধারী শত্রুরা আমাদের আশে-পাশেই থাকে সব সময়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে জনজাগরণের ঢেউ এসেছে আমাদের দেশে কিন্তু কোন ফললাভ হয়নি। আমরা যেন পিছিয়ে পড়েছি। কেন? আমরা শত্রুকে চিনতে পারিনি তাই আঘাত দিতেও পারিনি। জনতার নেতৃত্বে থাকবে বিপ্লবী দল। কোন সৈন্যবাহিনী বিজয় গৌরব লাভ করতে পারে না যদি তার নেতারা ভুল পথে চালিত করে। বিপ্লবী দলও যদি নির্ভুল পথে না যায় তা হলে তার সাফল্য আনতে পারে না। কুয়োমিনটাং প্রথম যে ম্যানিফেস্টো প্রচার করেছিল তাতে আমাদের শত্রু সম্বন্ধে কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা বিবৃত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের খুঁজে নিতে হল আমাদের দেখতে হবে চীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে, শ্রেণী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে হবে তারপর শ্রেণী মনোভাব বিচার করতে হবে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শক্তি কতটা তাও স্থির করতে হবে, অবশেষে দেখতে হবে বিপ্লব সম্বন্ধে তাদের কি মনোভাব।

পৃথিবীর সর্বদেশেই তিনটি শ্রেণী আছে। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। আরও ব্যাপক ভাবে শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা পাব বড় বুর্জোয়া, মধ্য শ্রেণীর বুর্জোয়া, ছোট বুর্জোয়া, অর্ধশোষিত ও পূর্ণমাত্রায় শোষিত শ্রেণী। গ্রাম্য জমিদাররা হল বড় বুর্জোয়া, বড় বড় জোতদারেরা মধ্য শ্রেণীর বুর্জোয়া, সম্পন্ন চাষীরা হল ছোট বুর্জোয়া, যাদের কিছু কিছু জমি আছে, কিছু ভাগে চাষ করে তারা অর্ধশোষিত আর ক্ষেত মজুররা হল শোষিত শ্রেণী। শহর জীবন হল আলাদা, শহরে মহাজন আছে, বড় ব্যবসায়ী আছে, বড় শিল্পপতি আছে—এরা হল বড় বুর্জোয়া, কুসীদজীবি, মাঝারি ব্যবসায়ী, ছোট ছোট কারখানার মালিক মধ্যশ্রেণীর বুর্জোয়া, মুদী, দক্ষ হস্তশিল্পী, চাকুরীজীবি হল ছোট বুর্জোয়া আর দোকান কর্মচারী, ফেরিওলা প্রভৃতি শ্রেণীর লোক অর্ধ শোষিত আর কারখানার কুলি-মজুর শ্রেণীর লোকেরা হল শোষিত শ্রেণী। এদের আর্থিক অবস্থা দিয়েই শ্রেণী চরিত্র তৈরী হয়।

এদের প্রত্যেক শ্রেণী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাদা মতবাদ পোষণ করে। বড় বুর্জোয়ারা বিপ্লব বিরোধী, মধ্য শ্রেণীর বুর্জোয়ারা আংশিকভাবে বিপ্লব সমর্থন করে, ছোট বুর্জোয়ারা বিপ্লব সম্বন্ধে আগ্রহশীল নয়, অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু শোষিত শ্রেণীই হল বিপ্লবের আসল শক্তি।

বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সমাজ অবস্থার অবসান এবং শোষিত জনসাধারণকে এক পতাকার তলে সংগঠিত করে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম। পৃথিবীতে নানা মতবাদ থাকতে পারে কিন্তু বিপ্লবের মূল কথা এই, এবং এর জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা পৃথিবীর সকল দেশেই এক। অতীতে বিপ্লব হয়েছে। সে সব বিপ্লব ঘটেছে একটি শ্রেণী বিশেষের মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে। বর্তমান যুগে বিপ্লবকে দেখা হচ্ছে অন্য দৃষ্টিতে। আজ বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে সমষ্টির স্বার্থে। তাই বিপ্লবের চিন্তা, কর্মপন্থা ও অগ্রগতি আজ যা দেখছি তা ছিল না অতীতে। পশ্চিমী শক্তিরা কায়েমী স্বার্থকে বজায় রেখে বিপ্লবীর ফাঁকা বুলি শোনায়, সে বুলি সমষ্টির সর্বনাশ করে।

মাও শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে লিখল : আমরা এবার শত্রু-মিত্রকে বেছে নিতে পারি অনায়াসে। যত যুদ্ধবাজ, আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকারী, জমিদার, বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতন্ত্রবাদী তারা হল দেশের শত্রু এবং আমাদের শত্রু। ছোট বুর্জোয়া, অর্ধশোষিত ও শোষিত জনসাধারণ হল আমাদের বন্ধু। সব চেয়ে বিপদ হল অস্থির চিত্তের মধ্যশ্রেণীর বুর্জোয়া, এদেরও আমরা শত্রু মনে করব। যদি কেউ কোন সময় এদের বন্ধু মনে করে তা হলে সে ভুল করবে, শ্রেণী চরিত্রে এরা সহজেই শত্রুতে পরিণত হবে। এদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল তারা আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও তাদের ওপর কোন ক্রমেই আস্থা রাখা উচিত হবে না। এদের সম্বন্ধেও সতর্ক থাকতে হবে।

মাওয়ের এই চিন্তাধারা মার্কস্ ও লেনিনের শিক্ষা প্রনোদিত কিন্তু কুয়োমিনটাংয়ের সঙ্গে তার সৌখ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন সময়েই সুচক্ষে

দেখেনি। তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে মাও নির্ভুল কিন্তু তার তথ্য ও তত্ত্বের সারবত্তা দল হিসাবে কুয়োমিনটাং কোন সময়ই সাদরে গ্রহণ করেনি। কুয়োমিনটাং-এর বৈপ্লবিক কোন চিন্তাধারা ছিল বলে মনে করার কোন কারণ ছিল না কোন সময়ই।

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব ছিল কুয়োমিনটাং-এর ওপর।

কিন্তু!

চিয়াং কাইশেক আরও ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। চীনকে সংযুক্ত করার যে বাসনা ছিল সান ইয়াত সেনের তাকে পরিপূর্ণ করতে হলে উত্তরের যুদ্ধবাজদের সঙ্গে কুয়োমিনটাং-এর যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু যুদ্ধে যে উপকরণ প্রয়োজন তা দিতে পারে সোভিয়েত। চিয়াং এই সুযোগে নিজের শক্তি বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছিল। তার সমাজতন্ত্রের ফাঁকা বুলিতে বিশ্বাস করে সোভিয়েত রাশিয়া সাহায্য করতে এগিয়ে এল। উত্তরকে দখল করার অভিশাপ আরম্ভ করল চিয়াং কাইশেক। তার সঙ্গে আরও অনেক ঘটনা ঘটল দক্ষিণ চীনে।

রাশিয়া মানচুরিয়ার জাপান প্রভাবান্বিত সরকারকে স্বীকার করে নিল। উত্তরের সরকারের সঙ্গে মোটামুটি একটা আঁতাতও করল। চিয়াং কাইশেক স্টালিনের এই কাজকে সমর্থন করতে পারল না, এমন কি তার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন মনে করল। বর্তমান অবস্থায় চিয়াং কাইশেক সান ইয়াত সেনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে অগ্রসর হল। চিয়া যুদ্ধে নেমে পড়ল। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীতে যে সব কম্যুনিষ্ট ছিল তাদের গ্রেপ্তার করল। উত্তরে অভিযান আরম্ভ করার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল। চিয়াং বলল, এটা সোভিয়েতকে স্বমতে আনার জন্য করতে হয়েছে। কিন্তু মাও এতে সমর্থন জানাতে পারল না। উত্তরে অভিযান শুরু করার আগে কৃষকদের সম্বন্ধে কুয়োমিনটাং-এর সভায় বলল, কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করলে চীনের এই উত্তর অভিযান সাফল্যলাভ করবে।

কিন্তু সোভিয়েত থেকে যে সব উপদেষ্টা এসেছিল চিয়াং তাদের

নজরবন্দী করে অবস্থাটা আরও ঘোরালো করে তুলেছিল। অবশেষে চিয়াং সোভিয়েতের সঙ্গে মীমাংসায় রাজি হল। সোভিয়েত থেকে যে সব উপদেষ্টা এসেছিল তাদের দু' তিন জন বাদে সবাইকে ছেড়ে দিতে রাজি হল। কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির লোকদের উচ্চপদ থেকে সরিয়ে দিল চিয়াং। কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তার মনে অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল তার প্রতিফলন হল নানা ভাবে। সংগঠন বিভাগের ডিরেকটার তান পিং-শানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল, কৃষি বিভাগের ডিরেকটার লিন সু-হানও কর্মচ্যুত হল, মাওকেও ছাড়তে হল প্রচার বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষের পদ।

চিয়াং সোভিয়েতকে অনুরোধ করল তাদের কয়েকজন উপদেষ্টাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের গ্রাস করাই ছিল চিয়াং-এর উদ্দেশ্য এবং ধীরে ধীরে সে কাজ সম্পূর্ণ করতে থাকে চিয়াং।

মাও তবুও কৃষক আন্দোলন পরিচালনার শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে কাজ করছিল।

কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা মাওয়ের এই কাজকে সুচক্ষে দেখেনি। মাও বলল, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি এই কাজ করে চলেছি।

বন্ধুরা বলল, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ চিয়াং ধীরে ধীরে কম্যুনিষ্ট বিতাড়ণে নেমেছে।

তাও দেখছি। চিয়াং কম্যুনিষ্ট বিতাড়ণ করছে ব্যক্তিগত কারণে। তাকে গদীচ্যুত করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে বলে চিয়াং-এর বিশ্বাস জন্মেছে এবং তার মনে হয়েছে এই কাজে সোভিয়েত উপদেষ্টারা বিশেষভাবে জড়িত।

আমাদের বিশ্বাস চিয়াং রাজনৈতিক কারণে সোভিয়েতের সঙ্গে কোন্দল করছে।

সেটাও আংশিক সত্য। তবে ব্যক্তিগত কারণটাই বড়। সোভিয়েত মানেই কম্যুনিষ্ট তাই আমাদের সরিয়ে দিচ্ছে উচ্চপদ থেকে।

তা জেনেও তুমি চিয়াং-এর কুয়োমিনটাংকে সাহায্য করছ কেন?

আমার বিশ্বাস কৃষক সংগঠন জোরদার করতে না পারলে বিপ্লব আসবে না। কুয়োমিনটাং দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে আছে। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে আমরা যত সহজে কৃষকদের সংগঠন গড়ে তুলব অন্য কোনভাবেই তা সম্ভব নয়। বিশেষ করে চিয়াং বর্তমানে সামরিক শক্তিকে বেশি মূল্যবান মনে করছে, অগণিত মানুষ যে কৃষক তাদের কোন শক্তি থাকতে পারে তা বিশ্বাস করে না। আমি যদি কৃষক আন্দোলনকে ওদের হাতে তুলে দেই তা হলে আমাদের ক্ষতি হবে, লাভবান হবে কুয়োমিনটাং। আগামী দিনে দেখতে পাবে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে কুয়োমিনটাং বহু দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং চিয়াং অথবা কুয়োমিনটাং আমার পরিচালিত আন্দোলন থেকে সামান্য সুযোগও পায়নি।

সেদিন অনেকেই মাওয়ের এই তথ্যকে বিশ্বাস করেনি কিন্তু সাতাশ সালে যখন চিয়াং-এর সঙ্গে মাওয়ের বিচ্ছেদ ঘটল তখন মাওয়ের হাতে তৈরী এই কৃষক সংগঠনই সর্বপ্রথম হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল শোষণকে রোধ করতে।

চিয়াংও বুঝেছিল যে কৃষক-শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন বিপ্লবকে সফল করতে। সেই ধনীর দুলাল পেং-পাই উত্তর অভিযানে কৃষক শক্তির সাহায্য এনে দিয়েছিল তার জন্য চিয়াং প্রশংসাও করেছে। চিয়াং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, The armed workers and peasants play a more important role in the revolution than army—এই সত্যকে স্বীকার করেও চিয়াং কৃষক সংগঠনে জোর দিতে পারেনি কারণ কুয়োমিনটাং-এর যে সব কৃষক সংগঠক ছিল তাদের শ্রেণী চরিত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিপন্থী।

লিউ শাও-চি মাঝে মাঝেই মাওকে মনে করিয়ে দিত কম্যুনিষ্ট পার্টির একটা কৃষক আন্দোলন পরিচালনার বিভাগ প্রয়োজন। মাও স্বীকার করত।

কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

দেখছি কিন্তু কাজ গোছানো এখনও শেষ হয়নি।

আমরা স্থির করেছি আমাদের কেউ-ই কম্যুনিষ্ট পার্টি অথবা কুয়োমিনটাং এই দুই দলের সভ্য থাকতে পারবে না এক সঙ্গে।

অবশ্যই তা উচিত নয়।

আমাদের আলাদা কৃষি আন্দোলন বিভাগ থাকা দরকার এবং তার প্রধানরূপে তোমাকে কাজ করতে হবে।

মাও বলল, আমিও চাই আমাদের আলাদা কৃষক আন্দোলন বিভাগ থাকা দরকার। যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর আমি তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করব।

আমরা চাই কুয়োমিনটাং থেকে ক্রমেই সরে এসে নিজেদের সংগঠনকে জোরদার করতে।

মাও সম্মতি জানাল। তখনই নতুন কৃষক বিভাগ খোলা হল এবং তার দায়িত্ব নিল মাও।

এদিকে চিয়াং তার উত্তর অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। এর পরই চিয়াং-এর ক্ষমতা হল অপ্রতিহত। চিয়াংও বিপ্লবের কথা শোনাল জনসাধারণকে, জোর দিয়ে বলল, আমাদের মুক্তি আসবে সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করলে আর সাম্রাজ্যবাদ নির্মূল করতে হলে রাশিয়ার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এর অর্থ কম্যুনিজম প্রচার নয়, আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করা।

চিয়াং যে বক্তব্য রাখল জনসাধারণের সামনে তারপর কম্যুনিষ্টদের বলার কিছু রইলনা। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি যে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করেছিল তাকে রাশিয়া স্বীকার করল না এবং চিয়াং কাইশেকের কৃষক আন্দোলনকে স্বীকার করল।

বাধ্য হয়ে মাওকে কুয়োমিনটাং-এর আওতায় থেকেই কৃষক আন্দোলনের কাজ করে যেতে হয়েছিল।

চিয়াং বলল, রাশিয়া আমাদের যে সাহায্য করছে তার জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাশিয়া আমাদের দেশে কম্যুনিজম প্রচার করতে চায় না। আমাদের জাতীয় বিপ্লবকেই সাহায্য করতে চায়। যদি তা সাফল্যমণ্ডিত হয় তা হলে সাম্রাজ্যবাদ নিপাত হবে।

রাশিয়া যে কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানায়নি তা থেকে চিয়াং-এর বক্তব্য সত্য বলেই সবাই বিশ্বাস করল। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি রাশিয়ার সাহায্যলাভের আশাও পরিত্যাগ করল।

মাওয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছল কিয়াংশু আর চেকিয়াং প্রদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা আর জমিদারদের নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা।

জাপান থেকে লেখাপড়া শিখে দেশে ফিরে এল চৌ সুই-পিং।

দেশে ফিরেই তার দৃষ্টি পড়ল কৃষকদের ওপর। তাদের ডেকে বলল, শত শত বৎসর ধরে তোমরা অত্যাচারিত হচ্ছ এই সব জমিদারদের হাতে। তোমরা কোন ব্যবস্থাই তো করতে পারনি। কেন?

চাষী ক্ষেতমজুর ওয়েপুই বলল, আমাদের কি ক্ষমতা আছে। আমরা জমিদারদের ক্রীতদাস হয়েই আছি পুরুষানুক্রমে।

সুই-পিং বলল, এ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছ কখনও?

বাবা! চেষ্টা করলে ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। আমি যদি এগিয়ে যাই আমার সঙ্গে কেউ যাবে না। ফলে প্রাণ যাবে আমার।

সবাই একজোট হয়েও তো কাজ করতে পার।

তা সম্ভব নয় কর্তা। আমরা এই চাষী ক্ষেতমজুররা একজোট হতে পারি না। তা হতে পারলে তো অনেক কাজই করতে পারতাম। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রাণের ভয়ে কেউ এক কদমও এগোতে চায় না।

স্বাবলম্বী হওয়াই হল ঐক্যবদ্ধ হবার প্রথম সূত্র। আমরা যদি ক্ষেতমজুরদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারি তা হলেই জমিদারদের অত্যাচার থেকে সবাইকে বাঁচাতে পারি। তুমি একটা কাজ করতে পার ওয়েপুই ?

কি কাজ ?

এই গ্রামের আর পাশের গ্রামের কিছু ক্ষেতমজুরকে ডেকে আনতে পার আমার কাছে। আমি একবার তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে চাই। আমি মনে করেছি চাষীদের যদি স্বাবলম্বী করতে কোন সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারা যায় তা হলে নিশ্চয়ই জমিদারদের কিছুটা শায়েস্তা করতে পারব।

সমবায় গড়ে কি হবে ?

মনে কর একজনের বীজ নেই, সমবায় থেকে বীজ দিয়ে তাকে সাহায্য করা হবে। কারও জমিতে সেচ দিতে হবে, সবাই মিলে সেচ দিলে পয়সা ব্যয়ও হবে না অথচ কাজটা তাড়াতাড়ি ও ভাল ভাবে হবে। এই সব কাজ যদি করতে পার তোমরা তাহলে সুদখোর মহাজনদের কাছেও যেতে হবে না, আবার জমিদারের দরজায় ভিক্ষাপাত্র নিয়েও যেতে হবে না।

কথাটা মন্দ বলনি কর্তা। দেখি কয়েক জনকে ডেকে আনা যায় কি না।

ওয়েপুই গ্রামে গ্রামে ঘুরে একদিন কিছু লোক নিয়ে হাজির হল সুই-পিং-এর বাড়িতে। ছোট জনসমাবেশে সুই-পিং বুঝিয়ে বলল, সমবায়ের উদ্দেশ্য আর এতে কে লাভবান হবে তাও বুঝিয়ে দিল। সেই দিনই চাষীরা নতুন প্রতিষ্ঠান Tenant Farmars' Co-operative Self-helps Society-র বনিয়াদ স্থাপন করল। সুই-পিং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়ায়। জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলে কেন সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। দেখতে দেখতে Society-র সদস্য সংখ্যা বাড়ল, সমর্থকও এল কয়েক হাজার। সুই-পিং-এর বাণী

নিকটবর্তী প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। সে সব প্রদেশের চাষীরাও সংঘবদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু সংঘবদ্ধ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি এমন সময় আঘাত হানল জমিদাররা। তারাও সংঘবদ্ধ হল চাষীদের শায়েস্তা করতে।

চাষীরা দাবী জানাল খাজনা কমাবার।

জমিদাররা তাদের দাবীতে কোন ভ্রূক্ষেপও করল না। তারা সচেষ্ট হল চাষীদের কি করে জব্দ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সান চুয়ান-ফেং। তার কাছে আবেদন আসতে থাকে জমিদারদের। সান চুয়ান-ফেং জমিদারদের বশম্বদ ব্যক্তি। জমিদারদের নির্দেশে society বেআইনী বলে ঘোষণা করল, society-র নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আদেশ দিল।

সুই-পিংকে বন্দী করে আনা হল সান চুয়ান-ফেং-এর কাছে। বিনা বিচারে তাকে ফাঁসি দিল সান।

জমিদাররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সুই-পিং-এর মৃত্যুই যে তাদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখবে এই ধারণা ছিল জমিদারদের কিন্তু দেখা গেল যেদিন সুই-পিং-এর মৃতদেহ কবর দিতে আনা হল তার বাড়িতে সেদিন হাজার হাজার চাষী সমবেত হয়েছে তার বাড়িতে। তারা একবাক্যে শপথ নিল, চৌ সুই-পিং আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, এর শোধ নিতেই হবে। (Mr. Chou died for us, we will avenge his death)

সে বছর ছিল দুর্বৎসর। খরায় পুড়ে গেল জমির ফসল। চাষীদের দুর্দশার অন্ত নেই। তারা আবার সংঘবদ্ধ হল। তারা খাজনা মকুবের জন্য আবার আন্দোলনে নামল। জমিদাররা মনে করেছিল সুই-পিং-কে হত্যা করলেই সব হাঙ্গামা মিটবে কিন্তু দেখা গেল এবারের আন্দোলন গতবারের চেয়ে বেশি জোরদার হয়েছে। আজ চাষীরা মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তারা বুঝতে পেরেছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই জমিদারের লোভ ও নিষ্ঠুরতাকে দমন করতে পারে।

এই আন্দোলনের সংবাদ যথাসময়ে মাওয়ের কর্ণগোচর হল।

আরও একটি কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা শুনতে পেল মাও। চেকিয়াং প্রদেশের ৎক্সু-সি গ্রামে ঘটেছিল এই ঘটনা। সেখানকার চাষীরা কিছুকাল থেকে পুলিশ আর জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিল। গ্রামের চাষীরা অন্য চাষীদের চেয়ে বেশি বেপরোয়া, কিছুটা জঙ্গী মনোভাবাপন্ন।

আকাশ বড়ই অকরুণ।

বৃষ্টি নেই।

ক্ষেতের ফসল পুড়ে গেছে রোদের তাপে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে। সবাই আতঙ্কিত।

একদিন প্রায় দু হাজার চাষী সমবেত হল পুলিশ থানার সামনে। তারা জানাতে এসেছে দুর্ভিক্ষ তাদের সামনে, সাহায্য তাদের প্রয়োজন। খাজনা তারা দিতে পারবে না। কিন্তু তাদের কথা শোনার লোক নেই সেখানে। সবাই জমিদারদেব অনুগত। পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে প্রথমে কথা কাটাকাটি, শেষে মারামারি আরম্ভ হল।

জনতা থানা জ্বালিয়ে দিল। অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে ছুটে গেল জমিদারদের প্রাসাদে। তারা প্রাসাদ আক্রমণ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল অস্থায়ী সম্পত্তি। জমিদাররা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল সপরিবারে। কাউকে না পেয়ে জমিদার বাড়ির মূল্যবান যা কিছু পেল সব নষ্ট করে দিল চাষীরা।

সেই দিন থেকে চাষীরা জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের বাড়ি পর পর আক্রমণ করতে থাকে। তাদের সম্পত্তি নষ্ট করা হল তাদের নিত্যকার কাজ।

এই অবস্থা বেশি দিন চলেনি।

জমিদাররা শহরে ছুটে গেল সরকারী সাহায্য পেতে। পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হল গ্রামে। আইনশৃঙ্খলা ও অপরাধ দমনের অজুহাতে সৈন্যবাহিনী আর পুলিশ আরম্ভ করল নির্দয় অত্যাচার। গ্রেপ্তার করতে লাগল নিরীহ লোকদের। যারা নেতা

তারা ইতিমধ্যেই গা-ঢাকা দিয়েছে। অসহায় চাষীরা উৎপীড়ন সহ্য করল। আন্দোলন দমিত হল দু একদিনের মধ্যেই।

বলতে গেলে কৃষক বিদ্রোহ নিষ্ফল হল।

মাও হিসেব করে দেখল, এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ। প্রথম কারণ সংগঠনকে মোটেই জোরদার না করে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। এর পেছনে কোন রাজনৈতিকবোধ ছিল না, আর না থাকার কারণ নেতৃত্বের অভাব। তাই আন্দোলন আরম্ভ হওয়া মাত্র থেমে গেল সৈন্য আর পুলিশের অভিযানে। রাজনৈতিক চেতনা যদি না থাকে তবে প্রত্যেক সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন এইভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সাময়িক উত্তেজনায় যা ঘটে তা বিপ্লব নয়, অবশ্য এতে জনতার মনোবল বৃদ্ধি পায়। এটা উপেক্ষা করার মত নয়।

সাতাশ্ সাল।

কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্ট বিরোধ বেশ জোরালো। যে কোন সময় এই বিরোধ ব্যাপক হতে পারে। কুয়োমিনটাং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সে জন্য তাদের পক্ষে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সহজ। তাই কম্যুনিষ্টদের কার্যাবলী নিয়ে তারা যতটা বেশি চিন্তা করত তার চেয়ে বেশি উপেক্ষা করত। তারা সর্বতোভাবে কম্যুনিষ্টদের হটিয়ে দিতে সচেষ্ট। তাও বেশ ধারাবাহিক ভাবে করে চলেছিল।

ইতিমধ্যে কৃষক সমাজে বেশ স্থান গড়ে তুলেছিল কম্যুনিষ্টরা।

কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার পর তাদের লক্ষ্য হবে স্থানীয় শোষণকারী দালালরা, অভিজাত সম্প্রদায় এবং যে সব জমিদার বে-আইনী কাজ করে তারা। কুসংস্কার সম্পন্ন সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই হল তাদের কাজ, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি সম্পন্ন সরকারী কর্মচারী এবং গ্রাম্য এলাকায় যে সব অনিষ্টকর প্রথা আছে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করাও তাদের কাজ। কৃষকদের এই শক্তির বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াবে তারা নিশ্চিত ধ্বংস হবে, যারা বাঁচতে চাইবে তারা এই কাজে সহায়তা করবে।

মাও সতর্ক করে দিল কৃষক সমিতিদের। তারা যেন নীচমনা অভিজাতদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকে। এই সব দুর্জন আসবে, বলবে, আমরা তোমাদের সমিতিকে দশ ডলার চাঁদা দেব। আমাদের সভ্য করে নাও।

কৃষকরা যেন সে টাকা না নেয়। তারা বলবে, 'Who wants your filthy money ?' কে চায় তোমার নোংরা টাকা ? –তোমার টাকা নেওয়ার অর্থ তোমার কাছে আত্মবিক্রয় করা। তোমার টাকা পাপ। এই পাপকে প্রবেশ করতে দেব না আমাদের এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানে।

আগে যারা কৃষক আন্দোলনকে বাধা দিয়েছে সেই সব মাঝারি ধরণের জমিদার, ছোট জমিদার, সম্পন্ন চাষী এমন কি মধ্যবিত্ত চাষীরা কৃষক সমিতিতে স্থান করে নিতে চেষ্টা করবে। তাদের যেন কোন ক্রমেই স্থান দেওয়া না হয়। এই ভাবেই যাদের একদিন ডাকাত, ছোটলোক বলে উঁচুতলার মানুষরা ঘৃণা করেছে তারাই অবশেষে সম্মানীয় ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সভায় গুরুতর আলোচনা হল।

মাও বলল, কুয়োমিনটাংকে স্টালিন ও ট্রটস্কি মনে করছে কৃষকদের প্রতিনিধি।

লিউ শাও-চি প্রত্যুত্তরে বলল, যেহেতু তারা কৃষকদের প্রতিনিধি বলে নিজেদের প্রমাণ করতে জোর প্রচার ব্যবস্থা রেখেছে।

আমরা জানি যারা কৃষক দরদী সেজে বিপ্লবের কথা বলছে তারা হল একদল যুদ্ধবাজ। এরা এসেছে বড় বড় জমিদার শ্রেণী থেকে, অথবা এরা এমন সব মান্দারিণ পরিবারের লোক যাদের সঙ্গে জমিদারদের যোগসূত্র বংশ পরম্পরায়।

আমরা যাতে কৃষক আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাই তার জন্য স্টালিন বিশেষ সচেষ্ট।

স্টালিন চিয়াং কাইশেকের তথাকথিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর ওপর বেশি আস্থা রেখে আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

স্টালিন যেন কুয়োমিনটাং সম্বন্ধে আশাবাদী। স্টালিন চীনের প্রকৃত অবস্থা জানে না, অথবা তাকে জানতে দেওয়া হয়নি। বাস্তব দিক বিচার না করে স্টালিন যে মত পোষণ করছে তা দুঃখজনক।

মাও বলল, ধাঁধা সৃষ্টি করেছে কুয়োমিনটাং। চিয়াং যাদের ওপর নির্ভরশীল তাদের সবাই হল কায়েমী স্বার্থের বাহক যুদ্ধবাজ জমিদার শ্রেণীর লোক। এই রকম ভুল রাশিয়া তার বিপ্লবকালেও করেছিল।

কাই-হুই বলল, বর্তমানে কুয়োমিনটাং-এর সাহায্য বিনা আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা তাও কিন্তু তোমাদের ভেবে দেখতে হবে।

লিউ শাও-চি গম্ভীর ভাবে বলল, মিসেস মাও যা বলতে চাইছে তাতে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বর্তমানে আমরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছি। আমাদের হাজার হাজার সমর্থনকারী রয়েছে চীন দেশে। তাদের ভাগ্য যুদ্ধবাজ জমিদারদের হাতে তুলে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হবেনা।

কমরেড লি যা বলছে তা ঠিক। কিন্তু আমাদের স্থান গড়ে নিতে হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সাময়িক বুঝাপড়া করা উচিত মনে করি।

না, বলল মাও।

কেন ?

আমরা সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিয়ে দেখেছি চিয়াং আমাদের কবরে পাঠাবার চক্রান্ত করেছে। রাশিয়ার সমর্থন পেয়েছে চিয়াং, কেননা চিয়াং রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী। সোভিয়েত যে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছে তা পরাজিত হতে বাধ্য। চিয়াং উত্তরে তার প্রাধান্য স্থাপন করেছে, দক্ষিণের সবটাই তার দখলে এমন সময় চিয়াংকে সমর্থনের অর্থ সমাজবাদী আন্দোলনকে পিছিয়ে দেওয়া।

লি বলল, তোমরা লক্ষ্য করছ কুয়োমিনটাং-এ দুটো দল দেখা দিয়েছে। একদল বামপন্থী অপর দল দক্ষিণপন্থী। চিয়াং ব্যক্তিগত ভাবে দক্ষিণপন্থী। এদের মধ্যে বেশ ফাটল দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করছি শীঘ্রই সোভিয়েত উপদেষ্টাদের সঙ্গে চিয়াং-এর মতবিরোধ দেখা দেবে। কারণ, চিয়াং দক্ষিণপন্থীর সমর্থক।

সাতাশ সালের মার্চ মাসে ঝগড়াটা ভালভাবে প্রকাশ পেল।

কুয়োমিনটাং-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হল, দলের আনুগত্য মেনে চলতে হবে চিয়াংকে। সরকার ও সামরিক বাহিনী চিয়াং-এর হাতে থাকায় দলের মতামত চিয়াং গ্রাহ্য করতনা। সেজন্য কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করল ফ্রান্সে নির্বাসিত ওয়াং চেং-উইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর তার হাতে তুলে দিতে হবে দলকে ও সরকারকে। যতদিন ওয়াং ফিরে না আসে ততদিন তান ইয়েন-কাই থাকবে সব বিষয়ে প্রধান। এ-বাদেও এই সভায় স্থির হল কম্যুনিষ্টদেরও সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করতে বলা হবে। নতুন পাঁচজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে আর তাদের দুজন হবে কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্ট দলের তান পিং-সানকে দেওয়া হবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আর স্যু চাও-চেং হবে শ্রমমন্ত্রী।

এই সভায় মাও সে-তুংও উপস্থিত ছিল। মাও এই আলোচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। যে সব অসৎ জমিদার ও অভিজাত মান্দারিণরা প্রতিবিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছিল তা মাও সমর্থন করেছিল। মাও বলেছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সব প্রতিবিপ্লবীদের দমন করা যাবে না। এদের জন্য মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত। এদের বিপ্লবী কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার জন্য। ভূমি সংস্কারের কথাও আলোচনা হয়েছিল এই সভায়।

বামপন্থী কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি হাতে হাত মিলিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করলেও চিয়াং চুপ করে বসেছিল না, বামপন্থী কুয়োমিনটাং যদিও নানাভাবে দেশের উন্নতিতে সচেষ্ট ছিল তবুও

সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা স্টালিন বার বার চিয়াং কাইশেককেই সমর্থন জানাতে নির্দেশ দিয়ে আসছিল কম্যুনিষ্ট পার্টিকে। সোভিয়েত উপদেষ্টা বরোদিনও সোভিয়েত সরকারকে চিয়াং সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্বেও সোভিয়েত নেতারা যে কোন কারণেই হোক চিয়াংকেই সমর্থন জানাচ্ছিল।

বামপন্থী কুয়োমিনটাং এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি স্থির করল, যাদের তিরিশ মউ-এর বেশি জমি আছে তারা প্রতিবিপ্লবী বলে গণ্য হবে এমন কি মাওয়ের বাবাও এই প্রতিবিপ্লবীদের তালিকায় স্থান পেল।

কোন রকমেই চিয়াং এগুলো কার্যকরী হতে দিল না।

সাতাশ সালের এপ্রিলে সাংঘাইতে যে শ্রমিক ধর্মঘট হল তাতেই হল কম্যুনিষ্ট পার্টির অগ্নিপরীক্ষা। সকল সমস্যার সমাধান করতে চিয়াং তার সৈন্য আর পুলিশকে নিযুক্ত করল নরহত্যায়। সাংঘাইয়ের, পথ ঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ হল, রক্তের স্রোত বয়ে গেল সাংঘাইয়ের পথে পথে।

চিয়াং-এর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট মিতালির যবনিকা নামল এই দিনের ঘটনায়। যে ভাবে কম্যুনিষ্ট নিধনে মেতে উঠেছিল চিয়াং তাতে আর কিছু হোক না হোক কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজের পথ খুঁজে পেয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টি সেদিন উপলব্ধি করেছিল, "Proletarian leadership is the sole key to the victory of the revolution."—সর্বহারাকে দিতে হবে নেতৃত্ব তবেই হবে বিপ্লবের জয়।

মাও বলল, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোল, সেই সঙ্গে গ্রাম এলাকায় শ্রেণী সংগ্রামকে জোরদার কর, ছোট ছোট এলাকায় সোভিয়েত গঠন কর আর গড়ে তোল রেড আর্মি, তাদের কলেবর বৃদ্ধি কর। এ কাজ করতে পারলে শহর ও গ্রামে বিপ্লব সম্ভব হবে। শুধু কৃষকদের নিয়ে বিপ্লব হবে না, শ্রমিকদের বাদ দিলে চলবে না। তুইটি দিককে জোরদার করে তুলতেই হবে—It is a very great mistake to abandon struggle in the Cities and to sink into peasant guerillaism,

আবার কৃষকদের শক্তিবৃদ্ধি হলে ভীত হবার কোন কারণ নেই—কৃষক অথবা শ্রমিক যে কেউ নেতৃত্ব দিতে পারে। তা না দিলে চীনের মত দেশের মুক্তি সম্ভব নয়। উভয় দিককেই বলশালী করতে হবে। কার কতটা বল তার বিচার করার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র সংগঠনকে জোরদার করাই হল কাজ।

চিয়াং ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করল সাংঘাইতে। তারই দুই সপ্তাহ পরে কম্যুনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে স্থির হল, প্রতিবিপ্লবীদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। যে সব জমিদার বিপ্লবকে সাহায্য করবে তাদের জমিও বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আর এই বাজেয়াপ্ত করতে হবে অতি শীঘ্র। এই কংগ্রেস অধিবেশনে মাও তার বক্তব্য রাখার অবসর পায়নি। কিন্তু প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে ইতস্তত করেনি।

ঘাতক মোটেই নীরব নয়। কম্যুনিষ্টদের আর সহ্য করতে পারছিল না। এর ফলাফল সহ্য করল চ্যাংসার কম্যুনিষ্টরা। জেনারেল হো-র আদেশে কর্নেল সু কে-সিয়াং চ্যাংসা বাহিনীতে যে সব কম্যুনিষ্ট ছিল তাদের মেসিনগানের গুলিতে হত্যা করল, নেতৃস্থানীয় সকল কম্যুনিষ্টকে গ্রেপ্তার করে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করল।

এই দুর্দিনে কম্যুনিষ্ট পার্টি সংবাদ সংগ্রহের জন্য চারজনকে চ্যাংসায় পাঠান স্থির করল। কর্নেল সু কে-সিয়াং সংবাদ পেয়েই আদেশ দিল, চেন কুং-পো ভিন্ন অন্য কেউ চ্যাংসায় প্রবেশ করলে তাকে হত্যা করা হবে। দলের তিনজনকে আর যেতে দেওয়া হল না সংবাদ সংগ্রহে।

কম্যুনিষ্ট আর কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে যে অশান্তি দেখা দিল তা আর মিটল না।

কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হল।

সেই মিটিং-এ স্থির হল মাও হুনানের কৃষকদের সংগঠন করে সশস্ত্র

বিপ্লব সুরু করবে।. মাও এরই অপেক্ষা করছিল। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে মাও তার সংগঠিত বাহিনী নিয়ে ফসল তোলার সময় আক্রমণ করল জমিদারদের তথা সরকারী প্রশাসন কেন্দ্র। কিন্তু মাওয়ের এই প্রথম চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তার সকল চেষ্টা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী নিস্ফল করে দিল। মাও এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী যে সব সহকর্মী জীবিত ছিল তাদের নিয়ে গোরিলা বাহিনী গড়ে তুলল। এই বাহিনী নিয়ে চিংকাংসানে প্রবেশ করল। ফসল কাটার সময় এই যে প্রথম অভ্যুত্থান, এর অসাফল্য মোটেই কালে বপ্লবিক ভবিষ্যৎ কর্মধারায় কোন ছায়াপাত করতে পারল না। পরবর্তী অভ্যুত্থান যে বৃহৎ রূপ ধারণ করে এটা তারই প্রাথমিক অবস্থা।

অপর দিকে লি লি-সান, তান পিং-সান, ও চু চিউ-পাই কেন্দ্রীয় কমিটির কিউকিয়াং অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করল নানচাং-এ যে সামরিক বাহিনী আছে তাদের বিদ্রোহ ঘটাতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন লাভ করল। বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর এই ভাবে ক্রমেই প্রসার লাভ করতে থাকে।

নানচাং অভ্যুত্থান সত্যই বৈপ্লবিক ছিল কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ।

সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ ইয়ে তিং ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক, আর অপর অধ্যক্ষ হো লিং ছিল বাম কুয়োমিনটাং-এর সমর্থক। তাই অভ্যুত্থান সহজেই ঘটেছিল। কিন্তু অভ্যুত্থান ঘটবার আগে মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

চ্যাঙ কুয়ো-টাও এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধেই ছিল।

চৌ এন-লাই অভ্যুত্থানকে জোর সমর্থন জানিয়ে বলল, যদি এই অভ্যুত্থান না ঘটানো হয় তা হলে আমি ফ্রন্ট কমিটির সম্পাদক পদে ইস্তফা দেব।

চ্যাঙ কুয়ো-টাও বার বার বলল, এখনও অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। এখনও আমরা প্রস্তুত নই। এতে অসাফল্য নিশ্চিত।

চৌ এন-লাই ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট নেতারা চ্যাঙ কুয়ো-টাওয়ের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। তারা বার বার বলতে থাকে, এই অভ্যুত্থান আমাদের বিপ্লবকে সার্থক করবে।

চ্যাঙ কুয়ো-টাও বলল, কমরেড স্টালিন খবর পাঠিয়েছে, "If the project had no chance of success, it would all right to abandon it—সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত।

আমরা স্টালিনের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। স্টালিন এতকাল চিয়াং কাইশেককে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছে, আর আমরা সেই পরামর্শ শুনে ভ্রান্ত পথে চলেছি। আমাদের আস্থা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে।

এটা ঠিক পথ নয় বন্ধু। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা স্টালিন আমাদের ভ্রান্ত পরামর্শ দিতে পারে না।

কিন্তু রাশিয়া আর চীনের সামাজিক অবস্থা এক নয়, রাজনৈতিক অবস্থাও এক নয়। সেজন্য চীন সম্বন্ধে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু ভুল হবে বন্ধু।

আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের সমষ্টিগত মত আমরা অভ্যুত্থান ঘটাব।

চ্যাঙ নিরুপায়ের মত বলল, তাও যদি কর তা হলে দু চার দিন বিলম্ব করে করাই ভাল মনে করি।

আগষ্ট মাসের পয়লা তারিখে দিন ঠিক করল।

নানচাঙের বিদ্রোহী বাহিনী চৌঠা ও পাঁচ তারিখে কোয়াংটুং-এ প্রবেশ করল কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না করে, ভূমি সংস্কারের কোন চেষ্টা না করে তারা এগিয়ে চলল। জনসাধারণ রয়ে গেল উপেক্ষিত। স্বাওটাও দখল করল নানচাঙ বাহিনী। শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের নামে সেপটেম্বর মাসে ত্রাস সৃষ্টি করল অধিকৃত এলাকায়। কঠি বুর্জোয়াদের মত শান্তি শৃঙ্খলা ও আইন রক্ষার নামে

যে অত্যাচার শুরু করল তাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি হল। লোকে বলতে লাগল, These are the troops of another Chiang kai-shek "—এ যেন অপর একটি চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনী। লোকে মোটেই গ্রহণ করতে পারল না এই বাহিনীর কার্যকলাপ।

প্রতিবাদ জানাল জনসাধারণ।

মাও যে হুনানে কৃষকদের নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল, তাতেও কোন স্থায়ী ফল হয়নি, নানচাঙ্ বাহিনীর বিদ্রোহেও কোন স্থায়ী ফল হয় নি। তবে এই সশস্ত্র বিদ্রোহ পরবর্তী কালে কম্যুনিষ্ট পার্টির বৈপ্লবিক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কম্যুনিষ্ট কর্মীদের মনোবল সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

এই ঘটনার সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি জরুরী সভা বসল। সেই সভায় মাও সে-তুংকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সভায় মুখ্যত মসকোর ভূমিকাকে সমর্থন না করে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নিজস্ব কার্যধারায় জোর দেওয়া হল। এই সভায় স্থির হল বড় বড় জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

মাও ফিরে এল হুনানে তার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিতে।

হুনানের অভ্যুত্থানের সকল দায়িত্ব রইল মাওয়ের ওপর।

মাও সোভিয়েত গঠনে আগ্রহী। তার এই কাজে পুরোপুরি সমর্থন জানায়নি কেন্দ্রীয় কমিটি। কিন্তু মাও হুনান যাবার পর সংবাদ পেল সোভিয়েত গঠনে কম্যুনিষ্ট ইন্টার ন্যাশানালের সমর্থন আছে। এই সংবাদে প্রীত হল মাও, শ্রমিক, কৃষক, সৈন্যের সোভিয়েত গঠনে ক্রমেই তৎপর হয়ে উঠল।

মাও কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থন লাভের জন্য চিঠি লিখল, "আমাকে সোভিয়েত গঠনের অনুমতি দাও"। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি মাওকে জানিয়ে দিল, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে চলাই মাওয়ের কর্তব্য, অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মাওয়ের বামপন্থী মনোভাবকে তারা নিন্দা করেই উত্তর দিল।

অবশেষে আগষ্ট মাসে হুনান ও হুপেইতে অভ্যুত্থান যাতে ঘটে তার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি মাওকে নির্দেশ দিল। শক্তি প্রয়োগ করেই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশ পেল মাও।

মাও চারটি সৈন্যদলের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল।

বামপন্থী কুয়োমিনটাং-এর প্রাধান্য ছিল য়ুহানে। এদের যে সৈন্যবাহিনী ছিল তার অধিকাংশই ছিল কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটল চিয়াং কাইশেকের তখন এই বাহিনী নানচাং বিদ্রোহে যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছিল। যখন সংবাদ পৌঁছল ইয়ে তিং এবং হো লুং-এর বাহিনী নানচাং-এ সক্রিয় ভাবে নেমে পড়েছে তখন এই বাহিনী উপস্থিত হল হুনানে। এদের দায়িত্ব তুলে নিল মাও।

আনুয়ান খনি এলাকার শ্রমিক দল গড়ে তুলেছিল একটা আধা সামরিক বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পিং সেয়াং ওলি লিং-এর চাষীরা। এদের সম্মিলিত দল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী না হলেও এরা ছিল মার্কস্‌বাদের উগ্র সমর্থক। এদের দায়িত্বও এসে পড়ল মাওয়ের ওপর।

তৃতীয় দলে ছিল স্বেচ্ছাসেবক দল। এরা সবাই শ্রমিক ও কৃষক। অধিকাংশই হুপের অধিবাসী। আর চতুর্থ দলে যোগ দিয়েছিল জেনারেল সিয়া তাউ-ইনের বিচ্ছিন্ন সেনাদলের লোক। এরা সৈন্য বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসে মাও সে-তুং-এর সৈন্য দলে যোগ দিল।

মাও এই চারটি বাহিনীর নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

কি ভাবে আক্রমণ পরিচালনা করলে আমাদের সুবিধা হবে? প্রশ্ন করল মাও।

ম্যাপ সামনে নিয়ে সবাই গভীর ভাবে চিন্তা করছিল।

একজন অধ্যক্ষ বলল, প্রথম আর চতুর্থ রেজিমেণ্ট দক্ষিণ দিক থেকে চ্যাংসা আক্রমণ করুক।

আমি মনে করছি উত্তর পূব দিক থেকে এরা এগিয়ে যাক।

আরেক দলকেও তো অগ্রসর হতে হবে।

নিশ্চয়। দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এগোবে।

তৃতীয় বাহিনী কোন দিক থেকে এগোবে ?

তৃতীয় বাহিনী তুং মেনসি আক্রমণ করবে। সেখান থেকে পূর্ব দিক থেকে চ্যাংসার দক্ষিণে হাজির হবে। প্রথমেই দ্বিতীয় রেজিমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতায় লিউয়াং দখল করতে হবে। চারিদিক থেকে আক্রান্ত হলে চ্যাংসার পতন হবে ত্বরিতে। এই আক্রমণে হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষকদের আমাদের এই আক্রমণের সঙ্গী করে নিতে হবে। চ্যাংসার অভ্যন্তরে আক্রমণ করবে শ্রমিক কৃষকরা, বাহির থেকে আক্রমণ করবে মুক্তি ফৌজ। এবার তোমরা ভেবে দেখ এতে আমাদের জয় অনিবার্য কিনা।

অধ্যক্ষরা অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে সম্মত হল।

মানচিত্রের ওপর পিন বসিয়ে আক্রমণের পথ স্থির হল।

মাও তার এই পরিকল্পনা, সোভিয়েত গঠনের প্রস্তাব তৎসহ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা উপস্থিত করল কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে অনুমোদন লাভ করতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি একমাত্র চ্যাংসা দখলের পরিকল্পনা সমর্থন করল, সোভিয়েত গঠন, ভূমি বণ্টন ইত্যাদিতে সমর্থন জানাল না। চ্যাংসা দখল করলে যে সুবিধা হতে পারে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ ওয়াকিবহাল কিন্তু অবিলম্বে সোভিয়েত গঠন ইত্যাদিতে অনেক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বলে তা সমর্থন করতে পারল না। তারা অভিমত দিল মাও ভ্রান্ত পথে চলেছে, তা যেন সংশোধন করা হয়।

মাও খুশী হল না।

মাও বলল, তোমরা সামরিক শক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল। জনসাধারণের সহযোগিতাকে যেন মূল্য দিতে চাইছ না। আমি জনজাগরণের পক্ষপাতী এবং তাতে বেশি আস্থাশীল।

সদস্যরা বলল, শক্তি না থাকলে, অস্ত্র না থাকলে কোন মতেই তুমি কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সামরিক শক্তিকে বেশি মূল্য দিলে আমাদের কাজ হবে মিলিটারী য়্যাডভেনচার। তাতে স্থায়ী ফল লাভ হবে না।

মাওয়ের এই মৃদু প্রতিবাদ ভাবিয়ে তুলল সদস্যদের। অনেক আলোচনার পর তারা বলল, বেশ, তুমি জনতার অভ্যুত্থানের যখন বেশি মূল্য দিচ্ছ তখন তা তুমি করতে পার কিন্তু চ্যাংসায় নয়। চ্যাংসার পূর্ব দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে।

তোমরা কেমন যেন পরস্পরবিরোধী কথা বলছ। সামরিক অভ্যুত্থানকে স্বীকার করছ আবার জনজাগরণের একটা সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়ার টেনে দিচ্ছ এতে কোনই লাভ হবে না। আমি যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগোচ্ছি তারা যুদ্ধই করবে না তারা শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক কার্যধারায় সাহায্য করবে। আসল শক্তি গণশক্তি আর সামরিক শক্তি শুধু সহায়ক শক্তি।

সদস্যরা বলল, তুমি যে শক্তি নিয়ে এগোতে চাইছ তা প্রয়োজনের তুলনায় কম (Insufficient force)। সেজন্য তুমি যা করতে চাইছ তাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হবে, কোন লাভ হবে না।

মাও হেসে বলল, আমি আমার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ। আমার আত্মবিশ্বাস অটুট, সেজন্য আমি তোমাদের অভিমতের প্রতিবাদ করছি। বিগত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে হুনানের ওপর যে অত্যাচার করেছে শাসকরা, তার তুলনা নেই। আমাদের প্রয়োজন এই শাসকদের নির্মূল করা। একমাত্র হুনানে একলক্ষ তিরিশ হাজার লোককে হত্যা করেছে, আহত করেছে আরও কতজন তার হিসাব নেই। বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম নরহত্যার কোন নজীর নেই। পূর্বে হুনানে বিশ হাজার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিল। শাসক তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, জীবিত রয়েছে পাঁচ হাজারেরও কম, তার মধ্যে প্রায় একহাজার রয়েছে চ্যাংসায়। এই অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। আমরা চাই এই দানবদের নির্বংশ করতে। তার জন্য কিছু ঝুঁকি নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি মাওয়ের যুক্তি স্বীকার করল, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণীও শুনিয়ে দিল মাওকে।

মাও বলল, আমার সৈন্য সংখ্যা কম। তাই তাদের নানাদিকে

ছড়িয়ে দিয়ে সামরিক নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করতে চাই না। তোমাদের সম্মতি পেলে আমি আমার কাজে এগিয়ে চলতে পারি। ফলাফল দেখে তোমরা অভিমত দিও।

সেপটেম্বর মাসের নয় তারিখ।

মাও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। সর্বপ্রথম রেলপথ দখল করে যাতায়াত ব্যবস্থা নষ্ট করে দিল।

দশ তারিখে পিংসিয়াং আক্রমণ করল দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট, বার তারিখে লিলিং দখল করল মুক্তি যোদ্ধারা। যে ভাবে প্রোগ্রাম তৈরী হয়েছিল সেইভাবে কাজে এগিয়ে চলল মাওয়ের বাহিনী।

লিলিং-এ সরকারী বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করল।

জনবলে ও অস্ত্রবলে বলীয়ান সরকারী বাহিনীকে বাধা দিতে পারল না দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট। তারা শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হল, তারা পাশ কাটিয়ে লিউইয়াং শহর দখল করে বসল। এখানেও সরকারী বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করায় দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট পরাজিত হল এবং যুদ্ধে মাওয়ের দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য প্রাণ হারাল।

আরও বিপদ ঘনিয়ে এল মাওয়ের।

প্রথম ও চতুর্থ রেজিমেণ্ট আক্রমণ করল পিংচিয়াং। সামনে তাদের সরকারী ফৌজ। হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করল চতুর্থ রেজিমেণ্ট। তারা প্রথম রেজিমেণ্টকে পেছন থেকে আক্রমণ করল। তৃতীয় রেজিমেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তুংমেনসি দখল করে এগিয়ে গেল লিউইয়াং-এর দিকে কিন্তু তখন দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট সেখানে উপস্থিত ছিল না, ফলে তৃতীয় রেজিমেণ্ট আর অগ্রসর হতে পারল না।

ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক চতুর্থ রেজিমেণ্টের সৈন্যরা পালিয়েছে।

দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট প্রায় নিঃশেষ।

মাও প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে চ্যাংসা আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল।

পনরই তারিখে চ্যাংসায় প্রবেশ করবে এই আশা ছিল মাওয়ের তার পরিবর্তে পনরই তারিখে সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে চিংকানসান পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। তখন তার সৈন্যদলে মাত্র একহাজার সৈন্য। বাকি সবাই মৃত অথবা আহত।

মাওয়ের প্রথম এই বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হল।

হুনান ও কিয়াংসি প্রদেশের মধ্যবর্তী চিংকানসান পাহাড়ে ব্যূহ রচনা করতে হল অবশিষ্ট সেনাদের রক্ষা করতে ও পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করতে।

চ্যাংসার উপকণ্ঠ থেকে ফিরে এসেছিল মাও। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করল মাও যে চ্যাংসা দখল না করে ফিরে এসেছে তা খুবই অন্যায় এবং বিশ্বাসঘাতকতা (betrayal) এই জন্য মাওকে নিন্দা করে প্রস্তাবও গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় কমিটি। তাদের কাছে সংবাদ দিয়েছিল কোন একজন রুশীয় কমরেড। সে বলেছিল, চ্যাংসার পতন অনিবার্য জেনেও মাও চ্যাংসা আক্রমণ করেনি। উপকণ্ঠ থেকে ফিরে এসেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি আবার চ্যাংসা আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ মাওয়ের কাছে আর পৌঁছায়নি। মাও তখন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মাওয়ের এই অসাফল্য নিয়ে গুরুতর আলোচনা হয়েছে। বাল্যকালে মাও যে সব দস্যু সর্দারদের কাহিনী উপন্যাস আকারে পড়েছে সে সবের প্রভাব যথেষ্ট ছিল মাওয়ের পরবর্তী কর্মপদ্ধতিতে।

মাও মনে করত সৈন্যবাহিনী বিপ্লবে সহায়তা করতে পারে।

মাও মনে করত ডাকাতরা বিপ্লবে সাহায্য করতে পারে।

মাও মনে করত লুঠেরারাও সাহায্য করার যোগ্য।

মাও মনে করত ভিখারীরাও বিপ্লবে অনুকূল ভূমিকা নিতে পারে।

মাও মনে করত দেহপণ্যজীবিনীরাও বিপ্লবে সাহায্য করতে পারে।

কেন্দ্রীয় কমিটি মাওয়ের এই তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি।

তারা চু টেকে পাঠাল মাও যে সব ভুল করেছে তা সংশোধন করে নির্ভুল পথে বৈপ্লবিক কার্যধারাকে পরিচালনা করতে।

চু টেও ভুল করল।

মাও কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধী, কেন্দ্রীয় কমিটিও কুয়োমিনটাং বিরোধী কিন্তু চু টে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেই আরেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল।

চু টের এই কাজকে অনেকেই নিন্দা করেনি, কারণ তখন কুয়োমিনটাং সৈন্যদলে ঢুকে অনেক কম্যুনিষ্ট সদস্যই ছদ্মবেশে কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী। বিশেষ করে নানচাং-এর যুদ্ধে পরাজয়ের পর চু টে তার কয়েক হাজার বিচ্ছিন্ন সৈন্য নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষে আত্মরক্ষার জন্যই তার সৈন্যবাহিনীকে কুয়োমিনটাং সৈন্যবাহিনী পরিচয় দিয়ে ইউনানের জেনারেল ফান সিসেং-এর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চু টের এই আশ্রয় নেবার সংবাদ পৌঁছান মাত্র চু টেকে কুয়োমিনটাং বাহিনী থেকে সরে আসবার নির্দেশ দেওয়া হল। চু টে জেনারেল ফানের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার ফিরে এল কম্যুনিষ্ট শিবিরে। আসার সময় জেনারেল ফানের সৈন্যবাহিনী থেকে বহু সৈন্যকে নিজের দলভুক্ত করে নিয়ে এসেছিল। চু টে তার এই বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ হুনানে উপস্থিত হল।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে কুয়োমিনটাং-এর আশ্রয়ে বসে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনা করার পর্যালোচনা হয়েছিল। তাতে কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেছিল এই 'ভাবে কম্যুনিষ্ট সদস্যরা কাজ করলে আত্মহত্যার সামিল হবে, সে জন্য আঠাশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর এক আদেশ জারী করে কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সকল সংযোগ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হল। যে সব সদস্য তা করতে চাইবেনা তাদের পার্টি থেকে বের করে দেবার নির্দেশও দেওয়া হল।

মাও পাহাড়ে বাস করছে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তার নিকটতম সঙ্গী তার ভাই ও স্ত্রী, সহযোগী তার ভগ্নী। মাও পরিবারের প্রায় সকলেই তখন নেমে পড়েছে এই অভ্যুত্থানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত সব সময় পৌঁছত না মাওয়ের কাছে। মাও তার নিজের কাজের নীতি নিজেই স্থির করতে বাধ্য হতো। আর মন্ত্রণা করত তার নিকট সঙ্গীদের সঙ্গে।

আমাদের এই নির্বাসিত জীবনকে কি ভাবে বিপ্লবের কাজে লাগাতে পারি?—প্রশ্ন উপস্থিত করল মাও তার সহকর্মীদের সামনে।

ফসল বোনার সময় পেরিয়ে গেছে। শীতের আমেজ নেমে এসেছে। এই সময় রাস্তা ঘাট চলাচলের উপযোগী, জমিদারদের ঘরে প্রচুর ফসল। কৃষকদের নিয়ে যদি কোন অভ্যুত্থান ঘটানো যায় তা হলেই লাভবান হওয়া সম্ভব।—অভিমত জানাল তার সহচররা।

একজন বলল, জমিদারদের কোতল করাই হল সব চেয়ে বড় কাজ।

আরেকজন বলল, গোরিলা যুদ্ধ হল প্রশস্ত। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হবে জমিদার, দুষ্ট অভিজাত, সরকারী প্রশাসন যন্ত্র।

মাও শেষের প্রস্তাব গ্রহণ করল।

মাও এই সঙ্গেই বলল, কৃষক যাদের সম্পন্ন চাষী মনে করি তারাও আমাদের ভয়ানক শত্রু "Potential enemy"—এদেরও উচ্ছেদ করতে হবে, কেবলমাত্র ভূমিহীন কৃষকদেরই আমরা বিশ্বাস করব। ভূমি সংস্কারে যারাই বাধা দেবে তাদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

মাওয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করল সবাই।

চিংকানসান পাহাড়ে ঘাঁটি করে মাও তার সহচরদের নিয়ে গোরিলা যুদ্ধে নেমে পড়ল। মাওয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ না থাকলেও হুনানের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করত মাও। হুনান কমিটির সদস্যরা চিংকানসান পরিদর্শন করে অভিমত দিল, মাও তার কাজ পুরোপুরি করতে পারেনি। তারা সমালোচনা করল তার অক্ষমতার। পাতি বুর্জোয়াদের সর্বহারার পর্যায়ে না আনলে তারা

বিপ্লবে যোগ দেবে না বলেই তারা বিশ্বাস করে। যে পরিমাণ দুর্জন-দের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল অথবা বড়লোকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করার কথা ছিল মাও তা করেনি। মাও ঠিক এই অভিমত মানতে পারেনি, তবে ধনী লোকের কাছ থেকে কর আদায় করে, বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করে তার বাহিনীর কাজ সচল রেখেছিল।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এসে পৌঁছেছে চিংকাংসানে।

একজন সদস্য বলল পার্টির সিদ্ধান্ত, দক্ষিণ হুনানে তোমাকে তৎপর হতে হবে। যে কোন ভাবেই হোক মুক্তি ফৌজের পক্ষে দক্ষিণ হুনান দখল অপরিহার্য।

মাও প্রতিবাদ করে বলল, আমার যা বর্তমান শক্তি তা নিয়ে দক্ষিণ হুনান গেলে পরাজয় ঘটবে। আমাদের মূল ঘাঁটিও রক্ষা করতে পারব না।

তোমাকে অনেক ভুল করার সুযোগ দিয়েছি, সংশোধন করার সুযোগও দিয়েছি। তোমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ মেনে চলতেই হবে। দক্ষিণ হুনান আক্রমণ করে সেখানে আমাদের ঘাঁটি তৈরী করতেই হবে।

মাও বলল, বর্তমানে আমাদের শক্তি কম, এ অবস্থায় এত বড় ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে কিনা তোমরা আরও একবার ভেবে দেখ।

আমরা ভেবেই তোমাকে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছি।

মাও আর কোন প্রতিবাদ না করে দক্ষিণ হুনান আক্রমণ করল এবং পরাজিত হল।

চিংকাংসান তখন অরক্ষিত।

কুয়োমিনটাং বাহিনী সেই অবকাশে চিংকাংসানও দখল করে নিল। মাওয়ের আশঙ্কা সত্যই বাস্তবে পরিণত হল কিন্তু মাও পেছিয়ে যাবার মত লোক নয়। দক্ষিণ হুনান থেকে পালিয়ে আসার সময় চু টের সঙ্গে দেখা হতেই চু টে তার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করল। ইতিমধ্যে

কৃষক সম্প্রদায় থেকে আট হাজার নতুন সেনা সংগ্রহ করে মাও ছুটল চিংকাংসান উদ্ধার করতে।

মাও তখন কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গঠিত ফ্রন্ট কমিটির সম্পাদক। চিংকাংসান উদ্ধারের পর মাও শক্তি সংহত করার দিকে বেশি নজর দিল। পদাধিকার বলে নিজের মত দেবার অধিকার তার ছিল।

নতুন সেনাবাহিনীর নাম হল চতুর্থ মুক্তি বাহিনী (Fourth Red Army) আর এর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল চু টের ওপর। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি রূপে মাও রইল সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। চু টে যে বাহিনী গঠন করল তাতে রইল দশ হাজার সৈন্য, এদের অস্ত্র ছিল শুধু রাইফেল আর বর্শা। এই মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো রেজিমেণ্টকেই রাইফেল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল বাকি চারটি রেজিমেণ্টকে নির্ভর করতে হল বর্শার ওপর। এই সৈন্যবাহিনীও স্থায়ীভাবে কাজে লাগাতে পারা যায়নি। দুটো রেজিমেণ্ট দল ছেড়ে ফিরে গেল তাদের গ্রামে।

কাই-হুই ছিল সুখ-দুঃখের সঙ্গী। মাওকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে তার স্ত্রী। যেদিন স্থির হল কৃষক আন্দোলনকে শহর এলাকার সর্বহারা আন্দোলনের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে হবে সেদিনও কাই-হুই এই আলোচনায় যোগ দিয়েছে তার স্বামীর পাশে বসে। মাও সে-তুং-এর চিংকাংসান পাহাড়ের জীবনেও কাই-হুই ছিল তার সঙ্গী। স্বামীর সঙ্গে শুকনো কালো রুটি খেয়ে, স্বামীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবের আদর্শকে রূপায়িত করতে এগিয়েছে। কোন সময়ই চিন্তা করেনি ব্যক্তিগত বিপদ আপদকে। যুদ্ধক্ষেত্রেও কাই-হুই ছিল তার স্বামীর সহচরী।

মাও গুরুতর বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছে কাই-হুইয়ের সঙ্গে। মাও বলল, এক বছরের মধ্যে আমরা কিয়াংসি প্রদেশ জয় করব। নানচাং-এর রাজধানী দখল করব।

কাই-হুই বলল, আমাদের সামরিক শক্তি খুবই কম। এ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন জয় নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

মাও জোর দিয়ে বলল, আত্মবিশ্বাস থাকলে অনেক কিছু করা যায়।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরিবেশ যদি সহযোগিতা না করে তাহলে কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না।

কাই-হুইয়ের যুক্তি অস্বীকার করতে পারল না মাও।

হয়ত তার আগেও হতে পারে, বলল তার স্ত্রী।

মাও হিসাব করে দেখল তার সৈন্যবাহিনীতে রয়েছে মাত্র তিন হাজার মুক্তিসেনা। এদের দাঁড়াতে হবে শক্তিশালী কুয়োমিনটাং সরকারের পেশাদারী সৈন্যের সম্মুখে।

লি লি-সানের সঙ্গেও মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে। গ্রাম অথবা শহরের যে সব ভবঘুরে অপরাধপ্রবণ সর্বহারা এসে যোগ দিয়েছে মুক্তিফৌজে তাদের দিয়ে সত্যকার মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে লি বেশ সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

লির এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিশেষ ভাবে যুক্তি তর্ক উত্থাপন করতে হয়েছে মাওকে। কাই-হুই অনেক তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। যাদের লুম্পেন বলা হয় তারা যত শীঘ্র জীবনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে অতটা এমন কি এর বেশ কিছু বৃহৎ অংশ তা পারে না কারণ তাদের সংযোগ ও স্বার্থ থাকে অন্যত্র।

লি লি-সান কিন্তু কিছুতেই এর সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি। লি বলল, গ্রাম হল শাসকদের হাত-পা অথবা দেহের ক্ষুদ্র অংশ।

কাই-হুই তা স্বীকার করল না, বলল, গ্রামই হল আসল প্রাণকেন্দ্র।

উঁহু। শহর হল শাসকদের মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ড, গ্রাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। যদি আমরা মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডকে দেহ থেকে আলাদা করে দিতে পারি তা হলে বুর্জোয়া, অভিজাত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মৃত্যু

অবধারিত কিন্তু অঙ্গপ্রতঙ্গ ছেদ করলে মৃত্যু ঘটবে না। সময় সুযোগ মত আবার তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেজন্য এদের মৃত্যু ঘটাতে হলে শহরকেই লক্ষ্যবস্তু করতে হবে।

কাই-হুই বলল, কৃষকদের আন্দোলনই জাতীয় জীবনে বিপ্লব আনতে সক্ষম। এদের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় মেহনতী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা তা হলেই কাজ এগোতে পারে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি যেমন দরকার জনসংগঠনও তেমনি দরকার, তার জন্য শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি নজর দেওয়া উচিত। "The vast human and material resources are to be found in the Country side rather than in the cities "—এই আমার অভিমত। পল্লী অঞ্চলকে অঙ্গ-প্রতঙ্গ বলে উপেক্ষা করা ভুল হবে।

মাও এই আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, We must inspire ourselves with the most resolute spirit of unyielding struggle, with the most burning patriotic sentiments and with the will to endurance and carry out a protracted struggle against the enemy—আমরা দৃঢ় মন নিয়ে সংগ্রাম করব আমাদের দেশপ্রেম এবং অধ্যবসায় শত্রুর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। তবেই আমাদের জয়।

কিন্তু কাদের নিয়ে ? প্রশ্ন করল কাই-হুই।

মানুষ যারা তাদের নিয়ে।

মৃত্যুকে সবাই ভয় করে।

তা ঠিক ! গম্ভীর ভাবে বলল মাও, আমরা মানুষ, শত্রুরাও মানুষ —অর্থাৎ আমরা সবাই মানুষ। আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়।

আমাদের অস্ত্র নেই শত্রুর মোকাবিলা করার মত। শত্রু আমাদের হত্যা করবে, আমরা দুর্বল অস্ত্র নিয়ে তাদের বাধা দিতে পারব না।

কুয়োমিনটাং যে ভাবে অত্যাচার করছে, অকারণে নির্দোষ লোকদের হত্যা করছে তা থেকে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করলেও আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। যদি মরতেই হয় তাহলে শত্রুকে আঘাত না দিয়ে মরব কেন? আমাদের মরতে হবে, মরণকে আমরা ভয় করিনা, কারণ যে কোন ভাবেই তা আসতে পারে। লৌহ দুর্গে যারা বাস করে তারাও মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচে না। মৃত্যু হল মনুষ্য জীবনে একমাত্র সত্য। যারা জানে মৃত্যু নিশ্চিত তারা শত্রুকে ভয় করবে কেন! শত্রু বেশি হোক কম হোক আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যেমন খাদ্যের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি আমাদের মুক্তির ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদের কাজ হবে শত্রুকে গ্রাস করা। তার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতেই হবে।

তিরিশ সালের জুলাই।

স্থির হল Powerful assult by the Red Army—রেড আর্মি কঠিন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। লক্ষ্যস্থল চ্যাংসা দখল।

পেং তে-হুয়াইয়ের নেতৃত্বে রেড আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যাংসার ওপর।

চু টে আর মাও প্রথম সৈন্যবাহিনী নিয়ে নানচাং-এর দিকে অগ্রসর হল। দ্বিতীয় বাহিনী নিয়ে হো লুং এগিয়ে গেল য়ুহানের দিকে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

পেং তে-হুয়াই দখল করল চ্যাংসা তার তৃতীয় বাহিনী নিয়ে।

নানচাং-এর উপকণ্ঠে ঘোরতর যুদ্ধে কুয়োমিনটাং বাহিনী জয়লাভ করল। মাও আর চু টে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

পেং তে-হুয়াই চ্যাংসা দখল করলেও তা রক্ষা করতে পারল না। মাত্র দশ দিন শহর দখলে রেখেছিল। কুয়োমিনটাং কয়েক ডিভিশন শক্তিশালী সৈন্য পাঠিয়ে চ্যাংসা আবার দখল করল।

ইতিমধ্যে মাও ও চু টে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল

চ্যাংসা। আবার আরম্ভ হল ঘোরতর যুদ্ধ। কুয়োমিনটাং-এর বৃহৎ ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারল না মাওয়ের এই দুইটি সম্মিলিত দল।

মাও বলল, এ যুদ্ধ করে লাভ নেই। জনক্ষয় হবে।

সবাই বুঝল এ যুদ্ধে নিজেদের শক্তিহানি ঘটবে। তারাও বলল, এ যুদ্ধ দরকার নেই। এবার ফিরে যাওয়া যাক দক্ষিণ কিয়াংসিতে।

মাও, চু টে, পে তে-হুয়াই তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিরাপদ এলাকার দিকে এগোতে লাগল। তাদের পেছনে রয়ে গেল মাওয়ের জীবনের সর্বাধিক হৃদয়বিদারী ঘটনা।

এই যুদ্ধে কুয়োমিনটাং বাহিনীর হাতে বন্দী হল মাওয়ের স্ত্রী ও ভগ্নী।

সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছল মাওয়ের কাছে।

মাও পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই সংবাদ সামান্য ঘটনার মতই গ্রহণ করল মাও। তার কপালে রেখা দেখা দিল চিন্তার। উন্মুক্ত আকাশের তলায় ছাউনী করে সারা রাত চিন্তা করল। কিন্তু স্ত্রী ও ভগ্নীকে উদ্ধার করার কোন উপায়ই আর ছিল না। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে মাও অনিদ্রায় রাত কাটাল।

আবার এগিয়ে চলল তার বাহিনী কিয়াংসির পথে।

কদিন পরে সংবাদ এল কুয়োমিনটাং মাওয়ের স্ত্রী ও ভগ্নীকে ফাঁসি দিয়েছে।

সংবাদ শুনে মাওয়ের দু গাল বেয়ে চোখের জল নামল।

মাও সে রাতে না ঘুমিয়ে কবিতা লিখল তার স্ত্রী কাই-হুইয়ের উদ্দেশ্যে। সেই কবিতার সঙ্গে রয়ে গেল তার হৃদয়-বেদনা। এই ব্যথার বাহ্যিক কোন অভিব্যক্তি ছিল না, মাও একে প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। বিপ্লবের দান হল দুঃখ।

চু টে সংবাদ শুনে ছুটে এল মাওকে সান্ত্বনা দিতে।

মাও বলল, বিপ্লব। বিপ্লব রক্ত চায়। শুধু অপরে রক্ত দেবে কেন

বন্ধু। আমাকেও দিতে হবে মাশুল। আমরা তো সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। এই তো স্বাভাবিক। এর জন্য দুঃখ নেই। অনেক হারিয়ে অনেক পাওয়াই হল বিপ্লবীর ধর্ম। তবুও দুঃখ-বেদনাকে তো ভুলে যেতে পারিনা। কাই-হুই আমার প্রথম জীবনের স্বপ্ন। তাকে হারানো যে কত বেদনাময় তা তো তুমি বুঝতেই পারছ। তবুও সহ্য করতে হবে। নিরুপায়ের তো অন্য গতি নেই। দেশের জন্য সহ্য করতেই হবে বন্ধু।

* হো ঝু-চেনকে বিয়ে করেছিল মাও কাই-হুইয়ের মৃত্যুর পর। তার ব্যক্তিগত জীবনে নতুন সঙ্গী পেল মাও কিন্তু সেই ভালবাসার উৎস তখন শুকিয়ে গেছে। ঝু-চেন তা বুঝত। মনে মনে কেউ-ই বোধহয় খুশী নয়। কিন্তু তখন হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করার বোধহয় অবসর ছিল না। গতানুগতিক ভাবে চলতে থাকে তাদের জীবন-ধারা।

মাও তখন মেতে উঠেছে মুক্তি যুদ্ধে।

যেদিন সংবাদ পেল তার প্রথম সন্তান জন্মেছে, সেদিন আনন্দ উৎসব করার মত কোন সুযোগও ছিল না মাওয়ের। ঝু-চেনের কোল আলো করা ছেলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখারও সময় ছিল না মাওয়ের। মাও তখন পিতা। ঝু-চেন তখন মা।

মাও শিক্ষক, মাও সাংবাদিক, মাও সাহিত্যিক, মাও বিপ্লবী, মাও সমাজতন্ত্রী, দার্শনিক মাও, মাও সর্বহারার অভিন্ন বন্ধু। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে মাও একটা বিরাট মানুষ। এই মানুষটিকে নিয়ে সারা বিশ্ব বিভিন্ন মত ও সমালোচনায় মুখর।

অনেকের অভিমত কাই-হুইয়ের জীবিতকালে হো ঝু-চেন বিয়ের আগেই মাও সে-তুংয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করত। কাই-হুইয়ের মৃত্যুর পর মাওয়ের সঙ্গে ঝু-চেনের বিয়ে হয়। ঝু-চেনের গর্ভে মাওয়ের পাঁচটি সন্তান জন্ম নেয়।

মাওয়ের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায় শুধু উত্থান-পতনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত না হলে তার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষন কোন অবাস্তব কিছু নয়।

আজ মাও সে-তুংয়ের চিন্তা করার অবসর নেই। দুঃখ জানাবার ক্ষেত্র নেই। নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য বড়ই অসহায় মনে করল মাও কিন্তু সামনে বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠস্বর। নিকটে মানুষের আর্ত ক্রন্দন, নিকট ভবিষ্যতে কর্তব্যের আহ্বান। মাও ভাবাবেগকে প্রশমিত করল যুক্তির সৌধ গড়ে। কুয়োমিনটাংয়ের এই নারী হত্যার অপরাধকে মাও ভুলতে পারেনি সারাটা জীবন।

ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলে গতির বিরাম নেই। যে ঘটনা মাওয়ের মনে আঘাত দেয় মাও সেই ঘটনার ভিত্তিতে নিভৃতে বসে কবিতা লেখে। নিজে পড়ে, অপরকে পড়ে শোনায়।

কাই-হুইকে যেমন করে তার জীবনসঙ্গিনী রূপে দেখা গেছে ঝু-চেনকে সে ভাবে দেখা যায়নি। ঝু-চেন মাতৃত্বলাভ করেছিল, নয় বৎসরে পাঁচটি সন্তান উপহার দিয়েছিল মাওকে। বোধহয় সন্তান প্রতিপালন করতেই ঝু-চেনকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই মাও সে-তুং-এর রাজনৈতিক কার্যকলাপে তার ছাপ ছিল নগণ্য।

জীবনের গতি, চিন্তার ক্ষেত্র, কাজের পদ্ধতি—সব কিছুতেই দেখা দিল পরিবর্তন ও গতি। মাও স্ত্রী ও ভগ্নীর মৃত্যুকে বিপ্লবের নিশ্চিত ফলরূপে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। মনের কোণায় যে ক্ষত দেখা দিয়েছিল তা বাহির থেকে কেউ-ই দেখতে পেত না।

মসকোর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল অনেক আগেই। চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সব কাজ মসকো সমর্থন করত না। লি লি-সান মসকো সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে বেশ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

অনেকেই যখন লি লি-সানের ত্রুটিগুলো বড় করে দেখাচ্ছিল তখন

চি চিউ-পাই আর চৌ এন-লাই লি লি-সানের সমর্থনে জোর যুক্তির অবতারণা করতেই অভিযোগগুলো ক্রমেই উঠিয়ে নিতে থাকে।

আমাদের নেতৃত্বের চেয়ে আমাদের সম্মান রক্ষা হল বড় প্রশ্ন।

বলা শেষ করেই চৌ এন-লাই বলল, দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলতে পারি লি লি-সানের নীতি আমাদের পার্টির স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি যা ঘটেছে তা বৃহৎ কাজে হয়েই থাকে।

চু চিউ-পাই সমান জোর দিয়ে সমর্থন করল চৌ এন-লাইয়ের কথা।

লি লি-সান ও স্টালিনের মতবিরোধের প্রভাব ছিল মাওয়ের ওপর। লাল ফৌজের ওপর লি লি-সানের নীতির বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। লাল ফৌজকে চ্যাংসা, নানচাং ও য়ুচাং আক্রমণ করার আদেশ দিয়েছিল পার্টি।

লি এই আক্রমণের সময় অভিমত দিয়েছিল, আমাদের লাল ফৌজ বিপ্লবের সহযোগী হবে, তবে ফৌজেও সর্বহারার নেতৃত্ব জোরদার করতে হবে এবং শহর এলাকায় ধর্মঘট ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ দিয়ে শহরের সর্বহারাদেরও সক্রিয় করে তুলতে হবে।

এদিকে কমিনটার্নও বেশী জোর দিল শহরের শ্রমিক আন্দোলনের ওপর, তারা রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে শহরে ধর্মঘট ডাকার পক্ষপাতী। তারা মনে করেছিল কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে তাদের সংগ্রাম শীঘ্রই শেষ হবে। কিন্তু মাওয়ের কর্মপদ্ধতি ছিল অন্য রকম। মাও মসকোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই কাজে এগিয়ে যাচ্ছিল। লি সামরিক তৎপরতাকে খুব ভাল চোখে দেখত না, বিশেষ করে গোরিলা যুদ্ধের চেয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণকে বেশি মূল্যবান মনে করত।

লি সব সময়ই বলত, বিশ্ব মুক্তিতে আমার সমর্থন নিশ্চয়ই আছে তবে তার পুরোধা ও পথপ্রদর্শক হবে চীন। আমি আমার আনুগত্য জানাব চীনকে, মসকোকে নয়।

চাংকাংসানে থাকার সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মাঝে মাঝেই মাওয়ের মতবিরোধ ঘটত।

পার্টির অন্যতম শক্তিশালী সদস্য তুজন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

জমিদারের ছেলে ওয়াং প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করে সাংঘাইতে। সেখান থেকে সে লেখাপড়া শিখতে যায় মসকোতে। মসকো থেকে ফিরে আসার পরই ওয়াং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়। কিছু কালের মধ্যেই সে পার্টির প্রতিপত্তিশালী সদস্য রূপে গণ্য হয়।

অপর জন আঞ্চলিক ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র চিন। সেও সাংঘাইতে লেখাপড়া শিখে মসকোতে গিয়েছিল পড়তে। সেও ফিরে এসে যোগ দিল কম্যুনিষ্ট পার্টিতে। কিছু কালের মধ্যেই সেও নিজের স্থান শক্ত করে নিয়েছিল পার্টিতে।

তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তি হল সাংঘাই শহর।

রাজনৈতিক জ্ঞান অথবা বাস্তব বুদ্ধির যেমন তাদের অভাব, তেমনি তারা শহরের মধ্যবিত্ত ও কিছু শ্রমিক বাদে অন্য কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকায় তাদের বক্তব্য প্রায়ই পার্টি কর্মীদের বিশেষ ভাবে অশান্তির মধ্যে ফেলে দিত। বিশেষ করে চীনের চাষী সমাজের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাদের না থাকায় কৃষক আন্দোলনকে তারা মোটেই মূল্যবান মনে করত না।

মাও এদের সহ্য করতে পারত না। মাঝে মাঝেই নীতিগতভাবে মাওয়ের সঙ্গে এই দুই জনের তর্কাতর্কি হতো। এদের কাজকে মোটেই সমর্থন করতে পারত না মাও।

মাও সব সময়ই চেষ্টা করত কেন্দ্রীয় কমিটির যে সব নির্দেশে বিপদ হতে পারে সেই সব নির্দেশ সতর্কভাবে এড়িয়ে চলতে। করতও তাই।

ক্রমেই মাওয়ের অধিকৃত এলাকা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি লাল ফৌজও দলে ভারী হতে থাকে। এর ফলে মাওয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ হল। মাও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বাস্তবজ্ঞান বর্জিত নিষেধ মানতে সহজে রাজি হতো না। মাঝে মাঝে তা নিয়ে তর্কবিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা দেখা দিত।

ওয়াং বলত, কৃষি বিপ্লব যাকে বলা হচ্ছে তা দিয়ে চীনের মুক্তি আসতে পারে না।

চিন ওয়াং-এর বক্তব্য সমর্থন করত।

মাও বলত, যদি চীনের মুক্তি কোনদিন আসে তা আসবে কৃষি-বিপ্লবের অবদানে।

ওয়াং ও চিন বলত, আমরা কৃষি বিপ্লবে বিশ্বাস করি না।

মাও জোর দিয়ে বলত, কৃষি বিপ্লব ঘটাতে না পারলে কিছুই হবে না। মধ্যবিত্ত আর শ্রমিকদের ওপর ভরসা করে কোন সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।

আমরা চাই ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে কুয়োমিনটাংকে উচ্ছেদ করতে।

শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা মোটেই সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমাদের যখন অস্ত্রশস্ত্র নেই। আমাদের সামনে যে বিরাট শক্তি রয়েছে তাকে গোরিলা যুদ্ধে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ শক্তিকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করতে পারলে তবেই বিপ্লব ও মুক্তি সম্ভব।

গোরিলা যুদ্ধ দিয়ে চীন দখল করা আর ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেচন করা একই কথা। সামগ্রিকভাবে আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে না পারলে কোন কাজই হবে না। তার জন্য প্রস্তুতির দরকার।

ওয়াং ও চিনের এইসব যুক্তি যে অসার তা ক্রমেই প্রমাণিত হতে লাগল মাওয়ের সাফল্যে। অথচ যারা শুধু শ্রমিকদের ওপর ভরসা করে আলোচনা করেছে, মাওকে বাধা দিয়েছে এবং সামগ্রিক যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছে তারা বিপ্লবকে মোটেই সফল করতে পারেনি।

মাও শান্তিতে কাজ করতে পারেনি।

সংবাদ এল তার মুক্তিফৌজে একদল লোক ঢুকে পড়েছে যারা কম্যুনিষ্ট নীতিকে বানচাল করতে কুয়োমিনটাং থেকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। আর এদের অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে বিশ নম্বর লাল ফৌজে।

মাও চিন্তিত হল। তার নীতিকেই কার্যকর করার যেমন চিন্তা করেছে তেমনি চিন্তা করেছে তার নেতৃত্বকে রক্ষা করতে। তাকে বিপন্ন করতে Anti-Bolshevik League যে ভাবে সৈন্যদলে ঢুকেছে তাতে অচিরেই প্রতিবিপ্লব আরম্ভ হতে পারে। সে আশঙ্কাও যথেষ্ট। মাও দৃঢ়তার সঙ্গে আদেশ দিল, সন্দেহভাজন সবাইকে গ্রেপ্তার কর।

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে ফুতিয়েনে আটক করে রাখা হল। এদের মধ্যে নেতাও ছিল কয়েকজন।

এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও মাও সজাগ।

আবার আদেশ দিল, কোন রকম বিদ্রোহ দেখা দিলে যেন কঠিন হস্তে তা দমন করা হয়।

দক্ষিণ কিয়াংসির এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হল বিশ নম্বর বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। তিরিশ সালের আটই তারিখে তুংকুং শহরের উপকণ্ঠবর্তী সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। তারা ফুতিয়েন দখল করতে এগিয়ে চলল। তাদের উদ্দেশ্য বন্দীদের মুক্ত করা।

মাও এদের আক্রমণ প্রতিহত করল।

বিদ্রোহীরা কান নদী পেরিয়ে অপর তীরে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধ চলল দু মাস। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রচার চালাতে লাগল। উভয় পক্ষই জনসমর্থন লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে থাকে।

মাওয়ের সঙ্গীরা বলল, যে সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা বাদে তাদের সাড়ে চার হাজার অনুচরকে বন্দী করা হয়েছে। এরা সবাই কুয়োমিনটাং-এর অর্থে আমাদের সর্বনাশ করতে গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল।

এদের বিচার করতে হবে। বিশ্বাসঘাতকদের কোন সময়ই দয়া দেখাতে নেই।

বিচার কার্য চলল।

বিচারে সাড়ে চার হাজার জন বন্দীর মধ্যে প্রায় তিন হাজার জনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া গেল। তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল বিচারকরা।

প্রতিপক্ষ বলল, মাও তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখতে এই তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করেছিল।

আবার কেউ কেউ বলল, মাও রক্তপিপাসু। তার এই কাজ কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। তিন হাজার ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক দুর্নাম দিয়ে হত্যা করার পেছনে কোন নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে না।

মাও কিন্তু থামল না। মাও গঠন করল গোয়েন্দা বাহিনী। বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে মাও হয়ে উঠেছিল ভীষণ নিষ্ঠুর। সেজন্য গোয়েন্দা বিভাগ গঠন করে বৈপ্লবিক কার্যধারাকে নিরঙ্কুশ করতে সবিশেষ আগ্রহী হয়েছিল।

কিন্তু মাও বিপ্লবের শত্রু মনে করে নরহত্যার মোটেই পক্ষপাতী ছিল না। জনতার মানসিক অবস্থা সে জানত। হঠাৎ একদিনে যে মানুষ প্রগতিকে স্বীকার করবে এ বিশ্বাস মাওয়ের ছিল না, সেজন্য নরহত্যার তার কোন ঔৎসুক্য দেখা যায়নি, এমন কি অকারণে কারও ওপর কোন অত্যাচার যাতে না হয় সেদিকেও নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল তার অনুগামীদের। তবে যেখানে শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন মনে করেছে সেখানে সে মোটেই দুর্বলতা প্রদর্শন করেনি।

প্রতিপক্ষ বলেছে, তা না হলে মাও বাঁচতে পারত না।

মাও নিজেকে বাঁচাতে চায়নি, বিপ্লবকে বাঁচাতে চেয়েছিল চীনের মুক্তির জন্য। এ কথা অনেকেই স্বীকার করতে চায়নি।

বিশ্বাসঘাতকদের দমন করতে মাও যে পথ গ্রহণ করেছিল তার সমর্থন যারা করে না তারা চ্যাংসায় লক্ষ লোক হত্যাকে কি করে সমর্থন করে তা ভাবা যায় না।

তিরিশ সালে নানা বিভ্রাট ঘটেছে।

সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। মাও তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে হারিয়েছে। বলতে গেলে তিরিশ সালে মাওয়ের কর্মজীবনে আঘাতের পর আঘাত এসেছে। এমন কি কেন্দ্রীয় কমিটিও মাওয়ের কার্যাবলী সব সময় সমর্থন করেনি।

একত্রিশ সালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

মাও যেন আলোর সন্ধান পেল। অবস্থা তার কিছুটা অনুকূল।

কিয়াংসিতে তার যারা বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা নির্মূল হল কিম্বা আত্মসমর্পণ করল তার নীতির কাছে। ফুতিয়েনের ঘটনার পর বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর ঘটেনি বললেও চলে।

অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে কম্যুনিষ্ট ইনটারন্যাশন্যাল বেশী আগ্রহী। তারা নতুন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে এবং সে সব নীতি যাতে প্রযুক্ত হয় তার জন্যও বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করল, অধিকৃত অঞ্চলের সকল প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল হবে সাংঘাই। পূর্বে কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে যে সব অসুবিধা ছিল তা দূর করতেই এই ব্যবস্থা। কিয়াংসিতে যে সব সোভিয়েত গঠন করা হয়েছিল তার প্রশাসনে সাক্ষাতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকার স্থাপন করাই হল উদ্দেশ্য।

অনেকেই শঙ্কিত হয়েছিল। মাওয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে মনে করেছিল পার্টি স্বার্থহানিকর। যে সব স্থানে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে মাওয়ের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। আবার পার্টিতেও মাওয়ের বক্তব্য ও নীতি নিয়ে আলোচনা করতে অনেকেই এগিয়ে আসত না। পট পরিবর্তন হল চৌ এন-লাইয়ের আগমনে। চৌ এন-লাই ও তার সমর্থকরা এসে মাওয়ের ক্ষমতা হ্রাসের দিকে নজর দিল।

অধিকৃত এলাকার জন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল।

মাও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিল।

চৌ এন-লাই ও তার সহচররা এই প্রজাতন্ত্র গঠনে সর্বপ্রকারে

আগ্রহী। ইন্টারন্যাশন্যালও যতশীঘ্র সম্ভব এই রকম একটি সরকার গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

লি লি-সান এ বিষয়ে একমত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমতও পোষণ করত।

লি বলল, সরকারের প্রশাসন পরিচালনার কেন্দ্রস্থল হোক কোন শহরে।

চৌ বাধা দিয়ে বলল, শহরে নয়, গ্রামে।

লি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তা হলে অনেক বিষয়েই আমাদের অসুবিধা হবে।

চৌ বলল, সবচেয়ে বড় সুবিধা আমরা নিরাপদে কাজ করতে পারব।

কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই গ্রামের কেন্দ্রস্থল শহরে রূপান্তরিত হবে। তাতে যেমন ব্যয় হবে তেমনি শহর গঠনে নানা সমস্যারও উদ্ভব হবে।

তাও স্বীকার করি কিন্তু শত্রু যাতে আমাদের ওপর হামলা করে আমাদের প্রশাসন যন্ত্র ভেঙ্গে দিতে না পারে সেজন্য গ্রামেই কেন্দ্রস্থল করা সঙ্গত। সর্বপ্রথম দেখতে হবে আমাদের নিরাপত্তা, সেটা শহরে সম্ভব নয়।

লি চৌ-এর যুক্তি মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দিল, নিরাপদ অঞ্চলে প্রশাসন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ শহর এলাকা বাদ দিয়েই কাজ করতে হবে।

অবশেষে চৌ-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে নভেম্বর মাসে ঘোষণা করা হল চীন প্রজাতন্ত্র। আর তা পরিচালনা করতে তেষট্টিজন সদস্যসহ একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটি গঠন করা হল।

এই কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটিতে মাও স্থান পেল না। অবশ্য কেন্দ্রীয় পরিচালক কমিটি আবার জনতার কমিশার কমিটি গঠন করে

মাওকে তার চেয়ারম্যান মনোনীত করল, তার সহকারী হল হেসিয়াং ইং ও চ্যাং কুয়ো-তাও। এর ফলে সরকারের ওপর মাওয়ের সাক্ষাৎ ভাবে কোন প্রভাব আর রইল না।

মাওয়ের কার্যাবলী অনেকেই পছন্দ করত না। বিশেষ করে মাওয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে অনেকেই সহ্য করতে পারত না। সেজন্য সামরিক বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রেও মাওয়ের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টায় ছিল অনেকেই।

সমালোচনার সম্মুখীন হল মাও।

হেসিয়াং, চ্যাং, চৌ সবাই বলল, সামরিক বাহিনীতে যে সব ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে তার জন্য মাও সর্বতোভাবে দায়ী।

মাও বলল, সামরিক বাহিনীর ক্রুটি-বিচ্যুতি আমার ক্রুটির জন্য নয় আমাদের resource-এর অভাবজনিত কারণেই তা হচ্ছে। যতদিন আমরা resource না পাব ততদিন এর সমাধান সম্ভব নয়।

হেসিয়াং বলল, যারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা তাদের রাজনৈতিক কোন ট্রেনিং নেই। ভাড়াটিয়া সৈন্যদের মত তারা যুদ্ধ করছে। এই ভাবে আমরা সর্বহারা একনায়কত্বে উপস্থিত হতে পারব কিনা সন্দেহ।

মাও ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলল, আমাদের বাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধা জানে কেন তারা যুদ্ধ করতে এসেছে, কি তাদের প্রয়োজন, কতদূর আমরা অগ্রসর হতে পারি। তোমাদের অভিযোগ আমি স্বীকার করিনা।

চ্যাং বলল, ওটা বাদ দিয়ে আমি বলতে চাইছি তোমার গোরিলা যুদ্ধের বর্তমান পদ্ধতি জয়লাভের সহায়ক নয়। তুমি গোরিলা যুদ্ধকে যত বেশি মূল্য দিতে চাও অতটা মূল্য বোধহয় তাদের প্রাপ্য নয়।

যে বর্তমান ব্যবস্থা আমি চালু রেখেছি, পরিবেশ অনুসারে তার বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।

চৌ বলল, আমরা বিভিন্ন প্রদেশে যে সব অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেছি সে সব এলাকাকে কিয়াংসির সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। তুমি

তার প্রতিবাদ করে আসছ আগাগোড়া। এতে আমাদের নীতি ব্যাহত হচ্ছে না কি ?

মাও বলল, আমরা যেটুকু পেয়েছি তাকে যতদিন শক্তিশালী না করতে পারি ততদিন অন্য কোন দুর্বল অঞ্চলকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করলে কোনটাই রক্ষা করতে পারব না। এতে আমাদের উভয় কূলই নষ্ট হবে।

আমরা বিশ্বাস করিনা তোমার এই যুক্তিকে। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে মুক্তিযুদ্ধ অগ্রসর হতে পারবে না। আমাদের মনে হয় তোমার নীতি মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী।

মাও বেশ বুঝতে পারল তার কাজ সমর্থন করছে না কেন্দ্রীয় কমিটি। সেজন্য তার হাত থেকে সকল ক্ষমতা তুলে নিতে চেষ্টা করা হচ্ছে। মাও আর প্রতিবাদ করল না।

কিছুকালের মধ্যেই মাওয়ের হাতে যে সামরিক ক্ষমতা ছিল তা চলে গেল চৌ এন-লাইয়ের এক্তিয়ারে। লাল ফৌজের অধিনায়ক হল চৌ।

তিরিশ সালে কম্যুনিষ্টরা চ্যাংসা ও নানচাং আক্রমণ করার পর কুয়োমিনটাং সরকারও সতর্ক হল ও প্রস্তুত হল কম্যুনিষ্টদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে বাধা দিতে। কুয়োমিনটাং নেতারা স্থির করল চতুর্দিক থেকে কম্যুনিষ্টদের ঘেরাও করতে হবে এবং তাদের নির্মূল করতে হবে (Encirclement and Annihilation) ; তার জন্য তাদের ঘরোয়া বিবাদ রফা করে সর্বশক্তি নিয়োগ করল কম্যুনিষ্ট বিতাড়ণে। তিরিশ সালের ডিসেম্বর থেকেই পরিকল্পনা অনুসারে কুয়োমিনটাং বাহিনী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এই সময় মাওয়ের অধিনায়কত্ব হাত বদল হল। মাওয়ের প্রাধান্যও হ্রাস পেল লাল ফৌজের ওপর। ঠিক সেই সময় কুয়োমিনটাং বিপুল শক্তি নিয়ে কিয়াংসি আক্রমণ করল। কুয়োমিনটাং-এর এই আক্রমণের সামনে বিপন্ন হল মুক্তিফৌজ। তাদেরও

আত্মরক্ষার কৌশল বদলে কিয়াংসিকে রক্ষা করতে সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত হল। এই সময় মাও এবং চু টে তাদের দূরদর্শিতা ও সামরিক বুদ্ধির প্রাখর্যে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল মুক্তি ফৌজকে। চিং কাংসানে যখন মাও সামরিক কর্মকেন্দ্র করেছিল তখনই মাও এবং চু টে এই কৌশল সম্বন্ধে মনস্থির করে কৌশল প্রয়োগের অপেক্ষা করছিল। কুয়োমিনটাং পর পর তিনবার ঘেরাও ও নির্মূলের যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা ব্যর্থ করে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা এবং অধিকৃত কিয়াংসি অঞ্চলে কুয়োমিনটাং ফৌজ আর এর পর প্রবেশ করার সাহস পায়নি। গোরিলা যুদ্ধে নব উদ্ভাবিত নীতির জন্য জয় হয়েছিল এই সব যুদ্ধে।

মাও ধীর মস্তিষ্কে চৌ এন-লাইয়ের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। মাও কোন সময়ই রাজনীতি থেকে গোরিলা যুদ্ধ আলাদা করে দেখেনি।

চিয়াং-এর ঘেরাও ও নির্মূলের অভিযান আরম্ভ হতেই মাও যুদ্ধের নতুন কৌশল অবলম্বন করল। মাও ছোট ছোট দলে আলাদা আলাদা ভাবে 'ঘেরাও ও দমন' এই কৌশল গ্রহণ করল। এই ভাবে অল্প সৈন্য নিয়ে শক্তিশালী শত্রুকে ঘায়েল করার ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করল। ছোট ছোট দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে মুক্তি যোদ্ধারা চিয়াং বাহিনীকে ঘেরাও ও দমন আরম্ভ করল। মাও এই পদ্ধতিকে বলল, encirclement and supression within 'encirclement and supression' blockade within 'blockade', the offensive with defensive—মাওয়ের এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী চিয়াং বাহিনী ক্রমাগত পরাজিত হতে থাকে। চীনের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পক্ষ সামরিক সংগঠনের বিচারে ছিল দুর্বল অথচ সামান্য শক্তি নিয়ে শক্তিশালী চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে জয়লাভ একটা বিস্ময়কর ঘটনা। সমগ্র পৃথিবী এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল।

চিরকাল সামরিক শক্তিতে যারা শ্রেষ্ঠ তারা বৃহৎ বাহিনী নিয়ে

ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দমন করে, এখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাহিনী বৃহৎ সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করছে, এটা অস্বাভাবিক মনে হলেও, এই ঘটনাই ঘটেছিল চীনে। মুক্তিফৌজ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করেই শত্রুকে পরাজিত করেছে সর্বক্ষেত্রে।

মাও বলেছিল, গোপনীয়তা হল আমাদের মূলমন্ত্র। আমরা যা করব তা শত্রু মোটেই জানতে পারবে না। শত্রু যখন থাকবে অপ্রস্তুত অথবা ভ্রান্ত পথগামী তখনই আক্রমণকে জোরদার করতে হবে।

লালফৌজ কি করবে কোথায় যাবে তা কাউকেই জানতে দিত না মাও।

মাও বলত, শত্রু এগিয়ে এলে আমরা পিছিয়ে যাব। শত্রু শিবির স্থাপন করলে আমরা তাদের উত্যক্ত করব, শত্রু ক্লান্ত হলে আমরা আক্রমণ করব, শত্রু পিছিয়ে গেলে তাদের পেছন ধাওয়া করব।

এই মূলমন্ত্র মাও তুলে ধরেছিল লালফৌজের সম্মুখে। আর এই কৌশল অবলম্বন করেই মাও এবং চু টে প্রথম চিয়াং বাহিনীর অভিযানকে নিষ্ফল করেছিল। মাও তার বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে শত্রুকে এগিয়ে আসতে দিয়েছে। যখন তার নিজ এলাকায় শত্রু ঢুকে পড়েছে তখন চতুর্দিক থেকে encirclement within encirclement নীতিতে শত্রু ঘেরাও করেছে আলাদা আলাদা ভাবে ছোট ছোট দল উপদলের সাহায্যে।

কিন্তু যে সব ছাত্র বিদেশ থেকে এসে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল এবং যে সব স্থানীয় ছাত্র এগিয়ে এসেছিল মুক্তিযুদ্ধে তারা মাওয়ের গোরিলা যুদ্ধকে সমর্থন করতে পারেনি। তারা প্রাক্তন ছাত্রদের প্রভুত্ব বিস্তারে সবিশেষ আগ্রহী এবং তাদের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এল চিন প্যাং-সিয়েন ও চৌ এন-লাই। কম্যুনিষ্ট শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে ইতিমধ্যেই। হাজার হাজার লোক এসে যোগ দিয়েছে কম্যুনিষ্ট লালফৌজে।

চৌ এন-লাই বলল, এখন যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি বদল করতে হবে।

মাও বলল, তাতে আমাদের অসুবিধা হবে। আর কেনই বা করব।

চৌ বলল, আমরা একটা বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী। বহু প্রদেশ এখন আমাদের হস্তগত হয়েছে। মুখ্যত আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করি। আমরা এখন কুয়োমিনটাংকে অপর একটি রাষ্ট্র মনে করে বিভিন্ন ফ্রন্টে মুখোমুখি আক্রমণ করলে বেশি ফললাভ হবে।

মাও কিছুতেই এই নতুন নীতি সমর্থন করতে পারল না। পুরাতন নীতিকে বহাল রেখেই মাও এগোতে থাকে। সঙ্গীদের বলল, আমরা যে চিয়াং-এর প্রথম অভিযান ব্যর্থ করেছি তা সম্ভব হয়েছে পুরাতন নীতিকে অবলম্বন করে।

প্রথম অভিযানের দায়িত্ব দিয়েছিল চিয়াং তার বিশ্বস্ত সমর নেতা জেনারেল চ্যাং হুই-স্তনকে। চ্যাং তিন ডিভিসন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল।

চ্যাং ভাবতেও পারেনি লালফৌজকে ঘেরাও ও নির্মূল করতে এসে তার মূল শিবির ঘেরাও হবে এবং তার এক ডিভিসন সৈন্য বন্দী হবে, সঙ্গে সে নিজেও বন্দী হবে।

মাও তার পুরাতন কৌশলে শত্রুকে ঘেরাও করে ধীরে ধীরে অতর্কিতে চ্যাং-এর প্রধান কার্যালয় দখল করল, বন্দী করল চ্যাংকে ও তার নয় হাজার সৈন্যকে।

নেতার এই বিপর্যয় দেখে অপর দুটো ডিভিসন পালাতে আরম্ভ করল। মাও বাহিনী একটি ডিভিসনকে ধাওয়া করে অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস তো করলই, তাদের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রও দখল করল।

গণ-আদালতে বিচার হল জেনারেল চ্যাং-এর। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হল।

এই ভাবেই চিয়াংয়ের প্রথম অভিযান ব্যর্থ হল। প্রমাণিত হল মাওয়ের নীতির সার্থকতা। দ্বিতীয় অভিযান আরও গুরুতর। এই অভিযানের বিরুদ্ধে লালফৌজের অভিযান আরও বেশি বিস্ময়কর।

টংকুর শিবিরে লালফৌজ অপেক্ষা করছে।

এপ্রিল মাস কেটে গেল, মে মাসের কয়েক দিন পেরিয়ে গেছে।

বাহিনীর নেতারা বলল, শত্রুরা আমাদের অবস্থান জানতে পারবে।

মাও বলল, আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার নীতি বানচাল যেন না হয়।

প্রাক্তন ছাত্রদের নেতারা বলল, এখন আক্রমণ করা উচিত।

মাও বলল, না। আমাদের বাহিনীতে রয়েছে মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য আর চিয়াং বাহিনীর এই অভিযানে রয়েছে দু লক্ষ সৈন্য। তাদের কাছে যে অস্ত্র আছে তার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করলেই আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। এই অবস্থায় আমাদের দেখতে হবে শত্রুর দুর্বল অংশ কোথায়।

চিন প্যাং-সিয়েন বলল, আমাদের শক্ত ঘাঁটি ফুতিয়েন দখল করে শত্রু শক্তি বৃদ্ধি করছে।

যে কোন উপায়ে শত্রুকে ঐ শক্ত ঘাঁটির বাইরে নিয়ে আসতেই হবে। ওদের জয়ের লোভ দেখিয়ে টেনে বের করতে হবে। আমাদের একদল সৈন্যকে mock fight-এ পাঠাও। তারা যুদ্ধের অভিনয় করে পালাবে। শত্রুরা তার পেছু নেবে এবং ফুতিয়েন ছেড়ে এগিয়ে আসবে।

মাওয়ের নির্দেশ মত কাজ করার পরই জেনারেল ওয়াং চিন-ফু তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফুতিয়েনের শক্ত ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল লালফৌজকে নির্মূল করতে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। মাও আদেশ দিল চারিদিক থেকে আক্রমণ করার। ফুতিয়েনের অনতিদূরে প্রচণ্ড লড়াই হল। সেই লড়াইতে এগার রেজিমেন্ট চিয়াং সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কিন্তু!

মাও সতর্ক ছিল। তিন চার মাইল দূরে কুয়োমিনটাংয়ের আরেক ডিভিসন সৈন্য অপেক্ষা করছিল। আরও কিছু দূরে সা তিং-কাইয়ের উনিশ নম্বর বাহিনীও অপেক্ষা করছিল। তাদের কাছে জেনারেল

ওয়াংয়ের এই পরাজয় সংবাদ পৌঁছল না। যদি সময় মত সংবাদ পৌঁছত তা হলে এরা সাহায্য করতে পারত। তাতে যুদ্ধের চিত্র হয়ত অন্যরূপ হতো কিন্তু মাওয়ের কৌশলে সে সংবাদ পৌঁছল না। যখন সংবাদ পৌঁছল তখন লালফৌজ নিরাপদ এলাকায়। চিয়াং বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঘেরাও ও নির্মূলের নীতি নিলেও লালফৌজ দিনের বেলাতেই অগ্রসর হতো। জেনারেল ওয়াংয়ের পতন ঘটতেই লালফৌজ বেছে বেছে চিয়াং বাহিনীর দুর্বল স্থানে আঘাত করতে লাগল। দুর্বল স্থানে আঘাত করতে পনর দিনে লালফৌজকে সাত শ' লি * দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই সাত শ' লি অতিক্রম করতে পাঁচটি ক্ষেত্রে লালফৌজ আক্রমণ করেছিল চিয়াং বাহিনীকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রমণ সাফল্যলাভ করেছিল। এই দ্বিতীয় অভিযানকে বিফল করে মাও বিশ হাজার রাইফেল পেয়েছিল শত্রুর কাছ থেকে। মুক্তিফৌজের শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছিল এই ভাবে।

এই যুদ্ধ জয়ের পর মাও কবিতা লিখল ঃ

শ্বেত মেঘাবৃত পর্বত শিখরে মেঘমালা পথ করছে,
এই পর্বতের নীচে আরও বেপরোয়া ক্রন্দন শোনা যায়,
শুকনো কাঠ আর রসহীন গাছ একত্র হয়েছে সংগ্রাম করতে,
আর সামনে ছুটে আসছে হাজার হাজার রাইফেল, যেন ঘন বনের মত।
আর যোদ্ধারা ও তাদের নেতারা যারা পালিয়েছিল তারা আঘাত হানল,
আঘাত করল যুদ্ধের বিপক্ষদের।

* * *

এই মেঘমালা হল লালফৌজের দুরন্ত আক্রমণ। এরা কুয়োমিনটাং-এর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ। বিক্ষোভ তাদের আকাশ চুম্বন করতে ছুটছে। শুকনো কাঠ আর রসহীন বৃক্ষ হল চিয়াংয়ের বাহিনী যার কোন নীতি

* এক লি পথ এক মাইলের তিন ভাগের এক ভাগের সমান। ১ লি = ⅓ মাইল।

নেই, আদর্শ নেই, শুধু মাত্র ভাড়াটিয়া পেশাদারী সৈন্য। আর তাদের বিরুদ্ধে ছুটে চলেছে লালফৌজ।

মাও তার কৌশলকে তুলে ধরল তার বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে। যুদ্ধ ও গোরিলাযুদ্ধ যে কত বেশী সাফল্য লাভ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখল সবাই। মুখোমুখি যুদ্ধে কোনক্রমেই দুর্বল লালফৌজ শক্তিশালী চিয়াং ফৌজকে পরাজিত করতে পারত না।

কুয়োমিনটাং তার দুর্বলতা জানতে পারল। তারাও যুদ্ধের কৌশল বদল করতে থাকে। তৃতীয় অভিযান আরম্ভ করার আগেই সৈন্যবাহিনীতে নানা রকম পরিবর্তন করল মাও। চিয়াং স্বয়ং এল নানচাং-এ, নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নিল। তার নিজস্ব বাহিনীর দশ লক্ষ সৈন্যকে নিযুক্ত করল লালফৌজ নিধনে।

পূর্ববর্তী দুটি অভিযানকে ব্যর্থ করলেও এবার লালফৌজকে আরও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হল।

মাও তৎকালের অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছিল, চিয়াং তার বাহিনীকে সব রকমে শক্তিশালী করেছিল। তার নিজস্ব দলের লক্ষ সৈন্যকে ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। বাম, দক্ষিণ ও কেন্দ্র—এই তিন ভাগে বিভক্ত করল এই বাহিনীকে। কেন্দ্রকে দেওয়া হল জেনারেল হো ইং-চিনকে। হো তার কর্মকেন্দ্র করল নানচাং-এ। দক্ষিণ বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল চেন মেং-সু তার কর্মকেন্দ্র করল কিয়ানে আর বামকেন্দ্র স্থাপিত হল নানফেং-এ, দায়িত্ব পেল জেনারেল টু সাও-নিয়াং।

দশ লক্ষ সৈন্যের তিন লক্ষ অগ্রগামী সেনা। পাঁচজন জেনারেলের হাতে দেওয়া হল পাঁচটা ডিভিসনের দায়িত্ব। এদের সঙ্গে রইল আরও তিনটি ডিভিসন এবং কতকগুলো সাহায্যকারী বাহিনী তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল লালফৌজকে সোজাসুজি আক্রমণ করে ঠেলতে ঠেলতে কান নদীর পাশে আটক করা ও সেখানে তাদের নির্মূল করা।

চিয়াং-এর দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হওয়ার একমাসের মধ্যেই তৃতীয় অভিযান আরম্ভ হল। লালফৌজে তখন মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য। তারা হাজার লি পরিক্রমা করে খুবই ক্লান্ত। তারা সবেমাত্র হেসিং কুয়োতে বিশ্রাম নেবার জন্য জমায়েত হয়েছে এমন সময় চিয়াং বাহিনীর আক্রমণ সুরু হল।

চিয়াং-এর তৃতীয় অভিযানের বর্ণনা মাও নিজেই দিয়েছে।

এই যুদ্ধের ফলাফল যে কি হতো তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরল অন্য কারণে। অবশ্য অগ্রগামী ঘাঁটি আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা পর পর কতকগুলো যুদ্ধে চিয়াংবাহিনীকে পরাজিত করলেও চিয়াং-এর মূল বাহিনী তখনও অক্ষত ছিল। দশ লক্ষ সৈন্য তখন প্রস্তুত। হয়ত লালফৌজের দুর্ভাগ্য দেখা দিত মূল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এমন সময় সংবাদ এল জাপান মুকদেন আক্রমণ করেছে। মানচুরিয়া দখলের জন্য জাপান তৎপর।

চিয়াং তখন কোন দিকে দৃষ্টি দেবে ঠিক করতে পারছিল না। একদিকে শক্তিশালী জাপান অপর দিকে গৃহযুদ্ধ। এমত অবস্থায় চিয়াং বহিশত্রুকে বাধা দিতে এগিয়ে গেল। কম্যুনিষ্ট দমন তখনকার মত বন্ধ রাখতে হল। চিয়াং-এর পক্ষে উভয়দিক রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। চিয়াং পদত্যাগ করল একত্রিশ সালের অকটোবর মাসে।

বত্রিশ সালের জানুয়ারীতে চিয়াং আবার ক্ষমতায় ফিরে এল, এবার সে জেনারেলোসিমিও। আর জাপানের এই আক্রমণ যদি চিয়াংকে কম্যুনিষ্ট দমন থেকে বিরত না করত তা হলে লালফৌজের অবস্থা যে কি হতো তা অনুমান করা সম্ভব নয়, তবে তাদের অনুকূলে হতো না বলেই মনে হয়। মাও সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। মাও, কেন্দ্রীয় কমিটি, ইন্টারন্যাশনাল সবাই বলল, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার চেয়ে স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন-টাং-এর উচ্ছেদ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সে সময় কম্যুনিষ্ট পার্টি অথবা কুয়োমিনটাং সম্মিলিতভাবে জাপানকে বাধা দেবার চিন্তাও করেনি।

চিয়াং একাই তার সৈন্য নিয়ে বাধা দিতে লাগল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের, কম্যুনিষ্টরা তখন তাদের শক্তি সংহত ও অঞ্চল অধিকার করে ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে বেশি সচেষ্ট।

কিন্তু মাও যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাতে ভাটা পড়ল। অবশ্য তখনও সে চীনা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান। তার বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকলেও সরকার ও সমর বিভাগে তার ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তবুও তাকে স্বাধীনভাবে সব কথা বলতে দেওয়া হতো। প্রাক্তন ছাত্র যারা পার্টিতে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রাধান্য দেখা দিল সরকার ও সামরিক বিভাগে।

চৌ এন-লাই বলত, মাওয়ের গোরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি হল অতি সেকেলে ব্যাপার।

চিন পাং-সিয়েন সমর্থন করে বলল, নিশ্চয়। মাওকে যদি সামরিক ক্ষমতায় রাখা যায় তাতে আমাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

চৌ বলল, মাও হল চাষার ছেলে, চাষীদের সঙ্গে ওর ভাব বেশি।

চিন বলল, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

কি প্রস্তাব ?

মাওকে কৃষক আন্দোলনে ও কৃষক সংগঠনে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়।

মন্দ নয়। এতে কৃষকদের সংগঠন শক্তিশালী হবে। এ-প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে উত্থাপন করতে চাই। তুমি সমর্থন জানাতে ভুল করো না।

মাও ভূমি সংস্কার নিয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা অগ্রাহ্য করতে পারল না নতুন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। অর্থবান কৃষকদের কিছুটা নীরস জমি দেওয়া হল, যারা জমিদার তাদের কোন জমি দেওয়া হল না। মধ্য শ্রেণীর চাষীদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হল না, তাদের যেমন অবস্থা ছিল তেমনি রইল।

কিন্তু মাও এই ভূমি সংস্কারের মাঝেই নিজেকে আটকে রাখতে

পারেনি। শ্রেণী সংগ্রাম দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিও তার উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য কোনটাকেই কম মূল্যবান বলে মনে করত না।

মাওয়ের যুদ্ধ কৌশলকে সমর্থন করতে পারেনি কেন্দ্রীয় কমিটি। যদিও প্রথম তিনটি চিয়াং অভিযানকে পরাভূত করা গেছে মাও প্রদর্শিত কৌশলে।

সমর্থন না করার কারণ স্বরূপ বিপক্ষ দল বলল, শত্রুকে সোভিয়েত এলাকায় এনে লালফৌজের সুবিধা মত আক্রমণ করে ধ্বংস করার সঙ্গে আরও একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। মুক্ত এলাকার মানুষরা এই সময় নানা রকম কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত যুদ্ধকে শান্তিপূর্ণ এলাকায় ডেকে আনার কোন যৌক্তিকতা নেই। তার চেয়ে চিয়াং বাহিনীকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করাই উচিত। আমরা যদি আমাদের নাগরিকদের শান্তিতে থাকতে দিতে না পারি তা হলে মুক্ত এলাকার ওপর লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকবে না। তাদের যদি বার বার অশান্তি ও কষ্টের মধ্যে থাকতে হয় তা হলে মুক্ত এলাকায় কোন কাজই করা সম্ভব হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে "We are not inclined to tolerate Mao's flexible guerrilla tacties of 'lurning the enemy deep' into Soviet—"

কিন্তু মাওয়ের কৌশল পরিত্যাগ করে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে গিয়ে কিয়াংসিতে মুক্তিফৌজের পরাজয় ঘটল। কিয়াংসিতে যে কম্যুনিষ্ট ঘাঁটি ছিল তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এই পরাজয় যে কি কারণে হয়েছে তা স্বীকার না করলেও মাও কখনও এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেনি, যদিও সে জানত তার নীতি পরিহার করাই হল এই পরাজয়ের কারণ। মাও মনে করত কম্যুনিষ্টদের পক্ষে সব চেয়ে মূল্যবান কাজ হল আত্মরক্ষা করে অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং সুযোগ বুঝে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা ও অঞ্চল মুক্ত করা। সব সময় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে চলাই হল বড় নীতি।

তেত্রিশ-চৌত্রিশ সালে মাও যে সব অভিমত দিয়েছে তা গ্রহণ করা হয়নি।

লো মিং ফুকিয়েন প্রাদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী। চিয়াং যখন চতুর্থ অভিযান আরম্ভ করল লো তখন মাওয়ের নীতি অবলম্বন করেই এই অভিযান ব্যর্থ করে দেয়।

চিয়াং-এর চতুর্থ অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরই একই দেশে দুটি আলাদা সরকারের অস্তিত্ব চীনকে নতুন পথে টেনে নিয়ে চলল।

ছত্রিশ সালে যে ক্রমান্বয় সাফল্যলাভ করতে থাকে মাও তার পেছনে ছিল তার রণনীতি। তেত্রিশ-চৌত্রিশ সালে যারা তার রণনীতি মূল্যহীন মনে করেছিল তাদের কাছেই অমূল্য মনে হল মাওয়ের এই নীতি। মাওকে লো সমর্থন জানিয়েছিল, মাওয়ের পন্থায় লো যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কিন্তু তার কাজকে সমর্থন করেনি ওয়াং, চিন, চৌ প্রভৃতি নবাগত প্রাক্তন ছাত্রের দল। তারা সব সময়ই লো এবং মাওয়ের কাজের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং গোরিলা যুদ্ধকে সব সময়ই ছোট করে দেখতে চেয়েছে।

অবশ্য পরবর্তীকালে চীন বিপ্লবের যারা ইতিহাস লিখেছে তারা লো'র কাজকে উচ্চ প্রশংসা করেছে, বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ্ বলে তাকে সম্মান করেছে।

পঁয়ত্রিশ সালে মাও তার ভাই সে-তানকে হারাল। তখনও বাকি রইল তার অপর ভাই সে-নিন। মাওকে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পর পর স্ত্রী, ভগ্নী ও ভাইকে হারাতে হয়েছে কিন্তু তাতেও তার মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি।

জাপানের আক্রমণে চীন বিপর্যস্ত।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সভায় জাপানের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের আলোচনায় মাও বলল, আমাদের লক্ষ্য ছিল

কুয়োমিনটাংকে উচ্ছেদ করে জাপানের বিরুদ্ধে লড়ব। বর্তমানে জাপান যে ভাবে চীনের অভ্যন্তরে ঢুকছে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চৌ বলল, আমাদের সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ রোধ করতে হবে।

তাহলে কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে করতে হয়,—বলল ওয়াং।

মাও বলল, তাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয় অবশ্য যদি কুয়োমিনটাং আমাদের নেতৃত্বে এই সক্রিয় ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব দিতে রাজি থাকে।

চৌ বলল, না, আরও কিছু দরকার। কুয়োমিনটাং আমাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে তা বন্ধ করতে হবে, কুয়োমিনটাং-এর অধীনস্থ এলাকার নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে, আর জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে জাপানকে রুখতে।

সাই তিং কাই ছিল ফুকিয়েনের জাপান তথা চিয়াং বিরোধী বিপ্লবী জনগণের সরকারের প্রধান। সাইয়ের কৃতিত্ব সাংঘাই রক্ষার জন্য অবিস্মরণীয় যুদ্ধ পরিচালনা। সাই জাপানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার বিরোধী। চিয়াং জাপানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়াতে সাই চিয়াং-এর ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কম্যুনিষ্ট পরিচালিত চীনা সোভিয়েতের সরকার সাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করল তেত্রিশ সালে।

ফুকিয়েনের বিরুদ্ধে চিয়াং অভিযান সুরু করল। সাইয়ের উনিশ নম্বর বাহিনীও বিদ্রোহ করল।

সাই পরাজিত হল তবুও লাল ফৌজ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

মাও তখন ক্ষমতাহারা। তবুও ফুকিয়েনকে সাহায্য না করার নীতিকে অন্যায় বলে প্রতিবাদ জানাতে মোটেই ত্রুটি করল না। অবশ্য কোন ক্রমেই মাও ফুকিয়েনের সাই গভর্ণমেন্টকে গতিশীল বলে স্বীকার করেনি।

ফুকিয়েনে সাই যে সরকার গঠন করেছিল তা শুধু জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবার জন্য। আসলে এই সরকার ছিল ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীল। সাইয়ের উনিশ নম্বর বাহিনী বিদ্রোহ করাকে মাও সমর্থন করেছিল এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সাহায্য না করাকে অন্যায় মনে করেছিল।

অনেকেই তখন মনে করত চিয়াং-এর কুয়োমিনটাং-এর দিন শেষ হয়ে এসেছে, আর অজেয় লালফৌজ যে কোন অবস্থায় চিয়াংকে বাধা দিতে সক্ষম। মাও নিজেও এই অভিমত পোষণ করতো। কিন্তু কোন সময়ই অসতর্কভাবে কোন কাজে অগ্রসর হতো না। নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও তার জন্য হঠকারিতার পক্ষপাতী ছিল না।

চীন মুক্তি যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থা উপস্থিত।

চৌত্রিশ সালের পয়লা আগষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিল চীন মুক্তি ফৌজকে উত্তর অভিযানে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই উত্তর অভিযানই লঙ্ মার্চ নামে খ্যাত হয়েছে পরবর্তী কালে।

* এই অভিযানের পরিকল্পনায় মাওয়ের কি যে ভূমিকা ছিল তা আজও জানা যায়নি।

চিংকাংশানের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল হেসিয়াও কি। তাকে হো লুঙ্ আদেশ পাঠাল হুনান—কিউচাও সীমান্তে তার সঙ্গে যোগ দিতে। উভয় দল একত্রিত হয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট গঠন করল। হো রইল সামরিক বিষয়ে অধিকর্তা আর জেন পি-শি রইল রাজনৈতিক বিষয়ে অধিকর্তা।

অকটোবরের পনর তারিখে লালফৌজ কুচকাওয়াজ আরম্ভ করল।

---

* অনেকে বলে, মাওকে এই সময় কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছিল সেজন্য মাওকে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আরও জানা যায় যে এই সময় মাওকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। জুইচিনের পঞ্চাশ মাইল দূরে যুতু নামক স্থানে মাওকে নজরবন্দী করে রাখা হয় একটি গৃহে। সে সময় মাও ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিল প্রায় দুই মাস।

লালফৌজ তখন চতুর্দিক থেকে চিয়াং বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত। এই সম্মিলিত বাহিনী চিয়াং সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করল, এগিয়ে চলল উত্তর দিকে কোয়াংটুং আর দক্ষিণ দিকে হুনানের দিকে।

কোথায় চলল এই এক লক্ষ মুক্তি পাগল মানুষ।

কোন স্থিরতা নেই।

পঁচাশি হাজার সৈন্য, পনর হাজার রাজনৈতিক কর্মী এগিয়ে চলেছে। উত্তরে জাপানী আক্রমণ চলছে, তাদের প্রতিরোধ করতে বুঝি ছুটছে তারা অথবা নিজেদের নিরাপত্তার দরকার। যদি জাপানকে রুখতে হয় তা হলে আরও আরও উত্তরে যেতে হবে, আর যদি নিরাপত্তার প্রশ্ন থাকে তাহলে তারা তো সেঝিচুয়ানে ঘাঁটি করতে পারত। সেঝিচুয়ান তখন বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। চিয়াংয়ের চতুর্থ অভিযানের পর চ্যাং কুয়ো-তাও হোপেই-হুনান-আনহুই থেকে বিতাড়িত হয়ে এই দূর প্রদেশে নিজের স্থান গড়ে নিয়েছে। ভবিষ্যতে চিয়াং আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছে।

মাও চেয়েছিল জাপানকে রুখতে। জাতি হিসেবে চীনের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। কিন্তু মাও তখনও পর্দার পেছনে। তার মতামত শোনার মত লোক তখন ছিল না।

এই বিরাট বাহিনীকে পরিচালনা করছিল জেনারেল চু টে আর তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিল চৌ এন-লাই। তাদের সাহায্য করছিল একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ। পরবর্তী কালে এই জার্মান বিশেষজ্ঞ অটো ব্রাউন চীন দেশে লি তে নামে খ্যাত হয়েছিল। ব্রাউন চিয়াংয়ের পঞ্চম অভিযানকে বাধা দেবার সময় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেও তার মুখোমুখি যুদ্ধের পরিকল্পনায় অনেক কম্যুনিষ্ট বাহিনীর ক্ষয় ক্ষতিও হয়েছিল।

তবে ব্রাউন সব সময় অধিক শক্তিশালী ফৌজ নিয়েই মুখোমুখি যুদ্ধ চেয়েছে।

কিন্তু হেসিয়াং নদীর তীরে যে যুদ্ধ তাতেই মুখোমুখি যুদ্ধের

পরিকল্পনা যে ভুল তা বুঝতে পারল সবাই। উত্তর কিংয়াসিতে হেসিয়াং নদী অতিক্রম করার আগেই চিয়াং বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হল তাতে লালফৌজের অর্ধেক বিনষ্ট হল। কোনক্রমে অপর অর্ধেক নিয়ে নেতারা নদী অতিক্রম করল। এক সপ্তাহ যাবত এই যুদ্ধের ফলাফল অতীব দুঃখজনক মনে করল সকল নেতা।

মাও প্রস্তাব করল, আমাদের উত্তর অভিযান পরিত্যাগ করতে হবে।

কেন? কেন?

উত্তরে শত্রুরা অত্যধিক শক্তিশালী। মুখোমুখি লড়াইতে কোন ক্রমেই আমরা জয়লাভ করতে পারব না। হেসিয়াং নদীর তীরে এই জনক্ষয়ী যুদ্ধে আমরা যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তার তুলনা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে রণনীতি বদল করাই শ্রেয়ঃ।

তা হলে কোন পথে আমরা অগ্রসর হব?

পশ্চিম দিকে। আমরা কিউচাও প্রদেশ আক্রমণ করব। চিয়াংয়ের যুদ্ধ ব্যবস্থা মোটেই শক্তিশালী নয় এই এলাকায়। আমরা কঠিন আঘাত হানব। তাতে জয় অনিবার্য। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে শত্রুর দুর্বল এলাকা দখল হল বুদ্ধিমত্তার কাজ।

সামনে নদী।

জানি। এই য়ু নদী পার হতেই হবে। মধ্য কিউ চাওকে দখল করতে পারলে গোটা প্রদেশ আমাদের হস্তগত হবে।

সবাই বলল, বেশ অগ্রসর হও।

বছরের শেষে লালফৌজ আবার কুচকাওয়াজ শুরু করল। নদীর ঘাটে এসেই বাধা পেল, তাদের আগমন সংবাদ পেয়েই চিয়াংয়ের নদীতীর রক্ষীরা অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল। নদী অতিক্রম করা তখন যেন দুঃসাধ্য ব্যাপার। আত্মগোপন করে লাল বাহিনী নদী অতিক্রম করার উপায় খুঁজছিল।

এমন সময় এগিয়ে এল একদল বেপরোয়া সৈনিক। তারা বলল, আমরা নদী পার হয়ে কুয়োমিনটাং-এর দুর্গ আক্রমণ করব। তোমরা সেই

অবসরে নদী অতিক্রম করে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

- কিন্তু নদী পার হবে কি করে?

ভেলা তৈরী করে দাও। নৌকা নেই, লঞ্চ নেই, জাহাজ নেই, এই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদী পার হবার আর তো কোম উপায় নেই। রাতের বেলায় ভেলায় করে পার হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নেই।

বন থেকে কাঠ ও বাঁশ এনে ভেলা তৈরী হল।

রাতের বেলায় দলে উপদলে ভাগ হয়ে গোরিলা বেপরোয়া সৈন্যরা অতিক্রম করল য়ু নদী। শত্রুরা বসে ছিল না। তাদের কামান গর্জন করে উঠল। আগুন বৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যেই নদী পার হয়ে লালফৌজের এই বেপরোয়া যোদ্ধাদের অনেকেই আক্রমণ করল কুয়ো- মিনটাং-এর দুর্গ। নদীর ঘাট যারা পাহারা দিচ্ছিল তারাও শেষশয্যা গ্রহণ করল সবার আগে। নদী পার হবার আর কোন বাধাই রইল না।

শহর সুন্যাই দখল করল লালফৌজ বিনা যুদ্ধে। শহর দখল করেই এখানে সভা বসল পোলিটব্যুরোর। এই সভায় চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বাধিনায়ক মনোনীত হল মাও সে-তুং। এতকাল মাও সে-তুং ছিল পর্দার আড়ালে। নেতৃত্বের হাত বদল করেও তার রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে হার মানাতে কেউ পারেনি। তার পরিকল্পনার জয় দেখে সবাই মাওয়ের ওপর তখন শ্রদ্ধাশীল, তারা বিনা প্রতিবাদে মাও সে-তুং-কে পার্টির সকল দায়িত্ব বহনের ভার অর্পণ করল।

অদ্যাবধি পার্টির যে সব ভুল ভ্রান্তি ছিল তা সংশোধন করতে পার্টি তখন উৎসুক। এতকাল লালফৌজের সঙ্গে চলত তাদের রাজকোষ, প্রশাসন ব্যবস্থা, ছাপাখানা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তু যা চলতি পথের বিঘ্ন। তাই সে সব পরিহার করা স্থির করা হল।

পূর্ববর্তী সেক্রেটারী জেনারেল চিন প্যাংসিয়েন এইসব কাজ করত

নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে। তার বিচারবুদ্ধি যে মারাত্মক তা বুঝতে পেরে চিনকে পার্টির সেক্রেটারী জেনারেলের পদ থেকে বিদায় দেওয়া হল। তার জায়গায় চ্যাং য়ুয়েন-তিয়েনকে মনোনীত করা হল সেক্রেটারী জেনারেলের পদে।

সেই দিন থেকে মাও সে-তুং একটি নাম।

এই নাম লাল ফৌজকে উৎসাহ জোগাত, কর্মে আগ্রহী করত, সহকর্মীদের নির্ভুল পথে নিয়ে যেত; এই নাম তখন হল চীনের ঘরে ঘরে জপমন্ত্র। আর এই নাম পৃথিবীর দৃষ্টি টেনে আনল চীনের দিকে। মাওকে বাদ দিয়ে চীনকে চিন্তা করাও সম্ভব নয়, এই বিশ্বাস জন্মাল সারা দুনিয়ার মানুষের মনে।

লাল ফৌজ এগিয়ে চলেছে মাওয়ের নির্দেশে।

কখনও দুঃখ, কখনও বেদনা; কখনও বিপদ, কখনও মৃত্যু। অকুতোভয় মাও আর তার লালবাহিনী। দিনের পর দিন রাতের পর রাত এগিয়ে চলেছে তারা। মুক্ত করছে জনসাধারণকে অত্যাচারের হাত থেকে। আঘাত করে নির্মূল করছে প্রতিক্রিয়াশীলদের।

এই লঙ্ মার্চের দিনে মাওয়ের ভাই সে-তান যুদ্ধে মারা গেল। তার অনুগত বন্ধু যক্ষারোগাক্রান্ত চু চিউ-পাই শত্রুর হাতে বন্দী হল। বিনা বিচারে তার শিরচ্ছেদ হল। মাও ব্যক্তিগতভাবে আঘাতের পর আঘাত পেয়েও মোটেই দমে গেল না।

সামনে সেঝিচুয়ান।

চ্যাং কুয়ো-তাও সেখানে রয়েছে।

মাও স্থির করল, তার বাহিনী ও চ্যাং-এর বাহিনী একত্র করে অভিযান আরম্ভ করবে। হো লুঙের সঙ্গে এই ভাবে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল হুনানে। চিয়াং যেমন সেবারও দুটো বাহিনী একত্রিত হতে দেয়নি তেমনি এবারও চিয়াং উভয় বাহিনীর মধ্যস্থল থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ করল। চিয়াং এবার সাফল্যলাভ করতে পারল না। চীনের বিচিত্র শাসন ব্যবস্থাই তার জন্য দায়ী। চীনের কুয়োমিনটাং

সরকারের সাক্ষাৎ শাসনব্যবস্থায় যা সম্ভব হয়েছিল তা সেঝিচুয়ানে সম্ভব হল না। চীনের সামন্তরা তাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করত মধ্যযুগীয় ধরণে। কুয়োমিনটাং সরকারের প্রত্যক্ষ কোন প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল না সেঝিচুয়ানে। চিয়াং স্থানীয় যুদ্ধবাজ সামন্তদের সঙ্গে যুক্ত হল। তারা আক্রমণ করল চ্যাং কুয়ো-তাওকে। মাও সেই সময় উত্তরে এগিয়ে চলল। মাও তার পুরাতন নীতিতে আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করল। লৌশান গিরিবর্ত্মে প্রাদেশিক শাসক ওয়াং চিয়া-লিয়েনের স্থানীয় ফৌজকে পরাজিত করল লালফৌজ।

চিয়াং-এর সমরনীতি নিষ্ফল হল।

মাও এই জয়কে উপলক্ষ করে কবিতা লিখল ঃ

পশ্চিমী বাতাস বড়ই তীক্ষ্ণ।
সকালের ঝাপসা চাঁদের দিকে চেয়ে বুনো হাঁসের কাকলি,
সকালের চাঁদ তখন ঝাপসা।
অশ্বের ক্ষুরধ্বনি।
বিউগিল বাজছে।
এই গিরিবর্ত্ম লোহার মত শক্ত, বলছে ওরা,
আজ এই গিরি অতিক্রম করব আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে
আমরা পেরিয়ে পাব এই পাহাড়ের শীর্ষ।
পাহাড় নীল সাগরের মত
অস্তগামী সূর্য লাল রক্তের মত।

মাও লৌশানের যুদ্ধে জয়লাভ করেই আত্মহারা হয়নি। সুন্যাইতে ফিরে যেতে হবে। মধ্য সেঝিচুয়ান দখল করার চেয়ে আরও দুর্বল অংশ য়ুনান আর সিকিয়াং-এর দিকে এগোবার প্রোগ্রাম করল মাও। এর জন্য আবার য়ু নদী পেরিয়ে সুন্যাইতে ফিরে চলল।

আবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল চিয়াং স্বয়ং তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে। চিয়াং তার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করল কুয়েইইয়াং-এ।

মাও এমন ভাব দেখাল যাতে চিয়াং-এর মনে হল মাও কুয়েইইয়াং আক্রমণ করবে।

নিজের অধ্যক্ষদের ডেকে মাও বলল, এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে।

অধ্যক্ষরা বলল, মুখোমুখি যুদ্ধে চিয়াং-এর শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করা কি সম্ভব হবে?

হবে না, বলল মাও।

তবুও জিততে হবে এই যুদ্ধে, দৃঢ় ভাবে বলল মাও।

ওদের প্রলোভন দেখিয়ে যেমন করে হোক য়ুনানের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তা হলেই ওরা আমাদের ফাঁদে পা দেবে। সুযোগ বুঝে তখনই আক্রমণ করে শত্রুদের নির্মূল করতে হবে।

চিয়াং ফাঁদে পা দিল।

মাওকে আক্রমণকারী মনে করে নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ থেকে যুদ্ধবাজ সামন্তদের সৈন্যবাহিনীকে ডেকে নিল শক্তিবৃদ্ধি করতে। লালফৌজ আক্রমণের অভিনয় করে উত্তর দিকের পথ ধরল। তারা উপস্থিত হল চিনসা নদীর কিনারায়। এই নদী হল য়ুনান আর সেঝিচুয়ান প্রদেশের সীমানায়। কুয়োমিনটাং সৈন্য, স্কাউট, পুলিশ ও তহশীলদারের ছদ্মবেশে মাও সমগ্র বাহিনী নিয়ে নদী পার হল। সেখানে নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিল। তারপরই লালফৌজ সিকিয়াংয়ের মধ্য দিয়ে সেঝিচুয়ানে প্রবেশ করতে উদ্যত হল।

চিয়াং মাওয়ের গতিপথের সংবাদ পেয়ে মনে মনে খুশী হল। লাল-ফৌজ যে এবার কুয়োমিনটাং-এর হাতে নির্মূল হবে এ বিষয়ে চিয়াংয়ের আর কোন সন্দেহ রইল না। লালফৌজকে পশ্চিমের পথ ধরতে হবে। সিকিয়াং-সেঝিচুয়ান সীমান্তের দুর্গম পথে প্রবেশ করলে তাদের আর নিষ্কৃতি নেই। আর যদি তারা পাহাড়ী পথে তাতু নদী পার হতে চায় তা হলে লালফৌজের একটি মানুষও জীবিত থাকবে না।

চিয়াং জানে আঠার শত পঁয়ষট্টি সালে এই তাতু নদীর কিনারায়

পাহাড়ী অঞ্চলে তাইপিংয়ের সেনাপতি শী তা-কাই বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে আটক হয়েছিল। এই গিরিপথে সম্রাটের সৈন্য এখানেই শী তা-কাইকে পরাজিত করেছিল। কুয়োমিনটাং লালফৌজে ফাটল ধরাতে বিমান ক্ষেত্রে হাজার হাজার প্রচার পত্র বিলিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল এখানে শী তা-কাই নির্মূল হয়েছিল, মাও এবার নির্মূল হবে। চিয়াং নিজেই গেল চুংকিং-এ এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে।

লঙ্ মার্চে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছিল তাতু নদীর ব্রিজে। তাতু নদী অতিক্রম হল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোমাঞ্চকর অধ্যায়। য়ু নদী অতিক্রমের সময় কাঠের ভেলা আর আঠার জন বাছাই করা বেপরোয়া লালফৌজ নদীর ফেরীঘাট দখল করেছিল। তারাই এগিয়ে গিয়ে কুয়োমিনটাংয়ের সুরক্ষিত ঘাঁটি দখল করেছিল। এর মধ্যে বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা ও আদর্শের সমন্বয় ছিল কিন্তু সে সময় ওপারের আনশুচাং শহর রক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি দুর্বল ছিল। সে তুলনায় তাতু নদীর তীরে লালফৌজের হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হতে হল।

উত্তাল তরঙ্গময়ী তাতু।

নদী অতিক্রম বিশেষ করে নৌকার সাহায্যে সময় সাপেক্ষ। বিলম্ব অনিবার্য। ইতিমধ্যে চিয়াং বাহিনী চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা। এ বাদেও উন্মুক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেই আকাশ থেকে বিমান আক্রমণ নিশ্চিত। নদীর স্রোত এত বেশি যে কোন ক্রমেই তার ওপর সাময়িক সেতু নির্মাণ অল্প সময়ে এবং শত্রুর অজ্ঞাতে সম্ভব নয়।

মাও সংবাদ পেল তাতু নদীর ওপর একটা ঝোলানো সাঁকো আছে। সেই সেতু বর্তমান স্থান থেকে একশত দশ মাইল উজানে নদীর উত্তর-পশ্চিমে। সেই সেতু পথেই একমাত্র নদী পারাপার সম্ভব। সবাই স্থির করল লুচিং নামক স্থানে এই সেতু পথেই নদী পার হতে হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই লালফৌজের প্রথম ডিভিসন

নদী অতিক্রম করে অপর তীরে পৌঁছেছে। তাদের আদেশ দেওয়া হল তারা নদীর কিনারা বেয়ে লুচিংয়ের দিকে অগ্রসর হতে আর মূলবাহিনী এপারে নদীর কিনারা দিয়ে লুচিং সেতু পর্যন্ত যাবে।

নদীর দুই কিনারা বেয়ে লাল বাহিনী লুচিংয়ের দিকে দ্রুত এগোতে থাকে।

কোথাও জলাভূমি, কোথাও ছোট ছোট নদী, কোথাও খাল বিল, কোথাও শত্রুর ছোট ছোট দলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই যুদ্ধ। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চলছে লাল বাহিনা।

বাম তীরের বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হল তিন দিনের মধ্যে লুচিং পৌঁছতেই হবে। প্রথম দিন চলার পর হিসাব করে দেখা গেল মাত্র তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে এই বাহিনী। আরও আশী মাইল পথ সামনে, হাতে মাত্র দুইদিন।

লালফৌজ ছুটছে।

হঠাৎ আদেশ পেল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লুচিং পৌঁছানো চাই।

কিন্তু পথ নিরাপদ নয়। শত্রুর ঘাঁটি রয়েছে পথের মাঝে। তবুও তাদের ছুটতে হচ্ছে। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে পঁচিশে মে তারিখে লালফৌজ লুচিং পৌঁছল এবং সেই দিনই শত্রুর ঘাঁটি দখল করে সেতু মুখ চলাচল নিরাপদ করল। তখনও লুচিং শহর দখল বাকি। নদী অতিক্রম বাকি। লুচিং সুরক্ষিত। মেশিনগান, মর্টার নিয়ে চিয়াং বাহিনা পাহারা দিচ্ছে শহর। সেতু পার হতে হবে। তেরটি মোটা লোহার তার দিয়ে এই সেতু তৈরী। দু পাশে দুটো মোটা লোহার তার ধরে নদী পারাপার করতে হয়। নয়টি তারের সঙ্গে তক্তা জুড়ে সেতু তৈরী। লালফৌজ পৌঁছবার আগেই সেতুর তক্তা তুলে নিয়েছে চিয়াং বাহিনী। শুধুমাত্র তারগুলো তখনও ঝুলছিল। তক্তা নতুন করে জুড়তে না পারলে নদী অতিক্রম অসম্ভব।

তখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করল মাও। বাইশ জন বীর সৈন্য অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে গেল পাহারাদারী করতে আর

তাদের পেছন পেছন আরেকদল সৈন্য সেতু মেরামত করতে করতে এগিয়ে চলল। শহর রক্ষীদের গুলিতে অগ্রগামী পাহারাদারদের কেউ কেউ মারা গেল, তাদের মৃতদেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল, মেরামতকারীরাও অনেকে মারা গেল কিন্তু ধাপে ধাপে তারা সেতু প্রায় মেরামত শেষ করল। তখনও অনেক বাকি। নদীর অপর তীরে যে সকল তক্তা তখনও সেতুতে পাতা ছিল শহররক্ষীরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। লালফৌজের বাছাইকরা সৈন্যরা সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা নদী অতিক্রম করল। পেছন পেছন সেতু মেরামত সম্পূর্ণ করল। সন্ধ্যার আগেই লুচিংয়ের দুই রেজিমেণ্ট সৈন্যকে পরাজিত করে লালফৌজ শহর দখল করল।

ওপারের প্রথম ডিভিসনও পৌঁছে গেল লুচিং শহরে। চিয়াং মনে করেছিল শী তা-কাইয়ের মত নির্মূল হবে লালফৌজ কিন্তু মাওয়ের এই রণনীতি তাকে নিরাশ করল। এইভাবে চিয়াংয়ের একটি শক্ত ঘাঁটি লালফৌজের হস্তগত হল।

মাও তখন ধরল দক্ষিণের পথ।

পথে শত্রুর সঙ্গে খুব বেশি লড়াই করতে হয়নি, তবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে অনেকবার। বরফ ঢাকা চিয়াচিন পর্বত পেরিয়ে মাও এসে পৌঁছল চ্যাংয়ের কাছে। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী মাওকুং থেকে মাওএর কাই অভিমুখে রওনা হল।

বিঘ্ন অনেক। মাও এবং চ্যাংয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল।

চ্যাং বলল, মাও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নতুন। আমি তার চেয়ে অনেক পুরাতন কমরেড। আমার ওপর মাও হুকুম চালাবে তা আমি সহ্য করতে রাজি নই।

মাও বলল, আমাকে পার্টি সবার ওপরে বসিয়েছে, আমি যোগ্যতার দাবীদার, বয়সের দাবীদার নই। যেহেতু আমি পার্টির প্রতিনিধি আমার নির্দেশ মেনে চলাই হল আমার অধীনস্থ সব কমরেডের নীতি। এই নীতিভঙ্গ চলতে পারে না।

কে যে লালবাহিনীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে তা নিয়ে যে মতভেদ তার সমাধান হবার আগেই চ্যাং এগিয়ে গেল সিকিয়াংয়ের দিকে আর মাও তার বাহিনী নিয়ে উত্তর অভিমুখে রওনা হল। এই বিবাদের সময় একটি অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। জেনারেল চু টে প্রথমাবধি মাওয়ের সঙ্গী ছিল অথচ এই গুরুতর সময়ে কেন চু টে মাওকে পরিত্যাগ করেছিল তা পরবর্তী কালে চু টের মুখে শোনা গেছে।

চু টে বলেছিল, চ্যাং আমাকে ভয় দেখিয়ে তার দলে নিয়েছিল।

চ্যাং বলেছিল, চু টে সেঝিচুয়ানের লোক। সেঝিচুয়ানে জনসংগঠন করতে চু টে ছিল যোগ্য ব্যক্তি, তার সাহায্য আমার প্রয়োজন ছিল।

মাও মনে করত চু টে তার নীতিকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করতে পারেনি বলেই নিজের জন্মভূমিতে থেকে গেছে। ভয় দেখিয়ে দলে টেনে নেওয়াটা অবান্তর কথা, বিশেষ করে চু টের মত জাঁদরেল রণনিপুণ যোদ্ধাকে সহজে ভয় দেখিয়ে কিছু করা কখনই সম্ভব নয়।

মাও একাই চলল।

লঙ্ মার্চ আবার আরম্ভ হল।

চু টেকে হারিয়ে মাওয়ের এই উত্তর অভিযান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সত্য কিন্তু মাওয়ের লাল বাহিনীর আদর্শগত আনুগত্য মাওকে শক্তিশালী করেছিল।

পথে পাহাড় পর্বত, ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে মাও এগোতে এগোতে বিরাট একটি তৃণভূমিতে এসে হাজির হল। চারিদিকে জলাজমি। পা ফেলতে ভুল করলেই কাদায় ডুবে মরতে হবে। পথে হান উপজাতিদের মাঝ দিয়ে আসার সময় হানরা তাদের খুবই উত্যক্ত করতে থাকে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে। হানদের চেয়ে সহজ ভাবে মুক্তি ফৌজকে গ্রহণ করেছিল আই উপজাতিরা কিন্তু মান উপজাতিরা সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল লাল বাহিনীর। বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে তারা যেমন পথ বন্ধ করছিল তেমনি তারা সুযোগ বুঝলেই আক্রমণ করছিল লাল বাহিনীকে। যাতে লাল বাহিনী

কোন রকমে কোন খাবার না পায় তার জন্য তারা গ্রাম ছেড়ে চলেও গিয়েছিল। পয়সার বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারল না লালফৌজ। অবশেষে তাদের খাদ্যের অভাব ঘটল। অবশেষে খাদ্যের অভাবে তারা সঙ্গে যত ঘোড়া ছিল সেগুলো হত্যা করে ক্ষুধা নিবারণ করতে লাগল। ঘোড়াও আর রইল না। তখন চামড়ার বেল্ট, জুতো সেদ্ধ করে খেতে আরম্ভ করল। যা কিছু তাদের কাছে খাদ্য মনে হয়েছিল তাই খেতে বাধ্য হল। এই সময় অখাদ্য ও বিষাক্ত বনজ গাছগাছড়া খেয়ে অনেকেই রোগগ্রস্ত হল, অনেককেই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

প্রকৃতিও বিরূপ। এই বিপদজনক পথ পরিক্রমায় অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হল তাদের। এই বৃষ্টির জন্য প্রচণ্ড শীত পড়ত রাতের বেলায়। বিষাক্ত কাদায় চলতে চলতে তাদের পায়ে ঘা হল, তার ওপর ওষুধের অভাব। একমাত্র গরম জল ভরসা করে চিকিৎসা করা হতো রোগীদের।

মাওয়ের সৈন্যদলে তখন সাত থেকে আট হাজার মাত্র সৈন্য। তাদের নিয়ে উত্তরে মিনসান পর্বত পেরিয়ে চলল, ইতিমধ্যে আবার মুখোমুখি দেখা হল চিয়াং বাহিনীর সঙ্গে। অবশেষে হুইনিং ও চিংনিং-এর মাঝ দিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা পেরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছল।

এরপর মাও তার বাহিনী নিয়ে লিউপাল পর্বত পেরিয়ে সেনসি প্রদেশে প্রবেশ করল তার রণক্লান্ত বাহিনী নিয়ে।

মসকোর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্কও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে।

আমরা মসকোর তাঁবেদার নই, বলল চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা।

স্টালিন চায় কম্যুনিজম প্রসার লাভ করুক মসকোর মুরুব্বিয়ানা মেনে নিয়ে।

অসম্ভব, বলল মাও।

আমরা কারও নির্দেশে চলতে রাজি নই। মার্কস্ ও লেলিনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন চিন্তাধারা থাকবে না আমাদের এই সমাজবাদী সংস্থায়।

মাও বলল, স্টালিন উভয়কূল রক্ষা করতে চাইছে। চিয়াংয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক যাতে চির্ না খায় তার জন্য সচেষ্ট আবার কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও এগোবার উপদেশ দিচ্ছে অবশ্য চিয়াংয়ের নির্দেশ অনুসারে। তা কখনও আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

আমরা মনে করি এখন মসকোকে অস্বীকার করার সময় এসেছে।

ঠিক তা নয়। তবে মসকোর অধিকারকে কোন নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, কাউকেই এখন বিরুদ্ধ পক্ষ করতে চাইনা। বিশেষ করে রাশিয়ার মত সমাজবাদী দেশকে। আমরা নিশ্চয়ই সতর্ক হব, অথচ তাদের জানতে দেবনা। আমরা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করব। নইলে কোন দিকই রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সু হাই-তুং পঁচিশ নম্বর বাহিনীর অধ্যক্ষ। হুনান থেকে তার বাহিনী কুয়োমিনটাংকে পর্যুদস্ত করে সেনসিতে পৌঁছে গেছে। লিউ চি-তানও তার বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেছে।

সু বলল, বর্তমানে আমাদের সৈন্য সংখ্যা পনর হাজারের বেশি।

লিউ বলল, হো লুং তার বাহিনী নিয়ে শীগগীরই এসে যাবে। তাতে আমাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।

চু টে চ্যাং কুয়ো-তাওয়ের সঙ্গে ফিরে আসছে।

মাও হিসাব করে বলল, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে আমরা অভিযান শুরু করব।

সু বলল, জাপান ক্রমেই এগিয়ে আসছে। জাপানকে রুখতে হবে।

একক ভাবে জাপানকে রোখা যাবে না।—মন্তব্য করল লিউ

কুয়োমিনটাংকে নির্মূল করতে পারলে আমরা একক ভাবে জাপানকে আঘাত করতে পারতাম।

মাও চিন্তিত ভাবে বলল, বর্তমান অবস্থায় চিয়াংকে গদীচ্যুত করা সম্ভব নয়। অথচ জাপানকে প্রতিরোধ না করলে চীনের মানচিত্র অন্য চেহারা ধারণ করবে। চীনের যদি জাতি হিসেবে বাঁচতে হয় তাহলে জাপানকে সর্বাগ্রে রোখা দরকার।

তাহলে কি আমরা চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করব?

তা ঠিক নয়। অন্তত বর্তমানে সে প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমরা বিপ্লবী, আমরা চাই জনগণের মুক্তি, শোষণের অবসান কিন্তু আমরা চীনা, আমাদের আরও কর্তব্য আছে। (a convinced revolutionary and a passionate Chinese nationalist)—আমার এই চরিত্রের প্রতি আমি সব সময় সজাগ। আজ পাতি-বুর্জোয়া, যুদ্ধবাজ ও জমিদারদেরও সাহায্য দরকার হবে জাপানকে আমাদের দেশ থেকে বিদায় করতে। সম্মিলিত ভাবে যদি আঘাত হানতে না পারি তাহলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আমার মনে হয় এরূপ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেণীর সমর্থন ও সহায়তা নিয়ে আমাদের একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমরা তো এ বিষয়ে তেত্রিশ সালেই চিয়াংকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। চিয়াং তা অগ্রাহ্য করেছে, উপরন্তু চিয়াং আমাদের নির্মূল করার জন্য 'ঘেরাও ও হত্যার নীতি' গ্রহণ করেছিল। তাকে বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা চাই আমরা থাকব সব কিছুর কেন্দ্রে, আমাদের চারিপাশে গড়ে তুলতে হবে সমগ্র চীন জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। আমরা সকল দল ও মতকে আমাদের পাশে নেব কিন্তু আমরা পরিচালনা করব সব নিয়ম ও নীতি।

মাও কোন সময়ই চিয়াংকে সুচক্ষে দেখেনি। কারণস্বরূপ বলা যায় জাপানকে যে সব সুযোগ সুবিধা চিয়াং দিয়েছিল তা চীনের

জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং চীনের সার্বভৌমত্ব সংহারক। মাও অন্তর্মঙ্গোলিয়াতে তার প্রচার চালাতে থাকে। তাদেরও আহ্বান জানাল চীনের এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে; তাদের বলল, তোমরা এস, We can overthrow one Common enemies—the Japanese imperialist and their running dog Chiang Kai-shek"—তা হলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ও তার পশ্চাদ্‌গামী কুকুর চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করতে পারব।

মাও এগিয়ে গেল উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান এলাকায়। তাদের সাহায্য চাইল। তাদের সামনে তুলে ধরল নব্য তুর্কীর আদর্শ। গুপ্ত সমিতির কো লাও-হুইকেও আবেদন জানাল সাহায্য করতে। তাদেরও বলল, আদর্শ আমাদের একই, কারণ আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও গুপ্তসমিতি গরীবের দুঃখ মোচন করতেই চায়।

চিয়াং-এর বিরুদ্ধে প্রচারের শেষ নেই।

তবুও মাও তার চিরদিনের শত্রু চিয়াং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি ছিল। মাও স্বীকার করল, যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই তা হলে জাপানের দাসত্ব করতে হবে—We are not ready to become slaves of Japan—চিয়াং ঠিক সম্মত ছিল না কম্যুনিষ্টদের সাহায্য নিতে কিন্তু চিয়াং বাহিনীর জেনারেলরা বার বার চাপ সৃষ্টি করতে লাগল ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য। মাও বলল, চিয়াংকে অবিলম্বে মত স্থির করতে হবে—If he (Chiang) stops civil war, begins to fight Japan, re-establishes the union of the Kuomintang and the Chinese Communist Party. We will welcome this change and co-operate whole heartedly.

চিয়াং সহজে রাজি হল না।

যে মানচুরিয়া জাপান দখল করেছিল সেই মানচুরিয়ার অধিবাসী জেনারেল চ্যাং সুয়ে-লিয়াং। চিয়াং বাহিনীতে ও সরকারে তার প্রভাব

যথেষ্ট। চ্যাং সুয়ে-লিয়াং কম্যুনিষ্ট দমন করতে এসে কম্যুনিষ্টদের হাতে বন্দী হয়েছিল। কম্যুনিষ্টরা তাকে বিনা সর্তে মুক্তি দিয়েছিল। তার দেশ মানচুরিয়া তখন জাপানের পদানত। ব্যথা তার কম নয়। সে-ই এগিয়ে এল এই সমস্যা সমাধান করতে।

চ্যাং একদিকে চিয়াংকে স্বমতে যেমন আনতে চেষ্টা করল তেমনি কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। সে গঠন করেছিল People's Revolutionary Army।

মাও চ্যাংকে খবর দিল, আমাদের তুমি যদি আক্রমণ না কর তা হলে আমরাও তোমাকে আক্রমণ করব না।

চ্যাং যখন এই যোগাযোগ সৃষ্টি করছিল তখন চিয়াং ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। চ্যাং-এর প্রধান কার্যালয় সিয়ানে উপস্থিত হল চিয়াং। উদ্দেশ্য চ্যাংকে বাধা দেওয়া, যাতে কম্যুনিষ্টদের কোন সর্ত স্বীকার করে কুয়োমিনটাং-এর কোন ক্ষতি না করে।

চিয়াং-এর ভাগ্যাকাশ তখন মেঘাবৃত।

চ্যাং চিয়াংকে বন্দী করল।

চিয়াং এই অকল্পনীয় অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

চ্যাং প্রস্তাব দিল, আমাদের সর্বপ্রথম কাজ জাপানকে প্রতিরোধ করা। তার পরের কাজ হল কম্যুনিষ্টদের দমন করা। আর যদি কোন কাজ থাকে তা করব আরও পরে।

চিয়াং বন্দী। বন্দীকে নিজের মতে আনার জন্যই চ্যাং এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। চ্যাং বলল, তোমাকে বন্দী করা ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। তার জন্য যে কোন শাস্তি আমাকে দিতে পার কিন্তু আমি আমার জন্মভূমির স্বাধীনতাকে সব চেয়ে বড় মনে করি সেজন্য জাপানকে সর্বাগ্রে প্রতিরোধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে নইলে তোমাকে আমার বন্দীশালায় থাকতে হবে।

চিয়াং বলল, আমরা জাপানকে প্রতিরোধ করতে পারতাম কিন্তু পারছি না দুকূল রক্ষা করতে। আমাদের ঘরে বাইরে শত্রু। ঘরে

শত্রু রেখে বাইরের শত্রুকে প্রতিরোধ করতে গেলে পেছন থেকে ঘরের শত্রু কম্যুনিষ্টরা আমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করবে। সেজন্য কম্যুনিষ্ট দমন বন্ধ করতে পারি না, যদি তা করা হয় তা হলে ভুল হবে।

কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে এক হয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করার নীতি গ্রহণে তোমার কি আপত্তি আছে। তারা তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

চিয়াং জোর দিয়ে বলল, তুমি জাননা চ্যাং কম্যুনিষ্টরা কি সাংঘাতিক চিজ। তাদের সাহায্য নেওয়ার অর্থ দেশের সর্বনাশ করা, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু কম্যুনিষ্টদের সাহায্য নয়। দেশপ্রেমিক সবাইয়েরই সহযোগিতা নিতে হবে। জাপান হল চীনের মূল শত্রু। জাপানকে তাড়িয়ে আমরা আমাদের ঘরোয়া বিবাদ যে কোন সময়ে মিটিয়ে ফেলতে পারব।

চিয়াং তখনও মন স্থির করতে পারেনি।

এদিকে চিয়াং-এর বন্দীদশার কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। স্টালিন চ্যাং-এর এই কাজকে নিন্দা করল। তার বিশ্বাস চিয়াং একমাত্র জাতীয় নেতা, চীনের মুক্তি চিয়াং-ই আনতে পারে।

সেনসিতে তখন পাকাপোক্তভাবে কম্যুনিষ্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিষ্টরা দাবী করল, চিয়াংকে জনতার সামনে নিয়ে এসে বিচার করা হোক।

মাও বাধা দিল।

মাওয়ের এই আপত্তিতে অনেকেই রুষ্ট হল।

মাও বলল, তোমরা চাও চিয়াং বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ করুক।

সহকর্মীরা বলল, এটাই তার উচিত প্রাপ্য।

কিন্তু চিয়াংকে সরিয়ে দিলে নানকিং সরকার যাদের হাতে পড়বে তারা আরও প্রতিক্রিয়াশীল। তারা দেশকে জাপানের কাছে

বিক্রি করে দেবে। জাপানকে প্রতিরোধ করতে চিয়াং চেষ্টা করছে, কিন্তু যুদ্ধবাজ নানকিং-এর নেতারা চিয়াং গদীচ্যুত হলেই জাপানের ইয়েন (জাপানী টাকা) ঘুষ নিয়ে দেশকে দাসত্বে বিলিয়ে দেবে।

আমরা নানকিং দখল করব।

এখনও আমাদের তেমন শক্তি নেই বন্ধুগণ। আমরা অবাস্তব কল্পনায় নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারি না। আমরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাই, The Communist Party stood for a peaceful settlement"—আমরা যদি চিয়াংকে বন্দী করে রাখি তাতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বেশি শক্তিশালী হবে আর শক্তিশালী হবে চীনা যুদ্ধবাজরা।

অবশেষে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চিয়াং রাজি হল। ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিল। চিয়াং বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে গেল নানকিং-এ।

সাঁইত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারী থেকেই আরম্ভ হল সর্ত নিয়ে আলোচনা।

মাওয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী ঝু-চেন, সে সময় গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসার জন্য স্ত্রীকে মাও পাঠিয়ে দিল মসকোতে। লঙ্ মার্চের সময় যে কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়াতে তার দৈহিক অবনতি ঘটে। প্রথমে এ বিষয়ে কেউ-ই লক্ষ্য করেনি। অবশেষে স্ত্রীর অবস্থা দেখে মাও নিজেই ব্যবস্থা করে তাকে মসকোতে পাঠিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। স্ত্রীর দিকে নজর দেবার বিশেষ সময় ছিল না মাওয়ের। তখন কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্টদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতি ঘটাতে মাও ব্যস্ত।

চীন সীমান্ত পেরিয়ে হো ঝু-চেন চলল মসকোর পথে।

সাতাশ সাল থেকে ঝু-চেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। তখন থেকেই মাওয়ের পাশে পাশে থাকত।

ঝু-চেন যখন কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় তখন তার বাবা তাকে

নানা ভাবে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিল। বাবার জমিদারীর অগাধ আয়, সেই জমিদারী উচ্ছেদ করার ব্রত গ্রহণ করেই নামতে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। শেষে ঝু-চেনকে ফিরিয়ে নিতে আর চেষ্টা করেনি তার বাবা।

নানচাং আক্রমণের সময় ঝু-চেন মহিলা বাহিনী গঠন করেছিল, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল এই অভিযানে। মাওয়ের ব্যক্তিত্বের কাছে ঝু-চেন কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তাই মাওকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কাই-হুইয়ের জীবনকালেই শোনা যায় ঝু-চেন মাওয়ের সঙ্গিনী হতে পেরেছিল, এবং স্বামী-স্ত্রীরূপেই বসবাস করত। কাই-হুইয়ের মৃত্যুর পর ঝু-চেনকে বিয়ে করেছিল মাও। ঝু-চেনের ব্যক্তিত্ব, রূপ ও স্বাস্থ্য কেবল আকর্ষণ করেনি মাওকে, গণমুক্তির ব্রতে ঝু-চেনের যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নেতৃত্ব দেখা গিয়েছিল তাতেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল মাও।

বিবাহের পূর্ব অবধি ঝু-চেন ছিল সর্বসময়ের বিপ্লবসঙ্গিনী। বিবাহের পরও সব সময়ই ঝু-চেন মাওয়ের কর্মসঙ্গিনী ছিল, সন্তানবতী হবার পর কিছুটা গৃহধর্মী হওয়াতে ঝু-চেন যেন পর্দার আড়ালে পড়ে গেল। লঙ্ মার্চের সেই ভয়ঙ্কর দিন গুলোতে ঝু-চেন ছিল মাওয়ের পাশে পাশেই। সেই ভীতিপ্রদ দিনের স্মৃতি ঝু-চেনের মন থেকে মোছেনি, বিশেষ করে একটি সন্তানের মৃত্যু ঝু-চেনকে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ করত, আর সেই লঙ্ মার্চের দিনে অনাহারে ও অর্ধাহারে ঝু-চেনের দেহ গিয়েছিল ভেঙ্গে। সেনসি আসার কিছুকালের মধ্যেই ঝু-চেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ইনান থেকে ঝু-চেনকে মাও নিজেই আগ্রহী হয়ে মসকোয় পাঠিয়েছিল চিকিৎসার জন্য।

হো ঝু-চেনের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ দেখা দিল সেই সাঁইত্রিশ সালে, যেদিন সে পা বাড়াল মসকোর দিকে চিকিৎসার জন্য।

ইনানের অপেরা হাউসে নতুন একটি যুবতী এসেছিল অভিনয় করতে।

ল্যান-পিঙ্ তার নাম।

রূপসী যুবতী অবশ্য কুমারী।

সাংঘাই থেকে এই নবাগত যুবতী অপেরা হাউসে পরপর ক'দিন অভিনয় করল। দর্শকরা বিমোহিত। ইতিপূর্বে এমন অভিনয় কেউ দেখেনি। চটুল নয়না এই সুন্দরী নারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইনানের যুব সমাজ। অনেকেরই দৃষ্টি তার দিকে। কাকে যে সে দয়া প্রদর্শন করবে সেটা হল তখন আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু মদনদেবতা তখন তার তীর সংযোজন করেছে অন্যত্র।

থিয়েটার দেখতে এল স্বয়ং মাও সে-তুং।

প্রথম দেখল তার অভিনয়। তার চেয়ে বেশি দেখল ল্যান-পিঙকে। মাও এই রূপের আগুনে পুড়ল। আর ল্যান-পিঙ্? সেও কিম্বদন্তীর "love at first sight"—নিয়ে ব্যস্ত।

মাও উন্মাদ হয়ে উঠল ল্যান-পিঙের চিন্তায়। ল্যান-পিঙকে আমন্ত্রণ করল নিজের বাড়িতে। ল্যান-পিঙ্ও এরই প্রতীক্ষা করছিল। আনন্দে নৃত্য করতে করতে গেল মাওয়ের কাছে। বচন বিনিময়, হৃদয় বিনিময়, আরও অনেক কিছু বিনিময়ের পর সমস্যা সমাধান আর হল না।

হো ঝু-চেন জীবিত।

মাও চায় ল্যান-পিঙকে বিয়ে করতে। তার এই চাওয়ার পথে অন্তরায় হো ঝু-চেন। তখনও ঝু-চেন শয্যাশায়ী। নিরোগ হয়ে আসার অপেক্ষায় রইল দুজনেই।

ঝু-চেন ফিরে এল সুস্থ দেহ নিয়ে কিন্তু মন তার চির অসুস্থ হল যখন বিবাহ বিচ্ছেদের জবাব দিতে তাকে হাজির হতে হল আদালতে। ঝু-চেন এই বিচ্ছেদ নীরবে মেনে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এল মাওয়ের গৃহ থেকে। এই কাজে জনমতের কতটা সমর্থন ছিল,

মাওয়ের মনোবৃত্তির কতটা সমর্থন ছিল তা আজও অজ্ঞাত কিন্তু পাঁচটি সন্তানের জননী ঝু-চেন আর মাওয়ের স্ত্রী নয়। ঝু-চেন শক্ত মন নিয়ে মেনে নিল এই বিচ্ছেদ।

মাও এরপরই বিয়ে করল ল্যান-পিঙকে। তৎকালে চীনের নারী সমাজে ল্যান-পিঙকে বলা হত 'glamarous girl'—এই girl এর glamour কে সম্মান দেখাতে হৃদয়ধর্মকে অসম্মান করতে মাও ত্রুটি করেনি। অবশ্য মাও ভালবেসেছিল ল্যান-পিঙকে, আবার ল্যান-পিঙও ভালবাসে মাওকে সর্বান্তকরণ দিয়ে।

সাঁইত্রিশ সালেই কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সমঝোতা হল জাপানকে প্রতিরোধ করার।

সেই সমঝোতার জন্য পাঁচটি সর্ত আরোপ করল কম্যুনিষ্টরা। সার্বজনীন ভোটে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা স্বীকার ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সর্বদলের প্রতিনিধি নিয়ে দেশরক্ষার জন্য পরামর্শ করা, অবিলম্বে জাপানকে বাধা দেবার ব্যবস্থা করা, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা ও জনজীবনে উন্নতি ঘটানো। আর সেই সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা স্বীকার করল, কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করবেন না, সেনসির শাসন ব্যবস্থার নবন্যাস ঘটানো এবং তা নানকিং-এ চিয়াং সরকারের প্রভাবে তা ঘটাবে, সার্বজনীন ভোটে এই এলাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জমিদারদের ভূমি রাজেয়াপ্ত বন্ধ রাখবে।

বাইশে সেপটেম্বর উভয় পক্ষের সমঝোতা হল।

জাপানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ অভিযান আরম্ভ করল কম্যুনিষ্ট, কুয়োমিনটাং ও চীনের অন্যান্য দলের সমর্থকরা। জাপানের বিরুদ্ধে এটা হল চীনের জাতীয় সংগঠন। এতবড় সংগঠন এবং সংযুক্ত মোর্চা এর পূর্বে চীনে কখনও হয়নি।

সবাই বলল, কম্যুনিষ্টরা তাদের শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দূরে সরে গেছে। জাতীয়তাবাদী যুদ্ধবাজদেরই সমান স্তরে এসে গেছে তারা।

মাও তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করে বলল, আমরা কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থবহন করিনা। আমাদের আজ বিবেচনা করতে হচ্ছে সমগ্র চীনের জাতীয় জীবনের বিপর্যয়কে। আমাদের দায়িত্ব হল জাপানী দানবের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করা। আমরা বিশ্ব সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং আমরা তারই একটি অংশ। আবার আমরাই দেশপ্রেমিক চীনা, আমরা চীনের অধিবাসী, আমরা চীনকে ভালবাসি। মাতৃভূমি রক্ষা আমাদের ধর্ম। আমরা তাই করছি। আমাদের দেশপ্রেম আর বিশ্বসাম্যবাদে কোন বিবাদ নেই। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারলেই আমরা বিশ্বসাম্যবাদে উপনীত হতে পারব।

এইভাবে কি সাম্যবাদের ক্ষতি হচ্ছে না ?

না। আমাদের মূল লক্ষ্য সাম্যবাদ—চীনেই নয় সমগ্র বিশ্বে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আমরা চাই। আমাদের বহু সহকর্মী পঁচিশ-সাতাশ সালেও কুয়োমিনটাং দলের সঙ্গে কাজ করেছে কিন্তু যখনই পার্টির ডাক এসেছে তখনই তারা ছুটে এসেছে। এ থেকেই বুঝতে পারছ আমাদের সহযোগিতা আমাদের অবলুপ্তি ঘটায় না। বর্তমান অবস্থায় কম্যুনিষ্ট পার্টি যে প্রোগ্রাম নিয়েছে তার ভূমিকা সান ইয়াত সেনের "Three People's Principles"-এর চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল। এই কারণেই কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া সম্ভব। জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জনতার সুখ সমৃদ্ধি যেমন সান ইয়াত সেনের তিনটি মূল নীতি ছিল, সে নীতি আমাদেরও। সেজন্য আমাদের সঙ্গে জাপানকে বিতাড়নের একটা সার্বজনীন প্রোগ্রাম নেওয়া সম্ভব।

এতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের কাছে বলি দিতে হবে। জাতীয়তাবাদ যত তীক্ষ্ণ হবে ততই ফ্যাসিইজম প্রসার লাভ করবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রসারের জন্য সমঝোতা করতে পার।

আমি কৌশলের জন্য এই সমঝোতা চাই না, বলল মাও।

তুমি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রসার চাও না ?

নিশ্চয় চাই। বেশি করে চাই চীনের স্বাধীন সত্তাকে সর্বাগ্রে বজায় রাখতে। আমরা যদি চিয়াংকে সাহায্য করি এই জাতীয় দুর্দিনে তাহলে আমরা কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে থেকেই নিজেদের শক্তিশালী করতে পারব।

চিয়াং আমাদের যে সব সহকর্মী কুয়োমিনটাং-এ যোগ দেবে তাদের তালিকা চেয়েছে।

তাই দেব। কিন্তু আমরা কুয়োমিনটাং-এর কোন সদস্যকে আমাদের দলে গ্রহণ করব না।

চিয়াং যদি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ না করে। চিয়াং মনে করবে কম্যুনিষ্টদের তুমি তার দলে প্রবেশ করাতে চাও অথচ আমাদের দলে তাদের প্রবেশ নিষেধ। এর সহজ অর্থ হল আমরা কুয়োমিনটাং-এ ঢুকে তাদের সর্বনাশ করব। এটা হয়ত চিয়াং গ্রহণ করবে না। অনুপ্রবেশ কেউ-ই সুচক্ষে দেখে না। তাতো জান?

জানি। কিন্তু আমরা প্রথম যেবার চিয়াংকে সাহায্য করেছিলাম সেবারের সঙ্গে এবারের অবস্থা অনেক আলাদা। আমার বিশ্বাস আমাদের এই সমঝোতা ও সহযোগিতা বহুকাল স্থায়ী হবে।

কিন্তু চিয়াং তোমাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবে। তোমার আন্তরিকতাকে সে ভালভাবে মোটেই গ্রহণ করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত বিবাদ ঘটবে।

চিয়াং-এর দুর্ভাগ্য। চাষী সমাজে, বিপ্লবপন্থীদের কাছে আমার যে স্থান সে স্থান থেকে চিয়াং কোন দিনই আমাকে হঠিয়ে দিতে পারবে না। চিয়াং চেষ্টা করবে চাষী সমাজে ও পাতি বুর্জোয়া সমাজে তার স্থান গড়ে নিতে কিন্তু তা গায়ের জোরে হবে না। তা করতে হলে যে সকল গুণের ও কাজের দরকার তা চিয়াং-এর সাধ্য নেই করে।

সেই ভয়েই চিয়াং আমাদের বিশ্বাস করবে না। যে জাগরণ এসেছে তাতে জাতীয়তার ফাঁকা বুলি ভেসে যাবে দেখা দেবে সমাজ-

তন্ত্রের উন্মেষ। তাই চিয়াং-এর সঙ্গে বিবাদ এড়াতে চাইলেও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী এবং সত্বরই।

মাও হেসে বলল, তর্কাতর্কি করে কাজ নেই বন্ধু। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কাজের ফল দেখার জন্য।

মাওয়ের প্রভাব যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা তার পরবর্তী কার্যকলাপেই প্রমাণ পাওয়া গেল। কৃষক ও শোষিত সমাজে যখন জাতীয় বিপদের আশঙ্কাকে তুলে ধরল মাও তখন হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক এসে দাঁড়াল তার পাশে। চিয়াং-এর তিনদফা জাতীয় নীতি যা এতকাল করতে পারেনি, মাওয়ের অভিভাষণ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেশপ্রেম জাগ্রত করল জনসাধারণের মনে। চিয়াং-এর প্রভাব স্তিমিত হয়ে গেল। সবাই জানল মাও একমাত্র তাদের রক্ষা কর্তা, তার অনুবর্তী হওয়াই বিধেয়।

মাও তার গোরিলা বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল ছত্রিশ সালে জাপানকে প্রতিরোধ করতে। তার সঙ্গে রইল লিউ চিন-তান ও সু হাই-তুং। তারা পীত নদী পেরিয়ে জাপান চীনের যে সব অংশ দখল করেছিল সেই সব অংশে প্রবেশ করল। তাদের আক্রমণে আঠারটি অঞ্চল ছেড়ে জাপানীরা পালিয়ে গেল। কিন্তু চিয়াং বাহিনী জাপানকে রুখতে না পারলেও কম্যুনিষ্টদের পেছনে ধাওয়া করল। মাওয়ের এই শুভ প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হল। আবার তারা ফিরে এল পীত নদীর এপারে। এই সময় লিউ চিন-তান গুরুতররূপে আহত হয়। কিছু কালের মধ্যেই লিউ মারা যায়।

এরপরই কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হল সাঁইত্রিশ সালের সেপটেম্বর মাসে। এবার সম্মিলিত ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনটাং।

এরপরই ইনানের লাল ফৌজ পীত নদী অতিক্রম করে আবার জাপানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হল অষ্টম বাহিনী। চৌত্রিশ সাল থেকে কম্যুনিষ্টরা চেয়েছে সম্মিলিত

ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তিন বছর পর তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল।

অষ্টম বাহিনীতে ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য। এই সামান্য সৈন্য নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। জাপান তখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে চীনের অভ্যন্তরে। সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রায় সকল শহর এমনকি পিকিং পর্যন্ত জাপান হস্তগত করেছে। এই শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হলে যে শক্তির দরকার তা ছিল না অষ্টম বাহিনীর। কিন্তু গোরিলা যুদ্ধের কৌশলে জাপান ক্রমেই বিপন্ন হয়ে উঠল। জাপান শহর দখল করেছে, চলাচলের পথ দখল করেছে কিন্তু পল্লীজীবনে ও অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। প্রতিটি চীনা অধিবাসীই জাপানের বিরুদ্ধাচারী। এমত ক্ষেত্রে গোরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি কম্যুনিষ্ট গোরিলা বাহিনীর। জাপান এগিয়ে আসছে। তারা বুঝতেও পারছে না কে শত্রু কে মিত্র। হঠাৎ চারিদিক থেকে তাদের দুর্বল অংশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে জাপানের গতি সাময়িকভাবে বন্ধ হল।

মাও বলল, আমাদের বাহিনীতে শুধু মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করলেই হবে না। আমরা গ্রামরক্ষী গড়ব জাপানবিরোধী স্থানীয় গোরিলা দল গড়ব। আমাদের পক্ষে তাতে কোনই বেগ পেতে হবে না।

সু হাই-তুং সমর্থন করল মাওয়ের নীতি, বলল, জাপানের অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত। যে লোক কখনও রাজনীতির কথা চিন্তাও করেনি, সে মানুষ এগিয়ে আসবে জাপানকে রুখতে।

আমাদের এই প্রতিরোধ বাহিনীতে তিন শ্রেণীর লোক দরকার। এক তৃতীয়াংশ থাকবে আমাদের লোক যাদের রাজনৈতিক জ্ঞান আছে এবং কাজ পরিচালনার দক্ষতা আছে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে অন্যান্য দলের লোক যারা দেশপ্রেমকে সব চেয়ে বড় মনে করে আর অপর তৃতীয়াংশ থাকবে নির্দলীয় দেশপ্রেমিক। আমরা আমাদের মতামত চাপিয়ে দেব না। এরা সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ

করেই কাজ করবে। কোন দলেরই প্রভুত্ব থাকবে না অপরের ওপর।

সু বলল, তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। সমষ্টির প্রভুত্ব গণতন্ত্রসম্মত হলেও আমরা লঘিষ্ঠকে উপেক্ষা করতে পারি না।

সেই জন্যই এই ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এই অঞ্চলে আরও কিছু করতে হবে জনসমর্থন পেতে। প্রথমত খাজনা কমিয়ে দিতে হবে, দ্বিতীয়ত জমি বাজেয়াপ্ত করার নীতি বর্তমানে বন্ধ রাখতে হবে। নইলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের এই দেশরক্ষার যুদ্ধে সাহায্য পাওয়া খুবই মুস্কিল হবে। অবশ্য এতে জমিদারদের আয় কমবে কিন্তু বাকিবকেয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। তারা নিয়মমত খাজনা পাবে। চাষীরাও তাদের উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশের বেশি দেবে না খাজনা হিসেবে তাতে তারাও উপকৃত হবে। এতকাল জমিদাররা উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ নিয়ে এসেছে, তা না দিতে হলে নিশ্চয়ই তারা খুশী হবে। আমরা অন্তত সৌর্য্যের খাতিরে আমাদের অধিকৃত এলাকাকে আর সোভিয়েত বলব না, বলব সীমান্ত এলাকা।

মাওয়ের এই নীতি মধ্য চীনেও নতুন চতুর্থ বাহিনী গ্রহণ করেছিল। এই বাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছিল তারা লঙ্ মার্চের পর যে সব সৈন্য জীবিত ছিল তারাই নতুন করে বাহিনী গঠন করেছিল। নানচাং বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে অসাফল্যজনিত কারণে তার নেতা ইয়ে তিং পালিয়ে হংকং-এ আশ্রয় নিয়েছিল। তাকে ডেকে আনা হল হংকং থেকে এই বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

এই বাহিনীতে এসে যোগ দিল সিয়াং ইং। কিয়াংসিতে যখন সোবিয়েত গঠন করেছিল তখন এই সিয়াং ইং ছিল উপ-রাষ্ট্রপতি। তার সঙ্গে ছিল সহকারী রূপে চেন-ই। এই বাহিনীও অষ্টম বাহিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

ছাত্র ও শিক্ষকরা পঁয়ত্রিশ সালে পিকিংয়ের পথে নেমেছিল জাপানকে প্রতিরোধ করার আন্দোলন করতে। মুখ্যত এরা কম্যুনিষ্ট

প্রভাবান্বিত, তাই কুয়োমিনটাং সরকার একে মোটেই সমর্থন করেনি। এবার যখন সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠল তখন ছাত্ররা ও বুদ্ধিজীবিরা সমবেত হল কম্যুনিষ্টদের পাশে। বিশেষ করে গোরিলা-যুদ্ধের সাফল্য তাদের আকৃষ্ট করল, ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। চারিদিকে ধ্বনি উঠল, "Resist Japan and save the country"—এবার এই ধ্বনিতে সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল চীনের জনসাধারণ।

মাও আবেদন জানাল চীনের শ্রমিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের। এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছিল মাও এবং জেনারেল চু টে। এই আবেদনে বলা হয়েছিল, ঘৃণিত জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনকে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। চীনকে ক্রীতদাসে পরিণত করাই তাদের উদ্দেশ্য। জাপানীরা নরহত্যা করছে, নারী ধর্ষণ করছে, শোষণ করছে, জাপানী দস্যুরা দেশকে পদদলিত করছে। এতকাল চিয়াং কাইশেক বলে এসেছে জাপানকে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তাদের নেই অথচ আমাদের সোভিয়েতগুলো ধ্বংস করতে অনবরত আক্রমণ করেছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে রোধ করতে আমরা চিয়াং কাইশেককে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে অনুরোধ করে আসছি অথচ চিয়াং আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে আসছে। চিয়াং আমাদের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছে তাতে আমাদের জাপান প্রতিরোধ বৈপ্লবিক যুদ্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবুও আমাদের নীতি হল জাপানকে প্রতিরোধ করা। আমাদের শ্রমিক ও কৃষকের লাল বাহিনীকে পরিচালনা করতে চাই জাপানকে প্রতিরোধ করতে: আমাদের আর তো পথ নেই। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জাপানকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হওয়াই কাজ।

আবেদন জনমনে বিশেষ রেখাপাত করল। শ্রমিক কৃষক বাদেও ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিরা দলে দলে আসতে থাকে মাওয়ের কাছে। মাও নতুন কর্মনীতি স্থির করল। এই নীতি অনুসারে সৈন্য পরিচালনার

অফিসারদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করল। এই অফিসারদের সংখ্যা হল এক হাজার এবং তারা সবাই ছাত্র, আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাতে সুযোগ্য পরিচালকের অভাব না হয় তার জন্য বার শত ছাত্রকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হল। গোরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিন শত ছাত্রকে এবং অন্যান্য বিশেষ কাজের জন্য দুইশত ছাত্রকে মনোনীত করে তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও করা হল। এই মনোনয়নে কার কি রাজনৈতিক মত তা বিবেচনা যেমন করা হয়নি তেমনি পুরুষ অথবা স্ত্রী তাও বিবেচনা করা হয়নি। যোগ্যতার মাপকাটি হল সেই সব ছাত্র-ছাত্রী যারা জাপানকে প্রতিরোধ করতে প্রাণ দিতে ইতস্তত করবে না।

মাওয়ের এই দলে যোগ দিতে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী এসে হাজির হল ইনানে। মাও পেল সক্রিয় কর্মী ও বিশ্বস্ত অনুরাগীর দল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, কৃষ্টির বাহক, যন্ত্রবিদ আসতে থাকে মাওয়ের সীমান্ত অঞ্চলে। এই সময়ই এসেছিল একটা অপেরা সাংঘাই থেকে নাটক অভিনয় করতে। অভিনেত্রীদের একজন হল ল্যান-পিঙ, পরবর্তী কালে এই ল্যান-পিঙ্ হয়েছিল মাওয়ের তৃতীয়া পত্নী।

মাওকে প্রশ্ন করেছিল তার এই অবিবেচক কাজের জন্য। এর উত্তরে মাও বলেছিল, ভালবাসা বড়ই অন্ধ।

বড়ই সুখের কি ?

সুখ। তা বটে। আমি হারালাম আমার স্ত্রী কাই-হুইকে, হারালাম একটি ভাইকে, একটি ভগ্নীকে। তবুও সুখের শেষ নেই। আরেক ভাই সে-মিন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এও কি কম সুখের! কেউ আমাকে মনে করে দস্যুদলের সর্দার, কেউ মনে করে বিপ্লবের নেতা, কেউ মনে করে অসদাচারী, আরও কত কিছু। এই সবই বুঝি আমার সুখের ?

তোমার চরিত্র হল বিভিন্ন বিপরীতধর্মী গুণের ও দোষের সমাহার।

অস্বীকার করছি না। আমার দোষই বল আর গুণই বল আমি সর্ব প্রথম চীনা, তারপর আমি কম্যুনিষ্ট। সেজন্য আমার লক্ষ্য হল চীনকে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের হাত থেকে রক্ষা করা তারপর দেশীয় শোষক সমাজের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা। তার জন্য সময়মত নীতি বদল করতে যেমন হয় তেমনি কাজে কোথাও কোথাও এলোমেলো ভাব দেখা যায়। কিন্তু মূলত আমি স্থির রয়েছি আমার জীবনদর্শনে। কোথাও কোন ত্রুটি নেই অথবা পদস্খলন নেই।

তোমার ভাই সে-মিন এতকাল ছিল সীমান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। সে কেন গেল সিংকিয়াং-এ জেনারেল সেং-এর অধীনে কাজ করতে।

সেখানেও তো সে অর্থ উপদেষ্টার কাজ করছে।

কিন্তু জেনারেল সেং লোক ভাল নয়। যুদ্ধবাজ অভিজাত, সেতো বুর্জোয়ার দালাল।

বর্তমানে সে মসকোপন্থী। সে জন্য খুব বেশি চিন্তা করার নেই।

তোমার কথায় মনে হয় তোমার চাষারে ভাব এখনও কাটেনি অবশ্য তোমার বুদ্ধিমত্তাকে অনেকেই শ্রদ্ধা করে।

মাও হাসতে হাসতে বলল, আমি তো চিরকালের চাষা। আমার যদি চাষারে ভাব না থাকে তা হলে কার থাকবে বলতে পার? আর বুদ্ধিমত্তা? সেটা তোমরা বিবেচনা করবে।

সবাই মনে করে তুমি আত্মম্ভরি।

যাদের আত্মবিশ্বাস আছে তাদের অনেকেই ঐভাবে ছোট করতে চায়।

কারণ, তুমি খেয়ালের ওপর কাজ কর। কারও কোন যুক্তি শুনতে চাও না।

এটা ঠিক কথা নয়। আমি সকলের মতামতকে শ্রদ্ধা করি। বাস্তব যুক্তি ভিন্ন কোন বিষয় আমি গ্রহণ করি না। এতে অনেকে মনে করে

আমি খেয়ালের ওপর কাজ করি। কাজের ফল দেখে তোমরা বিচার করতে পার।

আমাদের মনে হয় তোমার আচরণই তোমাকে বন্ধুহীন করেছে।

কে বলল আমি বন্ধুহীন। আমার সহকর্মী সবাই আমার বন্ধু। তাদের সুখ আমার সুখ; তাদের দুঃখ আমার দুঃখ। এতেও বলতে চাও আমি বন্ধুহীন।

চৌকে সবাই ভালবাসে তোমাকে সবাই ভালবাসেনা কেন?

এটা জেনারেলের সৌভাগ্য এবং আমি এতে অতিশয় আনন্দ অনুভব করছি। তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভালবাসা চাই না, আমি চাই শ্রদ্ধা। আমার প্রতি শ্রদ্ধা নয়, আমার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা। তা যদি থাকে তা হলে আপনা থেকেই আমি ভালবাসা লাভ করব।

সহকর্মীদের অনেকেই বলেছে, তোমার আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও আদর্শে প্রগাঢ় বিশ্বাস আমরা শ্রদ্ধা করি।

সহকর্মীদের মধ্যে একজন বলেছিল, ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করে যে ভাবে তুমি এগিয়েছ পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল।

মাও সত্যিই ব্যক্তিগত জীবনে বৈষয়িক বুদ্ধিতে খুবই উদাসীন ছিল। একমাত্র তাকে যখন চিন প্রশ্ন করেছিল, তুমি পর পর তিনটে বিয়ে করলে কেন?

মাও হেসে বলেছিল, তুমি কাউকে ভালবেসেছ চিন?

আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি।

আমিও ভালবাসি আমার স্ত্রীকে।

সব স্ত্রীকেই তুমি কি ভালবেসেছ?

না। আমি ভালবেসেছিলাম কাই-হুইকে। জীবনে যদি কাউকে ভালবেসে থাকি তো একমাত্র তাকে। কাই-হুইয়ের মৃত্যু আমার পক্ষে যত বেদনাদায়ক এতটা আর কিছুই নয়। ঝু-চেনকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কষ্টকর জীবনের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে নিলেও

কোন সময়ই তাকে ভালবাসতে পারিনি, কারণ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দম্ভ। মানুষের জীবন হল কর্মের কিন্তু সেই কর্মের মাঝে যখন মানুষ ক্লান্ত হয় তখন তার প্রয়োজন হয় প্রশান্তির। কিন্তু ঝু-চেন প্রশান্তি আনতে পারেনি। অবসর বিনোদনের সময় সে আমার আদর্শকে ব্যঙ্গ করেছে, আমার কাজ যে মূর্খতার পরিচায়ক তাও বলেছে, ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সা তাকে কলহ করতে বাধ্য করেছে তাই ব্যক্তিগত জীবনে আমি ছিলাম অসুখী। সেই গুরুতর অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই বিবাহবিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়েছিল।

সে তোমার পাঁচটি সন্তানের মা।

আমি পিতার কর্তব্যে কখনও অবহেলা করিনি। তবে তাকে দোষারোপ করছি না। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা লঙ্ মার্চের সময় ঝু-চেন আমার পাশে থেকেছে। তার বংশপরম্পরায় যে জমিদারী মন সেই মনকে সে জয় করতে পারেনি বলেই দুঃখ-কষ্ট অসহ্য মনে হয়েছিল তার, সেজন্যই সে আমাকে সুখী করার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তোমরা বলবে সে খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী ছিল। আমি বলব তা নয়। ব্যক্তিত্ব বলতে যা তোমরা বুঝতে চাও তা আমি বুঝিনা। স্বামীর কর্মে সমান অংশীদার হওয়া, বিপদে সাহায্য করা, মন্ত্রণা দান করা—এগুলোই ব্যক্তিত্বের পরিচয়। তাতে সে কুণ্ঠাবোধ করেছে। সে কাজে সে কোন মতেই স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে পারেনি। এ কাজ পেরেছিল কাই-হুই। যখনই কাই-হুইকে মনে পড়ে তখনই মনে হয়ঃ

আমি আমার পপলার বৃক্ষটি হারিয়েছি, তুমিও হারিয়েছ তোমার উইলো বৃক্ষ।

দুটো গাছই মাথা তুলে ছিল ;

তারা আকাশের অন্তে অন্য আকাশের দিকে মাথা উঁচু করেছে।

কাই-হুইকে আমি পাপলার বলেই ডাকতাম। আর উইলো বলে ডাকত আমার বন্ধু লি সু-ই তার স্ত্রীকে। লি তার স্ত্রীকে হারিয়েছিল।

দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। 'বলেছিলাম তুমি হারিয়েছ তোমার উইলোকে আমি হারিয়েছি আমার পপলায়কে। তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। আকাশের নিলীমার মাঝে দুজনেই হারিয়ে গেছে। আমাদের জন্য রেখে গেছে শুধু বেদনা। তারপর এল লিন-প্যাঙ্। আমি তাকে পেয়ে সুখী। আমার মনের শূন্যতা পূর্ণ করেছে সে। তাই তাকে ভালবেসেছি।'

মাও ভালবাসতে পেরেছে। ব্যক্তিগত ভাবে সে সুখী। সুখী বলেই সে কাজে এগিয়েছে; লিন-প্যাঙ্ তার কর্মে সহচরীরূপেই এগিয়ে আসে সব সময়।

ব্যক্তিগত জীবনে মাওয়ের কোন ভোগ স্পৃহা ছিল না। তার আদর্শ বাদ দিলে অন্য সব বিষয়ে তার ছিল ঔদাসীন্য। নিজের পরিধেয় সম্বন্ধেও মাও ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার। এমন দেখা গেছে মাও একমাত্র আণ্ডারওয়ার পরেই সারাদিন কাটিয়েছে, তার পাতলুন পড়ার সময় পর্যন্ত পায়নি। মাও চীনের চাষাদের মত তামাক খায়। তাদের মতই মুখের শব্দ করে। তাতে সে নির্বিকার। কোন সময়ই সেজন্য রুচিহীন বলে তাকে মনে হয় না। এর জন্য মোটেই লজ্জিত নয়।

অনেক বিদেশী সাংবাদিক মাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছে। তারা বলেছে কুয়োমিনটাং অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে চলাচলে যে সব অসুবিধা অথবা বাধা নিষেধ ছিল, কম্যুনিষ্ট অধিকৃত সীমান্ত অঞ্চলে সে রকম কোন অসুবিধা অথবা বাধা নিষেধ তাদের ছিল না। মাও তথা কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধে পৃথিবী ছিল অজ্ঞ। মাওয়ের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা করে এবং কম্যুনিষ্ট এলাকা ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখে এই সব সাংবাদিকদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হয় উপরন্তু তারা এতকাল কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে যে বিরূপ ধারণা পোষণ করেছে তাও বিলুপ্ত হয়।

চীনারা আগ্রাসী জাপানকে বাধা দিয়েছে। বহু রক্তপাত ঘটেছে।

জাপানের প্রবল শক্তিকে রোধ করতে পারেনি চীনের মানুষ।

আটত্রিশ সালে সাংঘাই দখল করতে জাপান সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর জাপান সাংঘাই দখল করে, আবার চীনাদের কাছে তাইয়ারচুয়াং-এ জাপানীরাও গুরুতর ভাবে পরাজিত হয় কিন্তু জাপানের পক্ষে শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে চীনের সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরগুলো দখল করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। তারা ক্রমে ক্রমে উপকূলের শহর দখল করতে থাকে, একমাত্র সাংঘাইতে যা কিছু প্রচণ্ড বাধা পেয়েছিল।

পিকিং থেকে নানকিং-এ রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিল চিয়াং। তাও রক্ষা করতে পারল না, নানকিং-এর পতন ঘটল সাঁইত্রিশে। চিয়াং রাজধানী নিয়ে গেল চুংকিং-এ।

নানকিং দখল করে জাপান যে অত্যাচার করেছিল তার ইতিহাস লেখা হয়নি। এই কলঙ্কিত ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয় তা হলে ঘৃণায় কেউ জাপানের নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করবে না। পুরুষদের তরবারির আঘাতে শিরোচ্ছেদ করেছে জাপানী দস্যুরা। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে। শিশুকে হত্যা করেছে, নারীকে উলঙ্গ করে রাজপথে পশুর মত একজনের পর আরেক জন ধর্ষণ করেছে, প্রতিটি গৃহ লুট করেছে, কোথাও সামান্য বাধা পেলে সেই গৃহের সমস্ত অধিবাসীকে পুড়িয়ে মেরেছে, উলঙ্গ করে পুরুষ ও নারীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচারের পর হত্যা করেছে। এই সব সংবাদ সভ্য জগতে ধীরে ধীরে এসে পৌঁছেছে তবুও জাপান তাতে লজ্জিত হয়নি, শক্তিশালী তথাকথিত সভ্য পশ্চিমী শক্তিরা তাতে বাধা দেয়নি। আধুনিক যুগে জাপানের এই ভয়াবহ অত্যাচারের তুলনা আর নেই।

চীনের অধিবাসীরা নীরবে সহ্য করেনি। তারা আরও সংঘবদ্ধ হল চীনকে রক্ষা করতে আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে চির বিদায় করতে। চিয়াংবাহিনী সরে গেল পেছনে, রাজধানী গেল চুংকিং-এ। পেছনে জাপানকে বাধা দিতে রয়ে গেল মাওয়ের গোরিলাবাহিনী। তারা

সার্থকভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে জাপানের অধিকৃত এলাকায়।

মাও কলম তুলে নিল হাতে। আর বক্তৃতা নয়, মাঠে মাঠে ঘোরা নয়। তার বক্তব্য পৌছে দিতে আরম্ভ করল লেখার মাঝ দিয়ে।

মাও যুদ্ধ পরিচালনা করছে জাপানীর বিরুদ্ধে। যুদ্ধের কৌশল সেই পূর্বতন গোরিলা যুদ্ধ। গৃহ যুদ্ধের সময় যেমন শক্তিশালী শত্রুকে পাশ কাটিয়ে তাদের দুর্বলস্থানে আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিল এবারও সেই বক্তব্য পেশ করল তার লেখার মধ্য দিয়ে। মাও বলল, জমি দখল নয়, শত্রুর সৈন্য বিনাশ কর। তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলো সুযোগমত ভেঙ্গে দাও। আটশ' মুক্তি যোদ্ধার রক্ত দিয়ে হাজার শত্রুর বিনাশ আমরা চাই না। আমরা চাই সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতি করতে। একটার পর একটা শত্রুকে নিপাত ঘটাও। এক সঙ্গে বহুজনের সঙ্গে লড়তে যেওনা।

মাও জাতীয়তাবাদ প্রচার করে চীনের সাধারণ মানুষকে জাপানের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করল, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাপানের দুষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে লাগল জনসাধারণের সামনে—তাতে একটি কথাই জোর দিয়ে বলা হল, to fight to death to kill the enemy—মৃত্যুর বিনিময়ে শত্রু ধ্বংস করতেই হলে। মাও সবাইয়ের কাছে আবেদন জানাল, তোমরা ভয়হীন হও। মৃত্যু একদিন আসবে কিন্তু মাতৃভূমিকে যদি মৃত্যুর বিনিময়ে রক্ষা করতে না পার তা হলে উত্তরপুরুষ মার্জনা করবে না বর্তমান চীনকে।

তোমরা শত্রু দেখলে ইঁদুরের মত গর্তে পালিও না। বেড়াল দেখলে ইঁদুর পালায়। বেড়াল ইঁদুরকে হত্যা করতে পারে তাই সে পালায়। শত্রুর হাতে অস্ত্র আছে, সে তোমাকে হত্যা করতে পারে তাই এই ভয়ে পালিয়ে যেওনা। ইঁদুর-বেড়াল একজাতের নয় কিন্তু আমরা ও আমাদের শত্রুরা একজাতের আমরা মানুষ, শত্রুও মানুষ। তাদের কেন

ভয় করবে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, তাদের দলে ঢুকে নাশকতামূলক কাজ করতে হবে।

শত্রুর হাতে অস্ত্র। এই অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। মৃত্যুকে ভয়? কেন! তোমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় যখন শত্রু হত্যা করবে তখন তোমার ভয় করবে না? বরং বাধা দাও। ওরা আমাদের হত্যা করতেই এসেছে। আমরা বাধা না দিলেও হত্যা করবে। কাপুরুষের মৃত্যু কি তোমরা চাও? আমরা তা চাই না। অত্যাচারীকে বাধা দেব তার জন্য মৃত্যু হয়, হোক।

এই গুরুতর সঙ্কটের সময় মাওয়ের প্রভাব দশগুণ সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেল। মাওয়ের আহ্বানে সারা দিল সমগ্র চীন। মাও বলল, জাপানের বিরুদ্ধে চীনের এই সংগ্রাম শুধু চীন ও জাপানেরই শিক্ষাস্থল নয়। পৃথিবীর সকল জাতিই শিক্ষা লাভ করবে আমাদের এই সংগ্রাম থেকে, প্রত্যেক দেশের প্রগতি প্রেরণা পাবে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী পেষণে নিষ্পেষিত ভারতবর্ষ এ-থেকে বেশি প্রেরণা লাভ করবে। আমরা বাঁচব পরাধীন অন্যান্য জাতিও বাঁচবে।

আমার দেশের এই বীর সেনানীদের জন্য আমি গর্বিত, বলল মাও।

চু টে বলল, চীনের এই মর্মভেদী বেদনাকে জয় করতে বীরত্ব ও শৌর্যের প্রয়োজন। তা আমরা যথেষ্ট প্রমাণ করেছি। এরজন্য গর্ব আমরা করতে পারি।

মহিলাদের ঘরোয়া সভায় চীনের এই বীরত্ব নিয়ে আলোচনা করছিল মুক্তিযুদ্ধের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্ত্রীগণ। তারাও তাদের স্বামীদের সঙ্গে এতকাল মর্মভেদী বেদনার অংশীদার হয়েই আসছে।

ম্যাদাম চ্যাং বলল, আমাদের এই জাপান বিরোধী সংগ্রাম শুধু আমাদের জন্য নয়। যুগে যুগে সর্বদেশের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য।

ম্যাদাম লি বলল, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতা মাও বলেছেন, চীনের বিপ্লব যে আদর্শ স্থাপন করবে পৃথিবীর সামনে তা থেকে সাম্রাজ্যবাদীর উপনিবেশ সমূহ স্বাধীনতার পথে এগোতে পারবে।

আমার বিশ্বাসও তাই, বলল ম্যাদাম সুং।

ম্যাদাম সুং ডাক্তার সান ইয়াত সেনের বিধবা স্ত্রী।

চিয়াং কাইশেকের স্ত্রী আর ম্যাদাম সুং দুই বোন।

সুং চিয়াং কাইশেকের শাসন ব্যবস্থাকে মোটেই পছন্দ করে না। সেও এসে হাজির হয়েছে তার স্বামীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে মাও সে-তুংয়ের সীমান্ত অঞ্চলে। প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছে জাপান প্রতিরোধ আন্দোলনে, তথা সাম্রাজ্যবাদকে বরবাদ করতে।

ম্যাদাম সুং বলল, চীনের এই সংগ্রাম অবশ্যই পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করবে। আমাদের সংগঠন গড়ে তোলার যে নয়া ব্যবস্থা তা অন্য দেশেও সংগঠন গড়ে তুলতে নিশ্চিত সাহায্য করবে।

ম্যাদাম লি ও ম্যাদাম চ্যাং তাদের বক্তব্যে এই অভিমত সমর্থন করল।

ম্যাদাম সুং বলল, মাও বলেছে আমাদের যুদ্ধ তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। বর্তমানে আমাদের প্রথম অধ্যায় চলছে। এই অধ্যায়ে আমরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করছি। এর পরই ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হবে, উভয় পক্ষ সমান সমান চলবে। বিশেষ করে গোরিলা যুদ্ধে জাপানকে এক পাও এগোতে দেবে না। জাপান অধিকৃত অঞ্চল ধীরে ধীরে মুক্ত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে জাপান নেবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, তখন আমাদের করতে হবে ব্যাপক আক্রমণ। এই কাজের জন্য কুয়োমিনটাং বাহিনী ও আমাদের মুক্তি ফৌজ তার সঙ্গে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যান্য দল উপদলকে সক্রিয় ভাবে রণক্ষেত্রের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এতেই আমাদের জয় নিশ্চিত।

ম্যাদাম লি বলল, একটা খবর শুনেছ?

কি খবর? জানতে চাইল ম্যাদাম চ্যাং।

ইউরোপে আবার যুদ্ধের বাজনা বেজেছে।

ম্যাদাম সুং বলল, বাজনা শেষ, এখন কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমরা কার যে সমর্থন লাভ করব তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না। মাও নিজেও স্থির করতে পারছে না।

সম্ভব নয়। একদিকে জার্মান অপর দিকে ইংরেজ-ফরাসী। বিবদমান উভয় পক্ষই সাম্রাজ্যবাদী। কোন প্রগতিমূলক চিন্তাধারা নেই এই যুদ্ধের পেছনে। নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় হানাহানি করছে। এর পেছনে কারও কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তাই তাদের সাহায্য নেওয়া বা পাওয়া মোটেই প্রার্থিত বস্তু নয়। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীর কাপুরুষতা লক্ষ্য করেছ। প্রতিবারই সে জার্মানের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, জাপান চীনকে আক্রমণ করা সত্ত্বেও তারা অক্ষম নপুংসকের মত দাঁড়িয়ে দেখেছে চীনের দুর্ভাগ্য। একবার আঙ্গুল তুলে সাবধান বাণীও শোনায়নি! সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থহানির ভয়ে ইংরেজের ভূমিকা হল অতি নিন্দনীয়। এদের ওপর ভরসা রাখা উচিত নয়।

বাধা দিয়ে ম্যাদাম লি বলল, জার্মানকেই বা বিশ্বাস কি!

ম্যাদাম সুং বলল, জার্মানকেও বিশ্বাস নেই। জাপানের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জার্মান তো কোন প্রতিবাদ জানায়নি, উপরন্তু তারা জাপানকে সমর্থন জানিয়েছে প্রথমাবধি। কোনক্রমেই জার্মানকে সমর্থন করা উচিত নয়। দুর্বলের শান্তিরক্ষার ভূমিকা হাস্যজনক হলেও ইংরেজ যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু শান্তিরক্ষা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ইংরেজ কাপুরুষ কিন্তু সে শান্তি বজায় রাখতেই চেয়েছে। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই।

কিন্তু মাও বলে, ক্ষিপ্ত কুকুরের মত বিবদমান কোন পক্ষকেই সমর্থন জানানো যায় না। বিশেষ করে ইংরেজ হিটলারের চেয়েও নিকৃষ্ট। এদের কাজ হল অপরকে আঘাত করে পৃথিবীর শান্তি ও সম্পদ নষ্ট করা তৎসহ নরহত্যা করা। সেজন্য মাও কাউকেই সমর্থন জানায়নি।

জার্মান সোভিয়েতের সঙ্গে আক্রমণ চুক্তি করেছে। জাপান প্রতিবাদ করেছে এই আক্রমণ চুক্তির।

জাপানের হিতাকাঙ্খী জার্মান যদি সোভিয়েতের সঙ্গে হাত মিলায়

তা হলে সোভিয়েতের মিত্র চীনের সঙ্গে আক্রমণাত্মক এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জাপানকে নিশ্চয়ই সতর্ক করবে। জাপান মনে করে সোভিয়েত সাহায্য চীনে আসবে না, কারণ পশ্চিম সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে মহাশক্তিশালী জার্মান। সোভিয়েত তার পশ্চিমকে সুরক্ষিত করল এই চুক্তি দিয়ে। এবার পূর্বে নজর দেবার অবসর পাবে। সাহায্য পাবে সোভিয়েতের, এই তার ভয়। এতে জাপানের আগ্রাসী নীতি বাধা পাবে।

কিন্তু স্টালিন জাপানকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনটাং-এর ঐক্য খুব ভাল নজরে দেখছে না। চীনের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে স্টালিনের বিশেষ সহানুভূতি নেই বলে মনে হচ্ছে, কুয়োমিনটাং বরং সোভিয়েতের আদরের তুলাল। মাও এটা বুঝতে পেরেছে। চীন সম্বন্ধে সোভিয়েতের মনোগত অভিলাষ কারও জানা নাই। মাও বলছে কুয়োমিনটাং-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আবার কম্যুনিষ্টরা নিজস্ব একটা সত্ত্বা নিয়ে থাকবে চিরকাল, স্বাধীনভাবেই কাজ করে চলবে সব সময়।

ম্যাদাম লি ও ম্যাদাম চ্যাং-এর কথা শুনছিল সবাই। মাঝখানে ম্যাদাম সুং বলল, মঁ ওয়াং সিং সোভিয়েত থেকে দেশে ফিরে এসেছে। ছয় বছর ওয়াং ছিল মসকোতে। স্টালিনের উপনিবেশ সম্বন্ধীয় উপদেষ্টারূপেও কাজ করেছে, সোভিয়েতে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে তার বিশেষ প্রভাবও আছে। চব্বিশ-সাতাশ সালে যখন প্রথম কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্টদের ঐক্য আলোচনা হয় সে সময় ভারতের মানবেন্দ্র রায় এসেছিল আমাদের দেশে কম্যুনিজম ব্যাখ্যা করতে, এবার ওয়াং এসেছে সেই কাজ করতে।

ম্যাদাম চ্যাং বলল, তার উদ্দেশ্য ?

কুয়োমিনটাং আর কম্যুনিষ্টদের ঐক্যসাধন।

উদ্দেশ্য মহত।

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় কিন্তু সে চায় কুয়োমিনটাংকে

প্রাধান্য দিতে। চীনের নেতৃত্ব থাকবে চিয়াং-এর হাতে, তার তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে কম্যুনিষ্টদের আর ধীরে ধীরে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিলোপ ঘটবে। স্টালিনের কাছ থেকে এই শিক্ষাই সে নিয়ে এসেছে। আমরা এই প্রস্তাব মোটেই গ্রহণ করতে পারি না। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অনাক্রমণ চুক্তি সর্বতোভাবে যেমন গ্রহণ করা সম্ভব নয় তেমনি ওয়াং-এর প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের বক্তব্য নিশ্চয়ই কিছু আছে।

আছে। মাও দৃঢ়ভাবে বলেছে চীনের বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে কম্যুনিষ্ট পার্টি, তার সহায় হবে চীনের সর্বহারা জনসাধারণ—*আমরা নিশ্চিতভাবে নেতৃত্ব দেব, কুয়োমিনটাং নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে মাওয়ের এই মতকে সমর্থন করি।

ম্যাদাম লি বলল, মাও বলেছে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই চিয়াং-এর। তার অযোগ্যতা প্রমাণ হয়েছে। আমরা চীনের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম। আমরা কোনক্রমেই কুয়োমিনটাংকে নেতৃত্ব করতে দিতে চাই না।

ম্যাদাম সুং বলল, লেলিন বলেছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে প্রগতিশীল রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে গড়তে প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থান করে নেয় তারপর আসে সমাজতন্ত্র। আমাদের দেশেও তাই হবে। আমাদের গণতন্ত্র একটা নতুন পরীক্ষা। এর নাম হবে নবগণতন্ত্র—বুর্জোয়া গণতন্ত্র পরিচালনা করে ধনিকশ্রেণীরা নিজেদের স্বার্থে আর আমাদের নবগণতন্ত্র পরিচালিত হবে সম্মিলিতভাবে সমষ্টির স্বার্থে—এতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবী যেমন থাকবে তেমনি থাকবে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি।

---

* অনেকের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত-নাৎসী চুক্তি হওয়ার পর মাও কুয়োমিনটাংয়ের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হয়েছিল। অবশ্য তার "On New Democracy"-তে মাও বলেছিল, যদি কুয়োমিনটাং এই নেতৃত্ব দেবার যোগ্য হয় তবে কম্যুনিষ্ট পার্টি তা স্বীকার করতে রাজি।

ম্যাদাম লি এই নবগণতন্ত্রের ব্যাখ্যাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পেরে বলল, এতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

কিছুটা ত্যাগ করতে হবে বইকি। তবে এই সাময়িক ব্যবস্থাকে কায়েমী মনে করলে ভুল হবে। চীনের জাগরণ নতুন পথ ধরবে অচিরেই।

মাওয়ের এই নীতি কিন্তু সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি অনেকেই। লেলিন কৃষক শ্রমিকদের বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের কথা বলেছে, কতকগুলো অবস্থায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার চেষ্টাকেও সমর্থন করেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব মাওয়ের হাতে থাকলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দুজন। তাদের একজন চ্যাং কু-তাও। চ্যাং অতীতেও মাওয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি বর্তমানেও তার সহযোগিতা পাবার কোন আশা ছিল না। চ্যাং মাওয়ের প্রভাব খর্ব করতে চু টেকে নিজের দলে টেনেছিল কিন্তু অচিরেই চু টে মাওয়ের দলে এসে যেতেই সে বিপন্ন বোধ করছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর মাওয়ের প্রভাব সে সহ্য করতে পারত না। যখন কোন মতেই মাওকে নীচে নামাতে পারল না তখন চ্যাং কম্যুনিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার বাইরে চলে গেল। চ্যাং আশ্রয় নিল চিয়াংয়ের।

আরেকজন ওয়াং মিং। চ্যাং ছিল ওয়াং-এর শক্তির উৎস। চ্যাং চলে যাবার পর ওয়াং আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

চ্যাং ও ওয়াং আগাগোড়াই চিয়াংকে তোষণ করতে সচেষ্ট ছিল, সেজন্য পার্টিতে ক্রমেই তারা অপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এমত অবস্থায় চ্যাংয়ের পলায়নের পর ওয়াংও আর বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। ওয়াংকে মাওয়ের অধীনে থেকেই কাজ করতে হচ্ছিল।

অষ্টম বাহিনী ক্রমেই প্রসার হতে থাকে। চিয়াংয়ের মাথা ব্যথাও বাড়তে থাকে। অষ্টম বাহিনীতে তখন চার লক্ষের মত নিয়মিত সৈন্য ও গোরিল্লা যোদ্ধা নাম লিখিয়ে কাজে নেমেছে কিন্তু এই অনুপাতে

নতুন চতুর্থ বাহিনীতে এক লক্ষের চেয়েও কম নিয়মিত সৈন্য ছিল। মাও বুঝতে পারল জন সংযোগ বিশেষ ভাবে করা হয়নি বলেই নতুন চতুর্থ বাহিনীর প্রসার সম্ভব হয়নি সেজন্য মাও পত্র দিল চেন-ইকে। অবিলম্বে যাতে সৈন্য বাহিনীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার নির্দেশ ছিল। আরও নির্দেশ ছিল পশ্চিমে নানকিং থেকে পূর্বে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলের জেলাগুলিতে সত্বর কম্যুনিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে।

চিয়াং চোখ বুঁজে বসে ছিল না। কম্যুনিষ্টরা যে জাপানকে নানা ভাবে ঘায়েল করছে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ না হলেও কম্যুনিষ্ট শক্তি যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তাও বুঝতে পারল। জাপানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার পর কুয়োমিনটাং সরকার যে বিপন্ন হবে তাও বুঝতে পারল। এমন সময় ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ হারতে আরম্ভ করল। এতে অনেকে উৎসাহিত হল। অনেকে মনে করল যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চিয়াং মনে করল তার বন্ধু ইংরেজ ফরাসীর পতনের পর আর কোন আশা নেই তাদের সাহায্য পাবার।

নানকিং তখন জাপানের দখলে।

সেখানে নতুন সরকার স্থাপন করেছে ওয়াং চিং-উই। এই ওয়াং মূলত জাপানের হাতের পুতুল। জাপান তখন জার্মানের বন্ধু। জার্মানের জয়ে জাপান উল্লসিত। তাদের তাঁবেদার ওয়াং তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করল ইংরেজ ও ফরাসীর পরিণতি কি হতে পারে। সেই পরিণতির সঙ্গে চিয়াং ও মাওয়ের ভাগ্য যা হতে পারে তাও ঘোষণা করল। সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইল জাপানের ক্ষমতা এবং চীনের উন্নত ভবিষ্যৎ জাপানের দয়াতেই সম্ভব তাও বলল। যুদ্ধ প্রায় শেষ একথাও বলল ওয়াং। এমন সময় মাও আরও বেগে দুর্মদভাবে জাপানকে আক্রমণ করল। মাওয়ের এই যুদ্ধ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার অর্থ যারা মনে করে যুদ্ধ শেষ, জাপানের জয়জয়কার হয়েছে তাদের মোহভঙ্গ করা। অষ্টম বাহিনীর চার লক্ষ সৈন্য একই সময়ে উত্তর চীনের চারটি প্রদেশে ভীমবেগে জাপানকে আক্রমণ করল।

এই আক্রমণে জাপান বিপন্ন হয়ে উঠল, গুরুতর ক্ষতি হল জাপানের। রেলপথ রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। জাপানীরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটেই অগ্রসর হতে পারল না।

আবার নতুন চতুর্থ বাহিনী জাপানকে যে ভাবে আক্রমণ করছিল এবং যে ভাবে তারা নিজেদের সম্প্রসারিত করছিল তা কুয়োমিনটাং সহ্য করতে পারছিল না। ক্রমেই নতুন চতুর্থবাহিনীর সঙ্গে চিয়াং-বাহিনীর অসদ্ভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। চেন-ই চিয়াং-এর আচরণ সহ্য করতে না পেরে উত্তর কিয়াংসুতে কুয়োমিনটাং বাহিনীকে আক্রমণ করল। আবার কম্যুনিষ্ট কুয়োমিনটাং-এ রক্তাক্ত অশান্তি আরম্ভ হল। কুয়োমিনটাং বাহিনী পরাজিত হবার খবর পেতেই চিয়াং সরকার আরও বেশি শক্ত হল কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে। চিয়াং তো অসন্তুষ্ট ও ভীত হলই, তারওপর এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে আরও বেশি আপোষহীন হয়ে উঠল কুয়োমিনটাং। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে ঘা খেতে লাগল। মাও বৃদ্ধি করতে থাকে তার প্রভাব ও শক্তি, চিয়াং তাকে প্রতিরোধ করার পথ খোঁজে।

চেন-ইর সঙ্গে সংঘর্ষ কম্যুনিষ্টদের পক্ষে আশীর্বাদ। জাপানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছিল তা চলতে থাকে কিন্তু আগে জাপানকে প্রতিরোধ ব্যাপারে কুয়োমিনটাং-এর নির্দেশ মেনে চলছিল কম্যুনিষ্টরা। এই ঘটনার পর তারা আর কুয়োমিনটাং-এর কোন নির্দেশই মানত না। মুক্তিফৌজ সরাসরি মাওয়ের নির্দেশেই চলত। জাপান বুঝেছিল জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করা যত সহজ কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তত সহজ নয়। জাপানী রণনেতারা গোরিলা আক্রমণে বিভ্রান্ত ও অতিষ্ট হয়ে উঠল। তারা নির্দেশ দিল, 'burn all, kill all, loot all'—পুড়িয়ে দাও, হত্যা কর, লুঠ কর। উত্তর চীনের এই নীতি সভ্য জগতের কোন নিয়ম কানুন মেনে চলেনি। অষ্টমবাহিনীও সর্বপ্রকারে বাধা দিতে থাকে জাপানকে। এতে বহু লোকক্ষয় হল, কম্যুনিষ্ট অধিকৃত বহু এলাকাও জাপানের হাতে গেল। জাপানের অত্যাচার যত

বৃদ্ধি পায় তত বেশি তাদের প্রতিরোধ করার দৃঢ়তা জাগে জনমনে। জাপান গোরিলা আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের অধিকৃত সমগ্র এলাকা কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে রাখল, চলাচল বন্ধ করে দিল। এর ফলে কম্যুনিষ্ট এলাকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও দেখা দিল।

মাও তার সহকর্মীদের ডেকে মন্ত্রণাসভায় স্থির করল, ভূমির উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয় তার জন্য চেষ্টা করতে। চাষী, মুক্তিযোদ্ধা ও শ্রমিকদের একযোগে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে কাজ করতে নির্দেশ দিল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে।

মাও নতুনভাবে রাজনৈতিক ভাষ্য দিল। কম্যুনিষ্ট মাত্রেই মার্কসবাদী। তারা বিশ্ব কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কসবাদকে জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। তারপর জাতির উপযোগী করে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। (A Comunist is a Marxist Internationalist but Marxism must take on a national form before it can be applied) - দেশের উপযোগী করে মার্কসবাদকে প্রয়োগ না করতে পারলে মার্কসবাদ সাফল্যলাভ করে না। আমরা চীনের অধিবাসী। আমাদের রক্ত মাংস ও মন সম্পূর্ণরূপে চীনের উপযোগী এবং চীনের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। আমরা যদি চীনকে ভুলে যাই এবং মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি তা ব্যর্থ হবে, কারণ তা অবাস্তব। বিদেশীয় ধারায় মার্কসবাদকে চিন্তা না করে চৈনিক ধারায় তার বিশ্লেষণ করতে চাই এবং তার সফল প্রয়োগ করতে চাই। আমরা মার্কস, লেলিন, এনজেল, স্টালিনের কথা বলি তাদের ঠিকুজি কোষ্ঠি নিয়ে আমাদের সব উৎসাহ উদ্দীপনাকে ক্ষয় করি অথচ আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলে যাই তা হলে আমরা অগ্রসর হতে পারব না। সাধারণ মানুষের জীবনে মার্কস্, লেলিন তখনই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে তখনই তারা সাম্যবাদে আগ্রহী হবে যখন আমরা তাদের মনের মতন করে মার্কসীয় দর্শন দেশের উপযোগী করে রাখতে পারব।

মাও তার মার্কস্‌বাদ প্রয়োগের নব প্রচেষ্টায় বিদেশীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠতে নির্দেশ দিল। বিদেশ থেকে যে সব ছাত্র শিক্ষালাভ করে এসে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল তাদের বিদেশীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠতে নির্দেশ দিয়েছিল, তাদের বিদেশীয় হাবভাব মাও সুচক্ষে দেখত না। এবার মাও শুধু তাদের সংযত করতে সচেষ্ট নয়, যে কোন বিদেশীয় চিন্তাধারা ও হাবভাব সংযত করতে সচেষ্ট। সোভিয়েতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওয়াং ছিল বিদেশীয় ধরণে চীনের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনার সমর্থক। ফলে সোভিয়েতের প্রভাব ছিল বেশি, মাওয়ের এই নতুন নির্দেশে সেই প্রভাব হ্রাস পেল, বলতে গেলে সোভিয়েতের প্রভাবমুক্ত হল চীনের কম্যুনিষ্টরা। তা বলে তারা সোভিয়েত বিরোধীতে পরিণত হল না। স্বতন্ত্রভাবে চীনের জনজীবনের উপযোগী করে কম্যুনিজমকে প্রয়োগ করাই হল মাওয়ের উদ্দেশ্য। মাও তার নতুন বাস্তব তথ্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করল তা গভীরভাবে জনমনে স্থান করে নিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরল।

আমেরিকা অংশ গ্রহণ করল যুদ্ধে। মাও সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে নিন্দা করল।

হিটলার হঠাৎ সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করতে আবার নতুন করে চিন্তা করতে লাগল। নিজের নীতিতে মাও আমেরিকার কাছে আবেদন জানাল সোভিয়েত ও চীনকে নানাভাবে সাহায্য করে যুদ্ধবাজদের দমন করতে। কিন্তু আমেরিকা মোটেই আগ্রহী নয় সোভিয়েত ও চীনকে সাহায্য করতে। জার্মান তখন এগিয়ে চলেছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে অথচ ইংরেজ ও আমেরিকা জার্মানের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাই গ্রহণ করল না।

জার্মান বাধা পেল স্ট্যালিনগ্রাডে। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মান পরাজিত হল। এরপরই জার্মানের ধারাবাহিক পরাজয় আরম্ভ। মাও প্রশংসা করল এই যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের।

খবর এল ইংরেজ ও আমেরিকা দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলতে চেষ্টা করছে।

এর প্রয়োজন আর ছিল না। জার্মান তখন মৃত ব্যাঘ্র, তাকে আক্রমণ করার কোন অর্থই হয়না। যা করার তা রাশিয়াই করেছে।

মাও শুধু সমরবিশারদ নয়, মাও বিচক্ষণ দার্শনিক, কবি ও প্রেমিক। জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যেমন তার পরিচয় হয়েছে তেমনি সে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছে। মাওয়ের মার্কসীয় ভাষ্য তার বাস্তব বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের সার্থকতা অবশ্যই তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বসে কবিতা লিখে নিজের মনোভাবকে পরিস্ফুট করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কমই আছে, বিশেষ করে তার মত উচ্চ পদাধিকারী নেতা চীনে আর কেউ আছে বলে শোনা যায়নি। সেই সময় ভয়ঙ্কর রক্তপাতের মধ্যে বসে কবিতা লেখা ছিল অকল্পনীয়। আবার তথ্য ও বিশ্লেষণগুলো লিখে সংবাদরূপে প্রচার করার যে সাংবাদিকসুলভ ক্ষমতা তাও বলতে গেলে বহু জনের মধ্যে কদাচিত দেখা গেছে।

মাওকে লড়াই করতে হচ্ছিল জাপানের বিরুদ্ধে এবং কুয়োমিনটাং-এর বিরুদ্ধে।

মাও আপোষ চায়। চিয়াং তা চায় না তাই কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে ক্রমেই মাওয়ের মতান্তর ও মনান্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সেদিনের কম্যুনিষ্ট প্রশাসিত অঞ্চলে খাদ্যের ও প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মাও স্বাবলম্বী করেছে তার অনুগতজনদের। চিয়াং তা পারেনি, তাকে নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশী সাহায্যের ওপর।

চিয়াং মোটেই নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল সীমান্ত অঞ্চলের ওপর।

চেন-তুর পরিচালনায় চিয়াং নবোদ্যমে প্রচার কাজ চালাচ্ছে।

আমাদের প্রথম প্রয়োজন মানুষের কম্যুনিজম সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটানো। চিয়াং প্রস্তাব দিয়েছিল তার ন্যাশন্যাল এসেমব্লির সদস্যদের।

জাপানকে প্রতিরোধ করাই বড় কাজ, মন্তব্য করল একজন।

চিয়াং বলল, জাপানকে প্রতিরোধ করার সব চেষ্টাই করছি। আমার পরম ও চরম শত্রু হল কম্যুনিষ্ট। তাদের যদি সামলাতে না পারি তাহলে জাপানকে তাড়িয়ে দেবার পর আমাদেরও দেশ ছাড়তে হবে। সেজন্য দুই দিকেই যুদ্ধ চালাতে হবে। জাপানকে প্রতিরোধ করতে হবে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে আর কম্যুনিষ্টদের প্রতিরোধ করতে হবে সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক লড়াই দিয়ে। এখন রাজনৈতিক লড়াই আরম্ভ করা হোক।

তাহলে প্রচার ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত।

কিন্তু তাতু নদীর কিনারায় কম্যুনিষ্ট ধ্বংসের পরিকল্পনা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে যদিও প্রচার ব্যবস্থা মোটেই কম ছিল না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে কোথায় আমাদের গলদ ছিল প্রচার ব্যবস্থায়। সেইসব ত্রুটি মুক্ত করে আমরা এবার প্রচারে নামব।

চিয়াং সমর্থন জানাল এই প্রস্তাবে।

মানুষ কখন দুর্বল তা জানো? মানুষের দুর্বলতা হল ধর্ম। আমাদের কাজ হবে মানুষের সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতিকে কোন রকমে নিজের কাজে লাগান। এর জন্য কনফুসিয়াসের শিক্ষাকে বড় করে দেখিয়ে কম্যুনিজম থেকে সাধারণ মানুষকে আমাদের পথে নিয়ে আসতে হবে।

চীন তো বহুধর্মের দেশ। তাতে সবাই সারা যদি না দেয়?

দেবে। চীনের বৌদ্ধরাও পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা করে কনফুসিয়াসের নির্দেশমত; মুসলমানরাও ব্যতিক্রম নয়, কৃশ্চানরাও একই মতাবলম্বী। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কনফুসিয়াসের ধর্মমতকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভিরুচি অনুসারে সাজিয়ে তুলে ধরা যায় এবং সতর্কভাবে কম্যুনিজমের বিপক্ষে প্রচার চালানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সাফল্যলাভ করব।

সর্ব সম্মতি ক্রমে চেন-তুকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিছু কালের মধ্যেই বহু প্রচার পত্রিকা ছেপে বিলিয়ে দেওয়া হল কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত এলাকায়।

'পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আছে কনফুসিয়াসের শিক্ষায়। যারা কম্যুনিজমের ভাঁওতা দেয় যারা উদার মতের পরিপোষকতা করে তারা দেশের শত্রু। আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে তারা আমাদের নরকগামী করতে চায়।

প্রচারের কায়দাটা ভাল। চিয়াং কাইশেকের অনুগামীরা খুশী হল কিন্তু অপেক্ষা করছিল ফলাফল দেখার জন্য।

বিশ্বযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতির দিকে নজর ছিল সবার। জার্মান ও জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকা সক্রিয় ভাবে যুদ্ধে নেমে পড়েছে, আফ্রিকায় জার্মান বাহিনীর বিপর্যয় ঘটেছে, ইতালীর পতন তখন আসন্ন। চিয়াং ইংরেজের পক্ষে, জাপান দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে। ভারত সীমান্তে এসে গেছে জাপান। চিয়াং আবেদন জানাল আমেরিকার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য।

এদিকে মাও আমেরিকার সাহায্য পেতে উৎসাহী। তখন সে আমেরিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, গণতন্ত্র এই সবের জন্য মাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে সোভিয়েত জড়িয়ে পড়েছে, সেইজন্য এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলতেও ত্রুটি করেনি। তারাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থ ও অস্ত্র পেলে জাপানের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব, তাও স্বীকার করেছে।

মাওয়ের প্রশংসা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। আমেরিকা চীনকে সাহায্য করেছিল জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু এই সাহায্য সোজাসুজি দেওয়া হচ্ছিল চিয়াং সরকারকে। এই সাহায্যের ক্ষুদ্রতম অংশও ইনানের কম্যুনিষ্ট সরকার পেত না। মাও মনে করেছিল এইভাবে প্রশংসা ও স্তুতি করলে আমেরিকার সাহায্য তার সরকারও পাবে। কম্যুনিষ্টরা যে গণতন্ত্রী তা জোর গলায় প্রচার করার উদ্দেশ্য চিয়াং-এর জাতীয়তাবাদী সরকার যে গণতন্ত্রী নয় তা প্রমাণ করা। কিন্তু মাও সোজাসুজি কোন আবেদন জানায়নি সাহায্য পেতে।

ইনানের এলাকায় এসেছিল কয়েকজন আমেরিক্যান সাংবাদিক। তারা গিয়েছিল জাপান অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তের একটি গ্রামে। পরপর কয়েকবার গ্রামটি হাত বদল হয়েছে। জাপানী শক্ত ঘাঁটি করার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে কম্যুনিষ্ট গোরিলারা। অবশেষে তারা জাপানের কাছ থেকে গ্রাম দখল করেছিল কিন্তু তখন গ্রামের চিহ্ন না থাকার মতই। যে দুচারজন লোক ছিল সেখানে তাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ, বাকি সবাই শিশু। নারী বলতে একজনও নেই। একেবারে যারা বৃদ্ধা তারা কোন রকমে ধুঁকছে তখনও। জোয়ান ছেলেরা যে কোথায় গেল তা কেউ জানে না।

লি-তাও গ্রাম্য বৃদ্ধ।

তাদের কাছেই গিয়েছিল সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহে। তাদের দেখে গ্রামের অনেকেই এসে উপস্থিত হয়েছিল সেখানে।

আমাদের কাহিনী শুনতে চাও?—আমাদের ত আর কোন কাহিনী নেই, একমাত্র দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ভিন্ন। তবুও এখন পেটভর্তি খেতে পাই, নিপ্পানা দস্যুরা যখন ছিল তখন তাও পেতাম না।

তারা খেতে দিত না?

কি করে দেবে, আমাদের খাদ্যশস্য তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নিজেদের পেট ভরাতে। যারা বাধা দিয়েছে তাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। আমার ছেলে লি-কুই—

বলতে বলতে থেমে গেল বৃদ্ধ লি। চোখ দিয়ে অঝোরে জল নামছে তখন।

বৃদ্ধা ম্যাদাম লি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমাদের কষ্টের শেষ নেই। আগে আমরা জমিদারদের হাতে মার খেয়েছি। এখন মাঝে মাঝে মার খাচ্ছি জাপানীদের হাতে। আমার ছেলে লি-জুই, উঃ, কি জোয়ান ছেলে। হাত পা দুটো দেখলেই যমেও ভয় করত। আর তার বউটা যেন ছিল রাজার ঘরের মেয়ে, যেমন সুন্দরী তেমনি তার স্বাস্থ্য আর দেহের গঠন। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে।

তারপর।

আমাদের কি অভাব ছিল বাপু। খেটে খেতাম। অসুবিধা ছিল পোড়াকপাল! জমিদারদের তাড়িয়ে দিল জোয়ান ছেলেরা। ভাবলাম এবার কষ্ট যাবে। এখন দেখছি জমি থাকলে কি হবে, ফসল থাকলে কি হবে, আমাদের কপালে সুখ নেই বাপু। উত্তর থেকে জাপানী যমেরা দলে দলে এসে হামলা করল। তারা আমাদের ঘরে যা ছিল তা চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেল। তারপর যুদ্ধ। শুধু যুদ্ধ। একদিনও দম ফেলতে পারছি না।

এখন তো খেতে পাচ্ছ?

তা পাচ্ছি। ভয় তো সব সময়। কখন জাপানী ডাকাতরা আসবে আর কেড়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কারও কিছু কি রেখেছে জাপানী ডাকাতরা, জোয়ান ছেলেদের যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই পুড়িয়ে মেরেছে। গাছের সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে আগুন দিয়ে রোষ্ট করেছে তাজা তাজা ছেলেদের। অনেকেই পালিয়ে গেছে দক্ষিণে। ওরা আশ্রয় নিয়েছে মাও রাজার দেশে।

মাও রাজা, সেকি!

যে রক্ষা করে সে আমাদের রাজা বিনা আর কি বলত। ছেলের বউটা। উঁহু। তা আর বলতে পারব না বাপু, সে সব কথা মনে মনে ভেবে নিয়ে লিখে রেখ। আমাদের জোয়ান ছেলেদের মেরেছে, জোয়ান মেয়েদের নষ্ট করেছে, ধরে নিয়ে গেছে, তাদের বিক্রি করেছে, ঘরে আগুন দিয়েছে, সম্পত্তি লুঠ করেছে। তবে পূর্বপুরুষের অসীম দয়া। ওদেরও নির্বংশ করেছে মাও রাজার সৈন্য।

কিন্তু তোমাদের কষ্ট কি কমেছে?

কমেনি, কমছে। জমি আছে। চাষ করলেই পেটের ভাত হবে কিন্তু যুদ্ধ না থামলে ভাল করে চাষও তো করতে পারছি না। চাষ করলে আর আমাদের দুঃখ কোথায়?

সাংবাদিকরা উঠতে চেষ্টা করতেই বলল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

ফিরে যাব ইনানের দিকে।

তা হবে না। খেয়েছ কিছু, উঁহু, খেয়ে যেতে হবে। আর কি-ই বা আছে। ছুটো পিঠে আর সবজী, মাছ পুড়িয়ে রেখেছি। কোন রকমে ছুটো খেতে হবে। সবুজ চা আছে। বস।

বৃদ্ধা ম্যাদাম লি গেল তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

একজন আরেক জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল।

চুংকিং-এ এ রকম আতিথেয়তা তো পাইনি।

সেখানে চলতে ফিরতে যে ভাবে বাধা নিষেধের গণ্ডী ছিল এখানে তো তার চিহ্নও নেই।

সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার অবাধ স্বাধীনতাও তো আমাদের দেওয়া হতো না।

চিয়াং কাইশেক ভয় পায়। মনে করে তার শাসনে মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা তা যদি আমরা প্রকাশ করে দিই তাহলে দুনিয়ার সামনে তার প্রেসটিজ নষ্ট হবে। আর এরা দেখাতে চায় কেমন ভাবে গড়ে তুলছে এদের এলাকা; কতটা সুখ সুবিধা ভোগ করছে এদের মানুষ তাও দেখাতে চায়।

সাংবাদিকরা বাস্তব দিকটা স্বীকার করল, বলল, We are more homely in Communist area than in Nationalist area. —তারা নিঃশঙ্কায় বিনা বাধায় ঘুরতে পেরেছে কম্যুনিষ্ট চীনে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী চীনে তা পারেনি।

এদের ঐক্য, এদের প্রগতি ও উন্নতি এবং নৈতিক চরিত্র আকৃষ্ট করেছিল সাংবাদিকদের। মাও এবং তার সহকর্মীরা যেমন আদর্শবাদী এবং গুরুতর চিন্তাশীল তেমনি আদর্শবাদী ও গুরুতর চিন্তাশীল কম্যুনিষ্ট এলাকার জনসমাজ।

তবে মাও বোধহয় ভুল করছে।

কোন বিষয়ে?

আমেরিকাকে সমাজবাদী গণতন্ত্রী মনে করে।

মাওয়ের চিন্তাধারা বদল হবে।

সেদিন মাও হবে সব চেয়ে বেশি মার্কিন বিরোধী। মাওয়ের স্বপ্ন ভাঙবে।

সাংবাদিকদের মন্তব্য শূন্যগর্ভ নয়। তারা বিদায় নেবার আগে অনেক আলোচনা করেছিল। তাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিল গ্রামের বিভিন্ন লোক। তারা আলোচনায় খুশী হয়েই ফিরে এসেছিল।

চুয়াল্লিশ সালে আমেরিকা থেকে সামরিক মিশন সর্বপ্রথম কম্যুনিষ্ট চীনে এল প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে। মাও এই মিশনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তাদের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট চীনের বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এ আশাও প্রকাশ করল। কম্যুনিষ্ট চীন কতটা উন্নতি করেছে সমাজতন্ত্রকে মূলমন্ত্র করে এবং কতটা সাফল্যলাভ করেছে জাপানকে প্রতিরোধ করতে তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে মিশন। তাদের রিপোর্ট নিশ্চয়ই মার্কিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় সাহায্য করবে। কুয়োমিনটাংও বুঝতে পারবে তাদের চেয়ে কত বেশি উন্নতি করেছে কম্যুনিষ্ট চীন। আমেরিকাও তার চীনা নীতি বদল করতে পারবে এই মিশনের রিপোর্টে।

ওয়ালেশ এসেছিল চুংকিং-এ।

চিয়াংকে অনুরোধ করেছিল কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে।

রুজভেল্টও নতুন ফরমূলা দিয়েছিল। জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্ট ফৌজের সর্বাধিনায়ক করে যুদ্ধ পরিচালনার উপদেশ দিয়েছিল।

সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন গড়ে তুলতে উপদেশ দিয়েছিল আমেরিকা সেই সঙ্গে সর্বদলীয় একটি জাতীয় সরকার কেন্দ্রে গঠন করার উপদেশও দিয়েছিল।

কম্যুনিষ্ট পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি ছিল না কিন্তু

চিয়াং কাইশেক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বানচাল করতে চিয়াং এই ভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অর্থ জাপানকে প্রতিরোধ করার নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার জন্য চিয়াং নেতৃত্ব করার অধিকার হারিয়ে ফেলল। চিয়াং নিজে কিন্তু তা স্বীকার করে না।

ষ্টিলওয়েলকে সংযুক্ত বাহিনীর নেতৃত্ব দেবার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল চিয়াং-এর বিরোধিতায়।

চীনে আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত হারলে এসেই যে ভূমিকা গ্রহণ করল তাতেই কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থার যেটুকু আশা ছিল তা লোপ পেল।

চিয়াংকে সমর্থন করতেই সে বদ্ধপরিকর অবশ্য প্রথম দিকে কম্যুনিষ্টদের প্রতি খুব বেশি আস্থাহীন ছিল না।

হারলে চিয়াংয়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর মাওয়ের কাছে গেল।

চুংকিং থেকে ইনানে আসার সময় চিয়াংকে বলল, কম্যুনিষ্ট বলতে যা আমরা বুঝি মাও তা নয়। তার উদ্দেশ্য হল কিছু সুবিধা আদায় করা। আমি তার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা গ্রহণ-বর্জন ব্যবস্থায় মাওকে স্বমতে আনতে পারব মনে করছি।

মাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হারলে কম্যুনিষ্টদের খুব প্রশংসাও করল, বলল, তোমাদের আদর্শ ও নীতিই জাপানকে প্রতিরোধ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আশা করছি তোমরা নিশ্চয়ই সম্মিলিত ভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করতে পারবে।

মাও বলল, আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। জাপানকে আমরা প্রায় কাবু করে এনেছি।

এতো সুসংবাদ। জাপান বিশ্বাসঘাতক। পেছন থেকে আঘাত করা হল জাপানের রণনীতি। আমাদের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা বলতে বলতে পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল। তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তোমাদের একার পক্ষে সব তো সম্ভব হচ্ছে না।

আমি চাই চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমরা এই কাজে অগ্রসর হও।

এতে আমার বা আমার কমরেডদের কোন আপত্তি নেই। তবে কতকগুলো সর্ত রয়েছে। তা চিয়াংকে মেনে নিতে হবে।

আমিও সেই কথা ভেবেছি মিস্টার মাও। আমি একটা সর্তের খসরা করে এনেছি।

দেখি তোমার খসরা।

হারলে তার সর্তের কাগজ তুলে ধরল সামনে।

প্রথম সর্ত হল উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী চুংকিং সরকারের অধীনে এবং সম্মিলিত জাতীয় সামরিক পরিষদের অধীনে থাকবে।

মাও অনেকক্ষণ ভেবে বলল, বেশ, আমরা রাজি। তবে এই চুংকিং সরকারে আমাদের প্রতিনিধি থাকবে এবং সামরিক পরিষদেও আমাদের প্রতিনিধি থাকবে। আর এই যে জাতীয় সরকার উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্বে গড়বে তাদের কাজ হবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেওয়া এবং বিদেশ থেকে যে সাহায্য আসবে তা কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিষ্টদের সমান অংশ দেওয়া।

হারলে মাওয়ের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করল।

বলল, কি যে হবে জানি না মিস্টার চেয়ারম্যান। আমি সর্বতোভাবে চিয়াংকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলব। অবশ্য আমি তো জোর করে কিছু করতে পারব না।

তা সত্যি। তবে আমাদের যা বক্তব্য তাও তোমাকে বললাম। দেখ কি করতে পার। তবে মনে রেখ আমরা সম্মানজনক সর্তে সব সময়ই চিয়াং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি।

হারলে কম্যুনিষ্টদের অভিমত নিয়ে ফিরে গেল চুংকিং-এ।

চিয়াং মাওয়ের সর্ত গ্রহণে রাজি হলনা। চিয়াং যা বলল তার অর্থ হল কম্যুনিষ্ট ফৌজের বিলুপ্তি এবং কম্যুনিষ্টদের জাতীয় সরকার থেকে বাদ দিয়ে রাখা।

হারলের ভূমিকা মোটেই সন্দেহাতীত ছিল না, সেজন্য এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল।

জাপান নানকিং-এ তাদের তাঁবেদার সরকার গঠন করেছিল। এই তাঁবেদারকে আসল চীনা সরকার নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে। তাঁবেদার সরকারের সৈন্যবাহিনীও আছে। চীনা সৈন্যদের চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নিযুক্ত করেছে জাপানীরা। এই সৈন্যদলে ভাঙ্গন দেখা দিতেই মাও এদের নিজেদের দলে টেনে আনতে সচেষ্ট হল। এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ কম্যুনিষ্ট চীনের নেই। তাদের প্রতিনিধিরূপে জেনারেল চু টে আমেরিকার কাছে বিশ মিলিয়ন ডলার ঋণ চাইল। হারলে সেই ঋণ প্রত্যাখ্যান করে জানাল যে একমাত্র চুংকিং-এর জাতীয় সরকারই আমেরিকার সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। রাষ্ট্র হিসেবে কম্যুনিষ্ট চীনের অস্তিত্ব আমেরিকা স্বীকার করে না। চীনের একমাত্র প্রতিনিধি চিয়াং কাইশেক।

তখনও আমেরিকার সঙ্গে কম্যুনিষ্ট চীনের মতান্তর গুরুতর হয়নি।

গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে আমেরিকার সামরিক মিশনের জন সার্ভিসকে গ্রেপ্তার করায় ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হল। কম্যুনিষ্টরা প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করতে বদ্ধপরিকর। আমেরিকার ওপর কোন দোষারোপ না করে ব্যক্তিগতভাবে যে সব লোক কম্যুনিষ্টদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল তাদের প্রতি সতর্ক হল এবং এই সব লোক যাতে কোন প্রকারে তাদের এলাকায় না আসতে পারে তার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলল, এতে ফলাফল গুরুতর হতে পারে।

আমেরিকা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হল কম্যুনিষ্টদের এই আচরণে। তারাও প্রতিবাদ জানাল। হারলের কার্যকলাপ বিশেষ আপত্তিজনক মনে করল কম্যুনিষ্টরা। আমেরিকাও রক্তচক্ষু।

মাও মোটেই ভীত নয়। বলল, ভাঙ্গা বন্দুক দিয়েই জাপানকে হঠিয়েছি। দরকার হলে এই ভাঙ্গা বন্দুক দিয়েই আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করব।

আমেরিকার চোখের বালি হল কম্যুনিষ্ট চীন।

মার্কিন সাহায্য পৌঁছাতে থাকে চিয়াং-এর কাছে। বিশ্বযুদ্ধের তখন শেষ পর্যায়। জাপান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে ক্রমেই হটে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

মাও ও স্টালিন আশা করছে চীনে কম্যুনিজমের জয় হবে।

এমন সময় রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের বিরুদ্ধে। হিটলারের পতন হয়েছে। আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসিকিতে আণবিক বোমা ফেলেছে। জাপান তখন আত্মসমর্পণে এগিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে সমগ্র পৃথিবীর যুদ্ধ থেমে গেল।

মাও দেখা করল স্টালিনের সঙ্গে।

জাপান কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? নানকিং-এর তাঁবেদার সরকার কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে?

স্টালিন বিপন্ন। ইয়ালটাতে বসে চুক্তি করেছে চুংকিং সরকারই চীনের প্রতিনিধি। যদি আত্মসমর্পণ করে জাপান তা করবে চিয়াং কাইশেকের কাছে, মাওয়ের কাছে নয়। স্টালিনের তখন গুরুতর সমস্যা। মসকোতে যখন মানচুরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা হয় তখন স্টালিন চিয়াং-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী টি-ভি-সুংকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সোভিয়েত বাহিনী যে অংশ উদ্ধার করবে তার শাসনব্যবস্থা যেন চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার গ্রহণ করে নইলে কম্যুনিষ্ট সরকার তা দখল করতে পারে।

মাও চায় জাপান তার কাছে আত্মসমর্পণ করুক। তা হলে জাপানের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাবে। তাতে কম্যুনিষ্ট সরকারের শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং চিয়াং-এর সঙ্গে লড়াই করার কোন অসুবিধা হবে না।

মাও চু টেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিল।

চু টে তখনই তার বাহিনীকে আদেশ দিল সমস্ত শহর, নগর, চলাচল ব্যবস্থা দখল করতে। জাপানও নানকিং-এর

তাঁবেদার সরকারকে আদেশ দিল তার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

আবার চিয়াং তখনই আদেশ দিল, কম্যুনিষ্ট বাহিনী যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা এই বিষয়ে মোটেই অগ্রসর হবে না।

মাও চু টেকে তার কাজ করে যেতে নির্দেশ দিয়ে চিয়াং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চুংকিং গেল।

চিয়াং ও মাও পুরাতন মিত্র এবং শত্রু। প্রায় বিশ বছর পর দুজনের সাক্ষাৎ। দুজনেই বয়োবৃদ্ধ হয়েছে। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হল না।

দুজনে তেতাল্লিশ দিন ধরে আলাপ আলোচনা করল কিন্তু কোন মীমাংসা হল না।

চিয়াং বলল, এক আকাশে যেমন দুটো সূর্য থাকতে পারেনা তেমনি একই দেশে দুটো স্বাধীন রাজা থাকতে পারে না।

মাও বলল, এক আকাশে দুটো সূর্যের অবস্থান দেখাতে পারি। আমি তা দেখাতে পারি।

থামল আলোচনা প্রথম দিন।

আবার আরম্ভ হল আলোচনা।

চিয়াং বলল, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংরেজ চায় না আমরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হই।

আমিও তা চাই না। আমি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চাই।—উত্তর দিল মাও।

তোমরা চাও ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করতে। তাতে আমরা রাজি নই।

বেশ, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরা যে যে এলাকায় নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চালু করেছি সেই সেই এলাকা নিয়ে একটা সীমানা চিহ্ন টেনে দাও। তোমরা সীমান্তের একদিকে থাক, আমরা

আরেক দিকে থাকি। আমরা যে এলাকা মুক্ত করেছি সেইটুকুই চাই তার বেশি দাবী করছি না। পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধি হোক এই ভাবে।

চীন বিভক্ত করতে আমি রাজি নই।

তা হলে তোমরা কি চাও।

তোমরা থাকবে জাতীয় সরকারের অধীনে একটা অংশরূপে, তার বেশি নয়।

তাতো হতে পারে না, বলল মাও।

তোমাকে ভেবে দেখতে হবে মাও।

আমরা আমাদের মত থাকব। আমাদের সৈন্য সংখ্যা কমাব তোমাকেও কমাতে হবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই।

এতেও আমরা সম্মত হতে পারছি না। তোমাদের নিজস্ব কোন ফৌজ থাকবে না। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তোমাদের কাজকর্ম আটক রাখবে, তার বাইরে নয়।

মাও কোন মতেই চিয়াং-এর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারল না। চিয়াংও মাওয়ের কম্যুনিষ্ট সরকারকে কোনরূপ স্বীকৃতি দানেই ইচ্ছুক নয়। ভেঙ্গে গেল আলোচনা।

মাও বিফল হয়ে ফিরে এল।

চিয়াং চায় অবিলম্বে মাও ও তার কম্যুনিষ্ট ফৌজকে নির্মূল করতে। আর সময় নষ্ট না করে চিয়াং আদেশ দিল কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চল দখল করতে। চিয়াং তখন আমেরিকার অস্ত্রে সজ্জিত, আমেরিকার ডলারে পরিপুষ্ট। চিয়াং জয়লাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। মাও ইনান ফিরে আসার আগেই এই ব্যবস্থা করেছিল চিয়াং। মাও যখন বুঝতে পারল আলোচনাটা কেবল মাত্র বাইরের ভড়ং, আসলে আলোচনা চলাকালীন কম্যুনিষ্টদের আক্রমণ করাই চিয়াং-এর উদ্দেশ্য তখন মাও ফিরে গেল ইনানে।

মার্কিন সাহায্যে চিয়াং বাহিনী মানচুরিয়া দখল করতে এগিয়ে

গেল। চিয়াং জানে সোভিয়েত রাশিয়া তার পক্ষে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত বহুভাবে তাকে সাহায্য করেছে, কোন মতেই কম্যুনিষ্টকে তারা সাহায্য করবে না। সেজন্য সাহসে ভর করে চিয়াং এগোতে থাকে।

রাশিয়া দখল করেছে মানচুরিয়া। রাশিয়া স্থির করবে জাপান কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু রাশিয়া কেমন দ্বিধাগ্রস্থ। প্রথম দিকে সোভিয়েত লালবাহিনী চীনের লাল বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল। চু টে তার বাহিনী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করতে থাকে আর চিয়াং বাহিনীকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করে।

কিছু কালের মধ্যে রাশিয়া তার নীতি পরিবর্তন করে কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চল চিয়াং কাইশেকের হাতে তুলে দিল।

রাশিয়া ফিরে যাবার সময় আবার কেন বা কম্যুনিষ্ট চীনের হাতেই সব কিছু তুলে দিয়ে গেল।

মাও বলল, রাশিয়ার এই আচরণ দুর্জ্ঞেয় নয়। চিয়াং সরকারকেই স্বীকার করে এসেছে রাশিয়া। কম্যুনিষ্ট সরকারের অস্তিত্ব ও কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হলেও কম্যুনিষ্ট সরকার বিশ্বসভায় স্বীকৃত নয়। সেই জন্য রাশিয়া দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছিল।

তখনও মাও আশা করছিল চিয়াংয়ের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসা সম্ভব হবে।

জাপান উভয় পক্ষের শত্রু। সেই জাপান নিপাত হয়েছে। এবার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে। কিভাবে মেটানো যায়। মাও স্থির করল, আমি যাব চিয়াংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

চিয়াংও বুদ্ধিমানের মত কথাবার্তা চালু করল সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য মার্কিন সাহায্য নিতে শুরু করল। মার্কিন উপদেষ্টার দল ঘিরে রাখল চিয়াংকে। আমেরিকার অস্ত্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল হল চিয়াং।

মাও বলল, আমি যুদ্ধ চাই না।

চিয়াং বলল, আমিও চাই না। তা বলে তোমার প্রাধান্য স্থাপন করতে দেব না।

মাও বলল, আমার পূর্ব প্রস্তাব এখনও বহাল আছে। সেই ভিত্তিতে কথা বলতে চাই।

আমিও আমার পূর্বপ্রস্তাব অনুসারে কাজ করছি। তোমাকে ন্যাশনালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করে তারই নির্দেশে চলতে হবে।

মাও বুঝল আলোচনা বৃথা। কম্যুনিষ্ট উচ্ছেদ হল চিয়াংয়ের মূল উদ্দেশ্য আর সে কাজে সাহায্য করছে আমেরিকা।

বিফল হয়ে মাও ফিরে এল ইনানে।

আমরা মনে করি জনগণের সম্মিলিত শক্তি আমেরিকার অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আমরা ভাঙ্গা বন্দুক দিয়ে জাপানের সঙ্গে লড়াই করেছি এবার ভাঙ্গা বন্দুক দিয়েই মার্কিন অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমাদের সহায় জনসাধারণ।

ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি আবার রণ-দামামা বেজে উঠল। আবার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। মাও নির্দেশ দিল লালবাহিনীকে—ছোট মাঝারি শহর দখল কর, পল্লী অঞ্চল দখল কর তারপর বড় শহর আক্রমণ কর। দলভ্রষ্ট সংযোগহীন শত্রুকে আগে আক্রমণ করবে। যেখানে শক্তিশালী ও বেশি শত্রুসৈন্য আছে তা আক্রমণ করবে পরে। আমাদের উদ্দেশ্য শহর-নগর দখল নয়, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করা। শত্রুর শক্তির অধিক শক্তি নিয়ে আক্রমণ করবে। দরকার মত দশগুণ শক্তিও প্রয়োগ করবে। চারিদিক থেকে শত্রুকে ঘিরে ফেল, শত্রুকে নির্মূল করবে, একজনও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

মাওয়ের অনেক সহকর্মী বলল, আমেরিকা চিয়াংকে আনবিক বোমা দিয়ে সাহায্য করতে পারে। সেজন্য সতর্ক থাকা উচিত।

মাও বলল, আনবিক বোমা দিয়ে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

জাপানের পতন কেন হল ?

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের তুলনা করে লাভ নেই। জাপানে আনবিক বোমা যুদ্ধের গতি স্থির করেনি। জাপানের জনসাধারণ যুদ্ধ বিরোধী হয়ে উঠতেই জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল।

তা হলে তুমি বলতে চাও আনবিক বোমা জাপানের আত্মসমর্পণের কারণ নয় ?

হাঁ। তা যদি হতো তাহলে আমেরিকা সোভিয়েতকে সৈন্য পাঠাতে বলত না। তারা আনবিক বোমা দিয়েই মানচুরিয়া দখল করতে পারত, জাপানকে দখলে রাখতে পারত। আনবিক বোমা পড়ার পর জাপান আত্মসমর্পণ করেনি। সোভিয়েত যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল তখনই জাপান পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল।

তাহলে আনবিক বোমার ভূমিকা তুমি অস্বীকার কর ?

হাঁ। কাগুজে বাঘ আনবিক বোমা, কাজের কিছু নয়। নরহত্যা করে দেশ জয় করা যায় না।

স্বাধীনতাকামী মানুষকে আনবিক বোমার ভয় দেখান মূর্খতা।

মহামান্য স্টালিন বলছে আনবিক বোমা অতি শক্তিশালী।

আমি বিশ্বাস করি না। আমরা আনবিক বোমার ভয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিহার করব তা হতে পারে না।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। চীন থেকে আর যুদ্ধ থামতে চায় না।

চীনের মানুষের তবুও ক্লান্তি নেই যুদ্ধতে। হাজার হাজার পরিবারে ক্রন্দনের রোল, কোটি কোটি ডলারের সম্পদ নাশ ঘটছে বছরের পর বছর তবুও চীন শান্ত হচ্ছে না। রক্ত পিপাসা মিটছে না চীনের মাটির।

এবারের যুদ্ধ আর আগের যুদ্ধের অনেক পার্থক্য। আজ মুখোমুখি আক্রমণ করার শক্তি সংগ্রহ করেছে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি। তারা চিয়াং-এর শক্তিশালী ঘাটির ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। একটার পর একটা ঘাঁটি লালফৌজ দখল করে এগিয়ে চলে।

মাও অস্ত্রের যুদ্ধ চায়নি। মাও রাজনৈতিক যুদ্ধকেই জোরদার করেছে। মাও জানে রাজনৈতিক জনসংগঠন ও জনসাধারণের সহানুভূতি না থাকলে সামরিক জয় সম্ভব নয়। Mao regarded Political mobilisation and wining the sympathy of the masses as indispensable to the success of the military struggle.—মাও তার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লাল-ফৌজকে ডেকে বলল, সাহসিকতা চাই, ত্যাগ চাই, ক্লান্তিহীনতা চাই। তোমরা যদি সাহসী হও, ত্যাগে ভয় না পাও, কাজে ক্লান্তি অনুভব না কর তা হলে জয় নিশ্চিত।

মাওয়ের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী কাই-হুইয়ের যেমন প্রভাব ছিল তেমনি তার তৃতীয় স্ত্রী ল্যান-প্যাঙের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল।

মাও রাজনৈতিক বিষয়েও প্যাঙের সঙ্গে আলোচনা করত, কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলেও স্ত্রীকে বাদ দিয়ে কিছু করত না।

ল্যান-প্যাঙ জানতে চাইল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী চিয়াং-এর সঙ্গে লড়াই করে আমরা জিততে পারব কি ?

মাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, নিশ্চয় পারব।

কি করে তা সম্ভব ?

আমাদের বাহিনীতে বর্তমানে দশলক্ষ সৈন্য আছে, আর চিয়াং-এর বাহিনীতে আছে চল্লিশলক্ষ সৈন্য। বিগত বছরের যুদ্ধে চিয়াংবাহিনী অর্ধেক হয়েছে। আর একবছর যদি আমরা লড়াই করি তা হলে চিয়াং বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটা সম্ভব হল কি করে ?

কারণ এটা হল "The Victory of a smaller but dedicated and well-organised force enjoying popular support over a large but unpopular force with poor morale and incompetent leadership." আমাদের বাহিনী সুসংগঠিত, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ, জনসাধারণের সমর্থন-পুষ্ট তাই অপ্রিয়

নীতিহীন অযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর পরাজয় ঘটবেই ঘটবে। আশা করছি আগামী একবৎসরের মধ্যে আমরা চিয়াং-এর প্রতিবিপ্লবী সরকারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব।

মার্কিন সাহায্য পাচ্ছে ওরা, আমরা কি পাচ্ছি? কেউ তো সাহায্য করছে না।

আমরা জনসাধারণের সাহায্য পাচ্ছি। আমরা মার্কিন সাহায্য চাই না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী তাদের উপনিবেশ তৈরী করেছে চীনের ভূমিতে চিয়াং-এর সহায়তায়। তা না করলে আমেরিকা তার উৎপাদিত বস্তুর বাজার হারাবে। তাদের তো বাজার চাই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর অস্ত্রব্যবসায় বন্ধ হলে সমূহ বিপদ। তাই তারা যুদ্ধকে জিইয়ে রাখতে চায়। নইলে চিয়াংকে তারা সাহায্য করত না।

ল্যান-প্যাঙের সঙ্গে আলোচনা করত চেন-ইর স্ত্রী। ম্যাদাম চেন বলত চিয়াং এলাকায় যা হচ্ছে তার তুলনা নেই। টাকার দাম নেই। হাজার ডলার দিয়ে একজনের খাদ্য সংগ্রহ হয় না।

লোকের আর আস্থা নেই চিয়াং সরকারের ওপর। চিয়াং সরকারের ছাপানো ডলারের নোটগুলো এরপর রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে।

এবারেও রয়েছে সর্বত্র অপব্যয় আর দুর্নীতি।

অপব্যয় আর দুর্নীতি হল সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রত্যক্ষ অবদান। সাম্রাজ্যবাদীরা শোষণ করে তাদের উপনিবেশ আর তাদের দেশীয় সহকর্মীরা তারই অংশ নেয়। শুধু চিয়াং চীনেই নয়, পৃথিবীর যে সকল দেশে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শোষকদের শাসন রয়েছে সে সব দেশে এই অপকাজ থাকবেই।

ম্যাদাম চেন বলল, এই তিনটি কারণই চিয়াং-এর পতনের পক্ষে যথেষ্ট। জনমানসে চিয়াং একটা যুদ্ধবাজ প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাস। তাই তাকে কেউ আর সমর্থন জানাচ্ছে না। রণক্ষেত্রে চিয়াং বাহিনী সাদা পতাকা উড়িয়ে চলে আসছে আমাদের পক্ষে। আমাদের সৈন্য

বাহিনীতে যোগ দিতে ছুটে আসছে দলে দলে জোয়ান ছেলে। তাদের ডাকতে হয়নি, তারা জানে দেশের মুক্তি আনতে পারি আমরাই, তাদের আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র।

ল্যান-প্যাঙ্ বলল, মানচুরিয়া আর উত্তর চীন দখল শেষ হয়েছে। বাকি শুধু ভিয়েনস্তিন আর পেইপিং।

ও দুটো দখল করছে না কেন?

চেয়ারম্যান লিন পিয়াওকে নির্দেশ দিয়েছে ও দুটো জায়গা ঘিরে রাখতে। আগে নির্দেশ ছিল সমগ্র চিয়াং বাহিনীকে নির্মূল করার। এবার ওদের ঘিরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রপথে যাতে পালাতে না পারে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে বলেছে। অন্যান্য কুয়োমিনটাং দলের সঙ্গে যাতে কোন যোগাযোগ রাখতে না পারে তার ব্যবস্থাও করতে বলেছে।

যুদ্ধের গতি দেখে কি মনে হচ্ছে ম্যাদাম মাও?

আগে মনে হয়েছিল যুদ্ধ অধিকদিন স্থায়ী হবে। এখন মনে হচ্ছে আর এক বছরের মধ্যেই চিয়াং-এর পতন হবে, আমরা মুক্ত হব।

মাও লিন পিয়াওকে নির্দেশ পাঠিয়েছিল চিয়াংবাহিনীকে ঘিরে রাখার।

দু সপ্তাহ চুপ করে বসে থাকার পর লিন পিয়াও একটা একটা করে পাঁচটা চিয়াং-এর শক্ত ঘাঁটি দখল করে ভিয়েনস্তিন আক্রমণ করল। উনত্রিশ ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করে চিয়াং বাহিনী বাধা দিয়েছিল লালফৌজকে, অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পেইপিং বিনাযুদ্ধে জয় করল লালফৌজ। চিয়াং-এর সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ফু সো-ই অনর্থক হত্যা ও ধ্বংস নিরোধ করতে আত্মসমর্পণ করল। সমগ্র চীন তখন লালফৌজের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তখনও কিন্তু চিয়াং-এর পতন হয়নি।

এমন সময় চিয়াং শান্তির আবেদন জানাল।

চিয়াং প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে সহকারী প্রেসিডেন্ট লি সুং-

জেনের হাতে শাসন ভার তুলে দিল। অবশ্য এমন কতকগুলো ক্ষমতা তার নিজের হাতে রেখে দিল যাতে তার প্রাধান্য কোনমতেই হ্রাস না পায়।

মাও শান্তির সর্ত দিল সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ।

নানকিং-এর চিয়াং সরকার বিশে এপ্রিল মাওয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। মাও আদেশ দিল সর্বাত্মক আক্রমণের। সেই দিনই লালফৌজ ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলল নানকিং-এর দিকে। তেইশে এপ্রিল লালফৌজ নানকিং দখল করল।

চিয়াং শাসনের অবসান ঘটল এই পতনের সঙ্গে সঙ্গেই। চিয়াং আশ্রয় নিল তাইওয়ানে। সেখানে সরিয়ে নিল তার সরকারকে। চীনের মূল ভূখণ্ডে এক ইঞ্চিও জমি রইলনা চিয়াং কাইশেকের জন্য। চীন এল মুক্তি ফৌজের প্রভাবে ও অধীনে। সাতাশ থেকে উনপঞ্চাশ সাল অবধি বাইশ বছরের রক্তপাত শেষ পর্যন্ত সার্থক হল। চীনের মানুষ জনতার শাসন পেল চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে।

যুদ্ধজয় আর দেশ গঠন এক কাজ নয়।

মাও সাতচল্লিশ সালেই নিঃসন্দেহ হয়েছিল চিয়াং-এর পতন সম্বন্ধে। তখন থেকেই নতুন ভাবে চিন্তা করছিল কৃষি সংস্কারের। সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ সাল অবধি কৃষি বিষয়ে যে সব নীতি গ্রহণ করেছিল তার চেয়েও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণের জন্য মাও বিস্তারিত আলোচনা করেছে তার সহকর্মীদের সঙ্গে। মাও তিনটি নিয়ম ও আটটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি আকর্ষণকারী নীতি প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিল তখন থেকেই। এতকাল পুলিশ, জমিদারের পেয়াদা আর ফৌজের হাতে চীনের কৃষকরা নিগৃহীত হয়েছে, তাদের ফৌজ-ভীতি ছিল কিন্তু লালফৌজ তাদের ওপর কোন রকম অত্যাচার না করাতে এবং জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়াতে তাদের সে ভয় যেমন ছিলনা তেমনি খাজনা হ্রাস, ভূমি বণ্টন প্রভৃতি কাজের মাঝ দিয়ে লালফৌজ ও

কম্যুনিষ্ট পার্টি জনপ্রিয় হয়েছিল যথেষ্ট। এইভাবে অগ্রসর না হলে জনসমর্থন সত্যিই পাওয়া দুষ্কর ছিল।

ভূমি সংস্কার ও চাষীর ওপর মাওয়ের অধিক গুরুত্ব আরোপ প্রথম দিকে অন্যান্য অনেক সহকর্মীদের পছন্দ না হলেও, অবশেষে মাওয়ের নীতি সত্যই যখন সাফল্যলাভ করল তখন সমস্বরে চিৎকার করে অভিনন্দন জানাল মাওকে—Long live Chairman Mao.

ডিসেম্বরের সেই কঠিন শীতে যে শিশুটি সাওসানের এক দরিদ্র নিম্নবিত্ত কৃষকের ঘরে জন্ম নিয়েছিল সেই ছেলে যে চীনের মুক্তি-দাতা হবে তা হয়ত একজনও সেদিন চিন্তাও করেনি।

সেই দাই স্নুন-লি শুধু বলেছিল, এই ছেলে হল তোমার সাত রাজার ধন এক মানিক। ঘরে তোমার লক্ষ্মী বাধা থাকবে।

স্নুন-লি তার শিক্ষা, সমাজ ও পরিবেশকে ভিত্তি করে যে কথা বলেছিল সে কথার রূপান্তর ঘটেছে। মাও সত্যিই একদিন সাত রাজার ধন একটি মানিক হয়েছে।

এক সময় মাও বলেছিল, 'The Kuomintang has a brilliant future'—কুয়োমিনটাং সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করত অথচ সেই মাও পরবর্তী কালে বলেছিল Jackals of Japanese imperialism—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শৃগাল।—এই বিপরীতমুখী চিন্তার জবাব চাইল একজন বিদেশী সাংবাদিক নতুন চীন প্রজাতন্ত্রের একজন নায়কের কাছে।

হাসতে হাসতে হো বলল, যে শিশুটিকে মাতৃক্রোড়ে দেখে সেদিন তুমি মনে করেছিলে দেবদূত সেই শিশু পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বার্থে অথবা অপরের প্ররোচনায় যদি দস্যুতা করে তা হলে নিশ্চয়ই তুমি তাকে আর দেবদূত বলবে না।

নিশ্চয়। জাপানকে যে সুযোগ দিয়েছিল চিয়াং তারই পরি-প্রেক্ষিতে মাও অনেক কটূক্তি করেছিল। এরপর জাপান যখন আক্রমণ করল চীনকে তখনও মাওয়ের মতের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি,

আবার যখন সম্মিলিতভাবে জাপানকে প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা তৈরী হল তখন মাও কুয়োমিনটাং সম্বন্ধে বলেছে, 'Three People's Principles ; it has had two great leaders in succession —Mr. Sun Yat-Sen and Mr. Chiang Kai-Shek ; it has a great number of faithful and patriotic active members'—এতে কি মনে হয় না মাও ছিল সুবিধাবাদী। যখন যেটা তার স্বার্থ রক্ষা করতে পারত তখন সেটাই গ্রহণ করত, কোন নীতি তার ছিল না।

প্রতিবাদের সুরে হো বলল, এটা অবিচার। মাও সম্বন্ধে এটা একটা কটূক্তি ও অবিচার। মাও কখনও তার নীতি পরিত্যাগ করেনি করবেও না। তবে তার ইচ্ছা ছিল যৌথভাবে দেশের সমৃদ্ধি গড়ে তুলতে। সে সময় জাপান ছিল চীনের গুরুতর শত্রু, তাকে না তাড়াতে পারলে চীনের উন্নতি ছিল কল্পনাতীত। এই কঠিন কাজ একা মাওয়ের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না, দরকার ছিল আরও শক্ত প্রতিরোধ। তাই করতে চেয়েছিল মাও চিয়াং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

তোমার কথা স্বীকার করেও আমি বলছি, যখন সত্যই জাপান মানচুরিয়া আক্রমণ করতে এল তখন তো কম্যুনিষ্টরা এগিয়ে আসে নি, তারা সবার আগে চিয়াংকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। চিয়াং যে ভাবে তোমাদের উচ্ছেদ করতে আরম্ভ করেছিল সে সময় জাপানকে যদি বাধা দিতে সে না যেত তা হলে তোমাদের অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ।

ঘটনার ঠিক বিশ্লেষণ হল না বন্ধু। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চিয়াং তার ফৌজকে পাঠিয়েছিল তা বলে আমাদের ওপর থেকে আক্রমণ শিথিল করেনি। জাপান না এলে হয়ত আরও জোর আক্রমণ হতো আমাদের ওপর কিন্তু তুমি যদি ইতিহাসের ছাত্র হও তা হলে জানতে পারবে চিয়াং-এর পতন ইতিহাসের নির্দেশে ঘটেছে, হয়ত

কিছু আগে হয়েছে. জাপানের আক্রমণে কিন্তু তার পতন রোধ করতে পারত না কোনক্রমেই, হয়ত একটু বিলম্ব ঘটত। জনসাধারণ যাকে চায় না তার গদীতে বসার অধিকার কোন সময়ই থাকে না।

মানচুরিয়াতে জাপানের আত্মসমর্পণের সময় যে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পেয়েছিল তা না পেলে তোমরা এত সহজে কি নানকিং দখল করতে পারতে ?

কোন সময়ই সহজে তা হয়নি। চিয়াং-এর অস্ত্র এসেছে আমেরিকা থেকে ও তা বেশ উচ্চশ্রেণীর অস্ত্র। তা দিয়ে কোনক্রমেই তো রুখতে পারেনি জনতার রোষকে। আমরা যদি মানচুরিয়াতে অস্ত্রশস্ত্র না পেতাম তা হলেও চিয়াং-এর পতন ঘটত। চিয়াং-এর সঙ্গে হাত মেলাতে সচেষ্ট ছিল মাও, আমাদের বলেছিল, জাপানের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইতে রয়েছে কুয়োমিনটাং-এর brilliant future— আমাদের বলেছে to assume their great responsibility in the national war. এ থেকে মাওয়ের মনোগত উদ্দেশ্য ও আমাদের পার্টিগত নীতি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

এবার তো তোমাদের দেশ গড়ার সময়। এবার কি ভাবে তোমরা অগ্রসর হতে চাও ?

এই কথার জবাব এক কথায় দেওয়া যায় না। চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কি ভৌগোলিক অবস্থাকে বিচার করার প্রয়োজন। আমি দু একটা চিত্র তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই তারপর তুমিই প্রস্তাব দিও।

দল বেঁধে পুরুষ ও নারী চলেছে পাহাড়ের তলা দিয়ে। পথ উবরো খুবরো। দলের পুরুষদের ছেঁড়া পাজামা ভিন্ন দ্বিতীয় পোষাক নেই, নারীদের উর্ধাঙ্গ কোনক্রমে ঢাকা, যুবতীদের যৌবন ছেঁড়া কামিজের মাঝ দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। কারও পায়ে জুতো নেই। পাথুরে রাস্তায় পা টেনে টেনে হাঁটছে।

ওয়াং লি বয়োবৃদ্ধ। সেই দলের নেতা।

ঝে-শান গাঁয়েরই মেয়ে। অনেক কাল পরে গ্রামে এসেছে। হোনানে ছিল এতকাল। ফিরে এসেছে সেনসিতে তার পিতৃপুরুষদের গাঁয়ে। বয়স তারও হয়েছে তবে ঠিক বৃদ্ধা নয়। তার পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ঝোড়া।

কারও হাতে গাঁইতি, কারও হাতে কোদাল, কারও হাতে বেলচা, মেয়েদের হাতে একটা করে ঝোড়া।

আগে আগে চলেছে ওয়াং আর ঝে-শান।

সেই সকালে রোদ না উঠতে তারা গ্রাম থেকে রওনা হয়েছে পাথর কাটতে।

কোয়ারীতে যখন পৌঁছল তখন সূর্য উঠেছে।

প্রথম পর্যায়ে পাথর কাটা শেষ হল দুপুরে। ক্লান্ত শ্রমিকরা গাছের তলায় বসল বিশ্রাম করতে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা চালের পিঠে কামড়ে কামড়ে খেয়ে গেল পাশের বদ্ধ জলায় জল খেতে।

আবার শুরু হল পাথর কাটা।

দুপুরের তপ্ত রোদে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে। আকাশে যেন আগুন লেগেছে, তারই জ্বালা ঠিকরে এসে পড়ছে মজুরদের গায়ে। বড় বড় পাথরের চ্যাংরাগুলো সাইজ দিয়ে টুকরো টুকরো করে সাজিয়ে রাখছে।

ঠিকাদারের কর্মচারী ফিতে দিয়ে মেপে নিচ্ছে কার কতটা কাজ হয়েছে।

সূর্য ডোবার আগেই কাজ শেষ করে ভীড় করে দাঁড়াল সবাই ঠিকাদারের কর্মচারীর সামনে সারা দিনের মজুরি নিতে।

পুরুষদের হাতে পঞ্চাশ সেন্ট আর মেয়েদের হাতে চল্লিশ সেন্ট দিয়ে বিদায় নিল ঠিকাদারের কর্মচারী। যারা স্বামী স্ত্রী তারা পেল নব্বই সেন্ট, পুরো এক ডলারও নয়।

সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের মুদির দোকানে এসে দাঁড়াল সে দিনের উপার্জন দিয়ে আগামী দিনের সওদা করতে। বৃদ্ধ ওয়াং দু পাউণ্ড

চাল নিল পুরো পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে। বাড়িতে তার খানেওলা চারজন। তার স্ত্রী আগে কাজ করত, আজকাল আর কাজ করতে পারে না। তাই চাল বিনা অন্য জিনিস কেনার পয়সা থাকে না ওদের। তার ওপর সব দিন তো কাজ মেলে না, যখন কাজ মেলে না তখন উপোস করতে হয় সবাইকে।

জোয়ান ছেলে চ্যাং-লি কিন্তু উপোস করতে রাজি নয়। পাহাড়ের ওপারে নাকি একজন সাধু আছে। কাজ না থাকলে চ্যাং-লি পাহাড়ে যায়। অনেক দিন তার কোন খবর পাওয়া যায় না। তারপর হঠাৎ একদিন ফিরে আসে, অবশ্য কিছু খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

অনেকেই গোপনে শুনেছে চ্যাং কেন যায়। সাহস করে বলেনি কোন দিন।

সেবার কাজ পায়নি কেউ-ই।

চ্যাং এবার সাধুর আশ্রমে যাবার আগে আরও ক'জন বন্ধুকে বলল, চল এবার পাহাড়ের ওপারে সাধুর কাছে যাই। খাবার পাব। আসবার সময় এক মাসের খাবার নিয়ে আসতে পারব।

চ্যাং-এর সঙ্গে লি, সুই, সুচাও চলল সাধুর আশ্রমে।

পাহাড় পেরিয়ে আরেকটা পাহাড়। সেখানে পৌছতে দুটো পুরো দিন কেটে গেল। তারপর একদিন যখন পৌছল সেখানে, লি জিজ্ঞেস করল, সাধু কোথায় রে?

চ্যাং বলল, আছে আছে। পাহাড়ের গুহায় থাকে। পরে দেখা হবে। নে চল। কিছু খাবার ব্যবস্থা করি।

সবাই ক্ষুধার্ত। খাবারের কথা শুনে আগ্রহ সহকারে চ্যাং-এর পেছন পেছন একটা বাড়ি এসে পৌছতেই এক বৃদ্ধ চ্যাংকে দেখে বলল, এই যে চ্যাং। খবর ভাল তো।

হাঁ খুড়ো খবর ভাল। কিছু খেতে দিতে পারবে? আমরা চার জন।

তা কিছু দিতে পারব। ভেতরে যাও; ডান দিকের ঘরে পিঠে আছে আর কিছু মাছপোড়া আছে। নুনও পাবে লঙ্কাও পাবে।

নিজেরা ভাগ করে খেয়ে নাও। তা হঠাৎ এখানে কেন? এখানকার কাজ কর্ম খুব ঢিলে যাচ্ছে।

দেশে খাবার নেই খুড়ো। ভীষণ খরা। বাইরে কাজ পাচ্ছি না।

কাজ না পেলেই তো সবাই আসে, সবাই আসে পেটের দায়ে তা তো জানি। যাও এবার খেয়ে নিয়ে সাধুর সঙ্গে দেখা করে এস। বোধহয় দু' চার দিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তোমাদের বেশি দিন বসতে হবে না।

খিদের তাড়নায় তিনজনকে সঙ্গে করে চ্যাং ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেট ভর্তি খেয়ে বেরিয়ে এল।

লি বলল, এবার চল তোর সাধুবাবার কাছে।

এখন নয় সন্ধ্যার পর।

সাধুবাবা সন্ধ্যা না হলে বুঝি সাক্ষাৎ করে না?

হাঁ। ততক্ষণ চল আশ্রমটা ঘুরে ফিরে দেখে আসি।

চলল চারজন।

আশ্রম কিছু নয় কয়েকখানা চালাঘর। মাটি আর পাথরের দেওয়াল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গর্ত। সেখানে প্রবেশ করার উপায় নেই। মুখগুলো ডালপালা দিয়ে বন্ধ। এদিকে গোয়ালবাড়ি, অনেকগুলো গরু আর ঘোড়া আছে সেখানে। তাদের তদ্বির তদারক করার লোকও আছে। ঘুরে ফিরে তারা এসে বসল একটা চালা-ঘরের তলায়।

সুচাও বলল, রাতের বেলায় এসব লোক থাকে কোথায়?

ক'জনই বা লোক। দশ বারজন লোক এই সব চালায় থাকে। আর কেউ কেউ গুহায় থাকে।

বেশ জায়গা, বলল সুই।

কিন্তু এদের চলে কি করে?—লি জানতে চাইল।

পরে জানতে পারবি। আগে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হোক।

সন্ধ্যার পর তিনজন সঙ্গী নিয়ে চ্যাং গেল সাধুর গুহাতে। সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করল চ্যাং, তার দেখাদেখি লি, সুচাও ও সুই প্রণাম করল।

পাতলুন কামিজ পরিধানে। সাজগোজে তাকে সাধু মনে হল না নবাগত তিনজনের।

প্রভু দর্শনে এসেছে এরা। আপনার আশীর্বাদ চায়।

লি গদ গদ ভাবে বলল, বড়ই গরীব আমরা। আমাদের মঙ্গল করুন প্রভু।

হবে। আর কোন কথা বলল না সাধু। পাশের লোককে ইসারায় কি যেন বলল। পাশের লোকটি উঠে এসে তাদের বলল, এস।

তার সঙ্গে সঙ্গে চালাঘরে এল। দরজা খুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। খাবারের ব্যবস্থাও হল। রাতের বেলায় দাসী এসে খাবার দিয়ে গেল। বসে বসে গল্প করল তাদের সঙ্গে। গল্প-গুলো হাসির গল্প। হাসতে হাসতে দাসী গড়িয়ে পড়তে থাকে। অন্য সবাইও হাসছিল।

বড়ই সুন্দর লাগছিল নবাগত তিনজনের। তাদের অনাহারী জীবনের বাইরে যে এমন শান্তিপূর্ণ জীবন আছে তা কখনও ওরা ভাবেনি। বেশ উপভোগ করল গল্প-গুজব হাসি মসকরা। তারপর যে যার মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় রাতের সেই ব্যক্তিটি এসে চারজনকে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, তোমরা যারা ঘোড়ায় চড়তে জাননা তারা ঘোড়ায় চড়া শেখ আজ থেকে।

ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে চারজনই ঘোড়ায় চড়া শিখতে গেল। চ্যাং এ বিষয়ে আগেই ট্রেনিং নিয়েছে, লি, সুই ও সুচাও দুপুর পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে স্নান করতে গেল। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিশ্রাম।

রাতের বেলায় আবার সেই লোকটা এসে ডেকে নিয়ে গেল সাধুর কাছে।

ঘোড়ায় চড়া শিখলে?

হাঁ।

আমরা খেতে পাইনা। বড়লোকরা খেতে পায়। আমরা তা সহ্য করতে রাজি নই। তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেতে হবে এই আমাদের ধর্ম। সাধ্যমত অনাহারীকে অন্নদান করতে হবে।

ঠিক বুঝলাম না প্রভু।

ধীরে ধীরে বুঝবে। এদের নিয়ে যাও।

আবার সেই লোকটা নিয়ে গেল তাদের। পাহাড়ের একটা গুহায় নিয়ে গিয়ে কয়েকটা বন্দুক আর রাইফেল বের করে বলল, এগুলো চালাতে শিখতে হবে। পারবে?

চ্যাং বলল, নিশ্চয়ই।

তোমার তো শেখাই আছে। তোমার বন্ধুদের বলছি।

ওরাও পারবে। তুমি শিখিয়ে দাও।

সে-রাতে ওদের বন্দুক চালনা শেখান হল। এইভাবে ট্রেনিং চলল পাঁচদিন ধরে। পাঁচদিনে ঘোড়ায় চড়া বন্দুক চালানো সব শিখে নিল নবাগত তিনজন।

কদিন পরে দলবদ্ধ হয়ে রাতের বেলায় অন্ধকারে রওনা হল প্রায় পঁচিশ জন। তাদের হাতে বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র। পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করতে রওনা হল তারা।

গৃহস্থ বাধা দিয়েছিল। দস্যুরাও অকথ্য অত্যাচার করেছিল।

লুঠপাটও যথেষ্ট হয়েছিল।

দস্যুদের সবাই ফিরতে পারেনি অক্ষত অবস্থায়। যারা আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল সুই।

অনাহারী অভাবী ভূমিহীন মানুষ শুধু বাঁচার তাগাদায় এইভাবে দস্যুতে পরিণত হতো কয়েক বছর আগে। চাষীর যে শক্তি তার আসল চেহারা মানুষ দেখতে পেতনা, তাদের নেতৃত্ব দেবার যেমন লোকের অভাব ছিল ঠিক তেমনি তাদের রাজনৈতিক চেতনাও ছিল না। সমাজ ব্যবস্থায় এই ছিল একটা দিক। বুঝলে মিস্টার রিপোর্টার। এর পরিবর্তন এনেছি আমরা। সেদিনের দস্যুচাষী এখন সুখী চাষী চাষ করে খায়।

দরিদ্র মানুষই তো গোটা চীন নয়।

না হলেও শতকরা নব্বই জন লোকের অবস্থা এই রকম ছিল। আর অর্থ সম্পদ ছিল একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে। চীনের সমাজে যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল তাকে পাঁচটা ভাগে বিভক্ত করতে পার। তাদের কথাই বলব তোমাকে। প্রথমেই তোমাকে বললাম সর্বহারাদের ঘটনা। এবার শোন বড় বড় বুর্জোয়াদের আচরণ।

সে-হুই একটা বড় গ্রাম। সেনসি প্রদেশের তখন সবাই চিনত সে-হুইয়ের জমিদার চেন লি-ইকে। চেন ছিল সে-হুই সমেত আটটা গ্রামের মালিক। জমিদারীটা স্বোপার্জিত নয় পৈতৃক। চেন শুধু পিতৃকুলের জমিদারী-ই পায়নি উত্তরাধিকার সূত্রে, সেই সঙ্গে পেয়েছিল জমিদার হবার মত যত দুর্গুণ। যেমন সে চণ্ডু খেত তেমনি তার আসক্তি ছিল নারী মেদে।

জমিদারীর সঙ্গে ছিল মহাজনী।

চড়া সুদের ওপর শস্য দিত তার প্রজাদের। ফসল উঠলে দ্বিগুণ আদায় করত তাদের কাছ থেকে।

সম্ভ্রান্ত লোকের সমাজে স্থান নিরুপিত হতো সে সময় তার রক্ষিতার সংখ্যা দিয়ে।

চেন-এর ছিল আঠার জন নারী। এদের একজন তার স্ত্রী, লি-লিসান গ্রামের জমিদার বাড়ির মেয়ে। বাকি কজনই ছিল তার প্রজাদের ঘরের যুবতী মেয়ে। তাদের কিনে এনে রেখেছিল সহবাসের

সঙ্গী করতে। মাঝে মাঝে সদরে যেত, সেখানেও নোংরা পল্লীতে ছিল তার অবাধ গতায়াত।

জমিদারী শাসনে রাখতে পেয়াদা ছিল একদল। পেয়াদাদের কাজ ছিল তার আদেশে প্রজাপীড়ন আর কোন প্রজার রূপসী স্ত্রী অথবা কন্যা থাকলে তার সংবাদ এনে দেওয়া। অবাধ্য প্রজাদের বেঁধে এনে কয়েদ করা ছিল পেয়াদাদের কাজ। এসব কাজের বড় সঙ্গী হল তার গোমস্তারা। কোন সময় যে তারা কোন রকম দয়া দেখাত প্রজাদের এমন কোন নজির তৈরী করতে পারেনি তারা। এইসব সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে জমিদারের দিন কাটত।

প্রজাদের বেগার দিতে হতো খাস জমিতে। তার জন্য তারা কোন পারিশ্রমিক পেতনা। নিজেদের কোন জমি না থাকলেও পরের জমিতে খাটত তারা। ফসল উঠলে সবার আগে জমির মালিককে তার অংশ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকত তার বেশির ভাগই যেত জমিদারের ঋণ শোধ করতে। অতি সামান্যই থাকত তাদের পেট ভড়াতে।

চেন-কে ঘৃণা করত কৃষকরা কিন্তু মুখের সামনে কিছু বলতে পারত না। বংশ পরম্পরায় যেমন তাদের জমিদারী তেমনি বংশ পরম্পরায় প্রজারা শোষণ সহ্য করত। এ বাদেও জমিদার বাড়ির কোন বিশেষ উৎসবে প্রজাদের নজরানা দিতে হতো, কখনও কখনও দূর দূরান্ত থেকে মালপত্র বিনা পারিশ্রমিকে বহন করতে হতো। যদি কোন সময় কেউ প্রতিবাদ করত তা হলে তাদের পেয়াদা দিয়ে শায়েস্তা করত। যদি তাতেও তারা শায়েস্তা না হয় তাহলে পুলিশ-ফৌজকে দিয়ে শায়েস্তা করা হতো। কাউকে চোর অপবাদ দিয়ে, কাউকে ডাকাত অপবাদ দিয়ে, কাউকে নারীহরণকারী অপবাদ দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিত। কারও বাড়িতে আগুন দিয়ে উৎখাত করত।

চীনের চাষীরা অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী নিয়ে ঘর করে, তাদের না আছে বর্তমান না আছে ভবিষ্যৎ, অতীতের কথা ভাবতেও তারা ভুলে গিয়েছে ; এত ভীতিপ্রদ অতীত ছিল তাদের। সেইসব শোষিত

মানুষের মধ্যে যারা বেপরোয়া তাদের কেউ কেউ ডাকাতি করতে বাধ্য হতো। তাদের কোন সামাজিক, অথবা রাজনৈতিক বোধ না থাকলেও তারা অনাহারে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক অপরাধ করতে কুণ্ঠিত হতো না, মেয়েরা দেহ বিক্রয় করে পেটের রুজি রোজগার করত।

এই হল কয়েক শত বৎসরের চীনের চাষী জীবন। এই জীবনের সঙ্গে চীনের সামন্ততন্ত্র এমন ভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করত যা বলে শেষ করা যায় না।

চীনের সম্রাট ছিল মাঞ্চু বংশীয়।

চীন দেশটা বিরাট। তার জনসংখ্যা ও আয়তন পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়েও বড়। একমাত্র চীনা ভাষায় যত লোক কথা বলে তার অর্ধেকও অন্য কোন ভাষায় কথা বলে না পৃথিবীর লোক। এক ভাষা-ভাষী এত বড় দেশ আর কোথাও নেই। বিচিত্র দেশের গঠন। কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মরুভূমি, কোথাও ভয়ঙ্কর নদী, কোথাও শস্য শ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও গভীর বন। এত বড় দেশটাকে শাসন করতে হলে যে প্রশাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন তা ছিলনা কেন্দ্রীয় মাঞ্চু সম্রাটদের। বাধ্য হয়েই তারা সামন্ততন্ত্রের হাতে দিয়েছিল দূর দূরান্তের প্রদেশ-গুলো। এর ফলে চীনের শাসন ব্যবস্থা ছিল বিচিত্র। প্রাদেশিক গভর্ণররা ছিল আধা স্বাধীন। তাদের নিজস্ব ফৌজ নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্র তাদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কেন্দ্রীয় বাহিনী যদিও শক্তিশালী ছিল সামন্তদের দমন করতে কিন্তু তাদের এত শক্তি ছিল না বিদেশীদের রুখবার। বিদেশী আক্রমণের সময় তাদের সাহায্য চাইতে হতো সামন্তদের ফৌজের। সামন্তদের ফৌজের না ছিল উচ্চশ্রেণীর অস্ত্র না ছিল সৈন্যদের শৃঙ্খলাবোধ। সেজন্য বিদেশী আক্রমণের সময় এই সম্মিলিত বাহিনী বিশেষ কোন যোগ্যতা দেখাতে পারত না। ধীরে ধীরে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, পর্তুগীজরা এসে ঘাঁটি করল এদেশে। শেষে জাপান দখল করল কোরিয়া। এই ভাবে মাঞ্চু

সম্রাটের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে কিন্তু চীনের কৃষক ও শ্রমিক যদি অনাহারের হাত থেকে বাঁচতে কোন সময় প্রতিবাদ করত তা হলে কঠিন হস্তে তাদের দমন করত সামন্তদের বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

স্বৈরাচারী মাঞ্চু সম্রাটদের অত্যাচার সহ্য করেছে চীনের মানুষ, সেই সঙ্গে অত্যাচারিত হয়েছে সামন্ত শাসনে, তারপরই জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ –এই ভাবে কোটি কোটি মানুষ নির্যাতীত হয়েছে। এদের মুক্ত করতে সান ইয়াত সেন বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহ সফলও হয়েছিল কিন্তু আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার আগেই সান দেহত্যাগ করল, চীনের ক্ষমতা হাতে পেল একদল যুদ্ধবাজ, তারা মানুষের দুর্গতি মোচন করতে এগিয়ে এল না।

এই সমাজ ব্যবস্থার একটা রূপ হল, পুরুষকে পশুর মত বধ করা আর নারীকে পণ্যরূপে ব্যবহার করা।

সেই অন্যায়কে আমরা প্রতিহত করেছি। এবার বিশ্বের নিরপেক্ষ জনমত বলবে আমরা সুখী এবং উন্নত কিনা, সত্যিই চীনের গৃহযুদ্ধ চীনের মানুষকে রক্ষা করেছে কিনা।

আর্থিক ক্ষেত্রে কি উন্নতি হয়েছে তা বলে লাভ নেই। একমাত্র নিদর্শন হল চীনে বেকার মানুষ নেই। চীনের ভূমিতে আহার্য উৎপাদিত হচ্ছে, কারখানায় নিজেদের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে ভোগ্যপণ্য সমবন্টনে কোন কুণ্ঠা নেই প্রশাসকদের। এর চেয়ে আর কি আর্থিক উন্নতি হতে পারে। অর্থনীতির থিসিস নিয়ে আলোচনা করলে উন্নতির পরিমাপ করা যায় না। উন্নতির পরিমাপ জীবন ধারনের অবস্থা। চীনে ভিখারী নেই।

চিয়াং কাইশেকের শাসনে বড় বড় শহরের ফুটপাতে ভিখারী ও বেশ্যার ভীড় থাকত। সে নক্কারজনক দৃশ্য আর কারও দৃষ্টিকে ব্যথিত করে না। এর চেয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি আর কি হতে পারে।

রাজনৈতিক পরিবর্তনের অর্থ তো ক্ষমতা লাভ নয়। রাজা মরলে

নতুন রাজা আসে তাতে তো প্রশাসন ব্যবস্থার বদল হয় না। শোষকের কোন শ্রেণী নেই, গদীতে নতুন মানুষ পুরাতন মানুষের মতই শোষক যে হবে না তাই বা কে বলতে পারে। হাজার হাজার বছর ধরে সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া পেষণ সহ্য করতে করতে চীনের মানুষ ভুলেই গিয়েছিল শাসক বদলে তাদের ভাগ্য বদল হতে পারে। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভই তো যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষকে জানাতে হয়েছে, কেন এই বদল, কার স্বার্থে এই বদল এবং এই বদলে কতটা স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে তাতে। সমষ্টির স্বার্থে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত না করা যায় তাহলে মানুষ বদল হলেই শোষণ বন্ধ হয় না। চীন নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে পৃথিবীর সামনে শোষণ বন্ধ করে।

সর্বহারার একনায়কত্বই হল শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতি। আমরা সে পথেই অগ্রসর হয়েছি ও ধীরে ধীরে সাফল্য লাভ করছি।

রাশিয়া থেকে যারা এসেছিল নব চীন প্রজাতন্ত্রকে অভিনন্দন জানাতে তাদের মধ্যে যারা তথ্যবিশারদ তাদের মুখে শোনা গেল, class war comes to an end as soon as socialism established—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেই শ্রেণীসংগ্রামের শেষ।

চীনের তাত্ত্বিকরা বলল, না তা নয়। ধনতন্ত্রের মূল হল উৎপাদনের ওপর ব্যক্তির মালিকানা। আর সমাজতন্ত্রের মূল হল উৎপাদনের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা। কিন্তু মালিকানার পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান না হয়ে উপায় নেই। ইংরেজের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ধনবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা কিন্তু সেখানেও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের অভাব নেই, তা থেকে একথা বলা যায় না সে রাষ্ট্র সমাজবাদী রাষ্ট্র। সেখানে আর্থিক বিষয়ে প্রভুত্ব করে একটি বিশেষ শ্রেণী এবং সেই শ্রেণীর নির্দেশেই পরিচালিত হয় রাজনৈতিক অবস্থা।

চিয়াং শাসনমুক্ত চীনকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তুলে নিল মাও। কিন্তু তা গড়তে হবে তার দেশের উপযোগী করে, অর্থাৎ 'a Chinese way'—চীনের পথে চীনকে গড়তে হবে।

চীন বাস করছে, উত্তরে সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েতকে নিয়ে, পূর্বে কোরিয়া, কিছু দূরেই জাপান, ততোধিক অশান্তিদায়ক ফরমোজার (তাইওয়ান) আমেরিকার আশ্রয়ে বাস করছে চিয়াং কাইশেক ও তার জাতীয়তাবাদী দলের নেতারা, দক্ষিণে ইন্দোচীন, বর্মা, আর ভারত, পশ্চিমে ভারত ও আফগানিস্থান। আদর্শ বিচারে কারও সঙ্গে চীনের মিল নেই একমাত্র সোভিয়েত রুশিয়া ও উত্তর কোরিয়া বাদে। অথচ বাস করতে হবে নিরাপদে।

প্রথম নিরাপত্তা ব্যাহত হল কোরিয়ার দিক থেকে।

উত্তর কোরিয়ার সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট সরকারের বিরোধ উপস্থিত। উভয় পক্ষ যুদ্ধে নেমে পড়ল। ভয়ঙ্কর সে যুদ্ধ। কোরিয়ার মত ক্ষুদ্র দেশ যেন প্রত্যক্ষ করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পেশাদারী সৈন্যবাহিনীকে সিউল শহরের উপকণ্ঠে ঠেলে নিয়ে গেল। আর দু চার দিনের মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পতন ছিল অনিবার্য।

আমেরিকা কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করতে চিয়াং কাইশেককে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়েছে কিন্তু কোন ফললাভ হয়নি। চিয়াং কম্যুনিষ্টদের রুখতে পারেনি। দক্ষিণ কোরিয়াকেও অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়েও যখন দেখল কোনক্রমেই দক্ষিণ কোরিয়া আত্মরক্ষা করতে পারছে না তখন প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকা নেমে পড়ল যুদ্ধে। জাতিপুঞ্জের মোহর বুকে বেঁধে স্বাধীন দুনিয়াকে রক্ষা করতে মার্কিন সৈন্য উপস্থিত হল দক্ষিণ কোরিয়াতে। সেই যুদ্ধের বিবরণ অবাঞ্ছিত। যেন দুটো মত্ত ষণ্ড খোলা ময়দানে লড়াইতে নেমেছে। একজন ঠেলতে

ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছে। পর মুহূর্তে দেখা গেল অপরজন বিপক্ষকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। আমেরিকা যখন প্রত্যক্ষভাবে নামল যুদ্ধে তখন চীন বিপন্ন হল তার সীমান্ত নিয়ে। চীনের চল্লিশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক ছুটল উত্তর কোরিয়াকে রক্ষা করতে।

নয়া চীনকে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র স্বীকার করল না, বিশেষ করে আমেরিকার তাঁবেদার যারা তারা নয়া চীনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা তো দিলই না উপরন্তু জাতিপুঞ্জে তাদের সদস্যপদেরও বিরোধিতা করল। যারা স্বীকার করল এই নবজাতককে তারা রাষ্ট্রদূত পাঠাল চীনে। মাও স্বয়ং রাষ্ট্র শীর্ষরূপে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। উনচল্লিশ সালের অকটোবর মাসে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর প্রায় পঁচাত্তর বার বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সরকারীভাবে সাক্ষাৎ করল।

মাও তার মন্ত্রীসভা সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত পরিকল্পনা ঘোষণা করল চীনকে গড়ে তুলতে। ভারী শিল্পের দিকে বেশি নজর দিল মাও। এতকাল সমুদ্র তীরবর্তী শহরে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠেছিল, সরকারী সহযোগিতার অভাবে সে সব শিল্পও ভাল ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। এগার সাল থেকে উনপঞ্চাশ সাল অবধি অবিশ্রান্ত গৃহযুদ্ধ চলেছে, সেই সুযোগে বিদেশীরা বাজার দখল করেছে। চীনকে গড়ে তোলার মত শিল্প তখন ছিল না। চীনকে সব সময়ই বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। এমন অবস্থায় আত্মনির্ভর হওয়া অসম্ভব। সেজন্য মাও নজর দিল ভারী শিল্পের দিকে।

কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি নিয়োগ করতে উৎসাহ দিল নতুন সরকার। সমবায় সমিতি গঠনে যে সব সদস্য অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের ভূমির পরিমাণ ও লগ্নী অর্থের হারাহারি হিসাবে ফসল দেবার ব্যবস্থাও হল— কেবলমাত্র মজুরীর ওপর উৎপন্ন ফসল পাবার কোন ব্যবস্থা করা হল না। যৌথ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল ধীরে ধীরে। যার ফলে চাষের উন্নতি ঘটল আর সর্বপ্রকার শিল্পকে রাষ্ট্রের পরিচালনায় আনা

হল, শুধু শিল্প নয়, ব্যবসা বানিজ্যও রাষ্ট্রের অধীন করা হল। ব্যক্তিগত মালিকানা নির্মূল করা হল।

কিন্তু!

মাও মনে করত, The Changes in mentality and atmosphere which accompanied the collectivisation proces were far more important'—রাষ্ট্রশক্তি দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা নির্মূল করা যায়, যৌথ খামারের ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু যারা এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করে, যারা কায়েমীস্বার্থ থেকে বিচ্যুত হল তাদের মানসিক পরিবর্তন প্রয়োজন, পরিবেশকেও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন, এবং সেই পরিবর্তন হল সবচেয়ে মূল্যবান। তার জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন তা ছিল না চীনের জনসাধারণের। অর্থনৈতিক এই সব উন্নয়নে রাজনৈতিক চেতনা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তখন রাজনৈতিক বোধ ভিন্ন তা কোনক্রমেই হতে পারে না। কৃষি উন্নয়ন নিয়ে আদর্শগত, ভাবগত এবং রাজনীতিগত সমস্যা দেখা দিল।

স্টালিনের বক্তব্য মাও সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারেনি। শ্রেণী সংগ্রামের শেষ সমাজতন্ত্র, একথা মাও বিশ্বাস করে না। অবশ্য স্টালিনের এই তথ্য নিয়ে কোন সময়ই চীনের রাজনৈতিক অবস্থাকে ঘোরালো করেনি মাও। তবে স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের বক্তব্য তাকে আদর্শগত ভাবে ভয়ানক আঘাত দিয়েছিল। মাওকে চিন্তা করতে হয়েছিল রাশিয়ার নীতি চীনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা।

মাও অবসর নিল রাষ্ট্রশীর্ষ পদ থেকে। মাও রইল শুধু পার্টির চেয়ারম্যান। রাষ্ট্রের প্রধান হল লিউ শাও-চি।

ক্রুশ্চেভ সোভিয়েতের বিংশ কংগ্রেসে যে গোপন ভাষণ দিল তাতেই ভাঙ্গন ধরল চীন ও সোভিয়েত সম্পর্কে। স্টালিনের জীবিতকালে সোভিয়েত ও চীন সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল। স্টালিনের মৃত্যুর পর যে পথ ধরে চলতে থাকে সোভিয়েত নেতারা তাতে মাও এই

বিশ্বাসে উপনীত হল যে সোভিয়েত শোধনবাদের আশ্রয় নিয়েছে। এর পরই হাঙ্গেরীতে যে অশান্তি দেখা দিল তাতে মাও আরও সতর্ক হল। শোধনবাদের পরিণাম চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল।

কোরিয়ার যুদ্ধ অবসানের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা বেশ সুস্থ মনেই গ্রহণ করেছিল মাও। মাও এবং স্টালিন দুই জনেই উপলব্ধি করেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ না হলেও নিরপেক্ষ ভূমিকায় ভারত যে ভাবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য চেষ্টা করেছে তাতে অসমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব। পরবর্তী কালে বান্দুং-এ এশিয়া ও আফরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহ পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করে চীন বুঝিয়ে দিয়েছিল ধনতন্ত্রী দেশের পাশাপাশি কেউ কাউকে আঘাত না করেও থাকা যায়। ভারত তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশ বুঝেছিল চীনের মনোভাব বুর্জোয়া প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নয়। আদর্শের পার্থক্য থাকলেও এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ বিনা বিসম্বাদে পাশা-পাশি বাস করতে পারে এর প্রমাণই পাওয়া গেল বান্দুং চুক্তিতে। মাও নিরপেক্ষ বুর্জোয়া দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বিমুখ নয় তাও প্রমাণ হল। বুর্জোয়াতন্ত্রকে নির্মূল করা যদিও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তবুও এসব ক্ষেত্রে কোন ভাবেই তা প্রয়োগ হবে না অথবা চীন প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে না তাও বুঝতে পারল এশিয়ার অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র।

ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে যে সব তথ্য পেশ করতে থাকে তাতে, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের মনে ধারণা জন্মাল অনগ্রসর দেশে এইসব বুর্জোয়ারা উন্নতির সহায়ক। সে সময় চীনেও দেশীয় বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। চৌ এন-লাই স্বীকার করেছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত এশিয়া আফরিকার দেশসমূহ জাতীয়তাবাদের ছত্র ছায়ে বসে উন্নত হচ্ছে কিন্তু তার এই স্বীকৃতি যে ভুল তা অচিরে জানা গেল।

সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত বাহ্যত মনোরম ছিল। চৌ এন-লাই যখন কোরিয়া যুদ্ধের আহত ও বন্দীদের ফিরিয়ে

দিল আমেরিকাকে, মলোটভ তখন চৌ-এর প্রশংসা করেছিল। এইভাবে কোরিয়ার যুদ্ধ সমাপ্তি ঘটাতে ক্রুশ্চেভ পিকিংয়ে এসে মাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছিল। সে সময় ক্রুশ্চেভ চীনকে বেশি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল. পোর্ট আর্থার, দাইরেস বন্দর ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল, সেই সঙ্গেই চীনা যৌথ কোম্পানীতে সোভিয়েতের যে সব অংশ ছিল তাও পরিত্যাগ করতে রাজি হল। এইভাবে চীনের উন্নতির জন্য সোভিয়েত যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি।

কাও কাং ছিল উত্তর পশ্চিম চীনের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি কিন্তু পার্টির নির্দেশ অমান্য করে কাও নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে থাকে। দেখা গেল কাও বর্তমান চীনের সংবিধান বিরোধী এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা যেন তার মনঃপূত নয়। সেজন্য তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হল মাও, ফলে কাও আত্মহত্যা করল। কাওয়ের কাজের পেছনে সোভিয়েতের অপ্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। তাই কাও যখন ক্ষমতাচ্যুত হল তখন সোভিয়েতের বর্তমান নেতারা তীব্র আপত্তি জানাতে থাকে।

ক্রুশ্চেভের গোপন বক্তব্য। কাওয়ের পতন নিয়েই ঘোঁট পাকতে থাকে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিল, মাও এই পরিবর্তনকে কোনক্রমেই আদর্শানুগ মনে করতে পারেনি, সেজন্য প্রতিবাদ জানাতেও মোটেই ত্রুটি করল না। সোভিয়েত ও চীন তখন ভিন্নমুখী, তাদের চিন্তাধারায় বিশেষ পার্থক্য।

মাও বলল, অনেকে মনে করে স্টালিন যা করেছে সবটাই ত্রুটিপূর্ণ। এটা ভুল ধারণা। স্টালিন ছিল মার্কস্ ও লেনিনের পথের পথিক। তবুও সে কিছু কিছু ভুল করেছে কিন্তু সে বুঝতে পারেনি সেগুলো ভুল। আমাদের কর্তব্য তার কোন কাজটা ঠিক আর কোন কাজটা ভুল তা বিশ্লেষণ করে দেখা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

ক্রুশ্চেভ বলল, মাও নিজের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করার গোপন ইচ্ছা নিয়ে স্টালিনের ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখাতে চাইছে। স্টালিনের

অন্যায়কে সমর্থন করলে মাওয়ের অন্যায় সমর্থন পাবে। ভবিষ্যতে যাতে কেউ মাও সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে এটা হল তারই নমুনা।

মাও বুঝতে পারল সোভিয়েত শোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছে। আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা চলতে চায়। চীনে যদি শোধনবাদ প্রবেশ করে তা হলে এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি বাধা পাবে।

রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বসল লিউ শাও-চি। মাও নিলেন পার্টি গঠনের দায়িত্ব।

রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল মাও। ক্রুশ্চেভের নীতিকে যুক্তিসঙ্গত মনে করতে পারেনি, রাজনীতির বিচারে শোধনবাদ সর্বনাশা। মাও প্রথমাবধি রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। চীন ও রাশিয়ার সমস্যাও আলাদা, অনেক ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত ধর্মী।

লিউ শাও-চি ক্ষমতায় এসে রাশিয়ার অনুকরণে দক্ষিণপন্থী মনোভাব দেখাতে আরম্ভ করল। শোধনবাদ যেন ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে চীনের সমাজজীবনে। মাও মনে করত, স্টালিন রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিল আর ক্রুশ্চেভ কায়েমীস্বার্থের যে ঘাঁটি উচ্ছেদ হয়েছিল তাকে আবার মেরামত করে সেই সমাজতন্ত্রের যে বনিয়াদ তৈরী হয়েছিল তাকে নষ্ট করতে সচেষ্ট। ক্রুশ্চেভের আমেরিকা তোষণনীতিকে কোনক্রমেই সমর্থন জানাতে পারল না মাও।

চীনের সমাজ জীবন থেকে কায়েমী স্বার্থ পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়নি। তখনও রাজনৈতিক লাভ যতটা হয়েছে তার চেয়ে ক্ষতি হবার বেশি আশঙ্কা রয়েছে, পরিবেশ ও মনোভাব পরিবর্তনই হল আসল কাজ, তা না হওয়া অবধি কোনক্রমেই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

মাও লক্ষ্য করল, পার্টির যারা ক্ষমতায় রয়েছে তারা যেন ধীরে ধীরে ধনতন্ত্রের পথে পা দিচ্ছে। সোভিয়েত আদর্শে যেন অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

যারা ক্ষমতায় বসে আছে তারা যেন শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করছে। তারা মনে করে শ্রমিকদের চেয়ে তারা অনেক উচু শ্রেণীর এবং এই ক্ষমতাবান লোকেরা নিজেদের মধ্যে দল তৈরী করে সব রকম সুযোগ সুবিধা নিতে বেশী আগ্রহী। চিয়াং কাইশেকের সময় যে সব পাপ ছিল সমাজ দেহে তাই ধীরে ধীরে শম্বুক গতিতে যেন গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। বুর্জোয়া এই মনোভাবকে সময়মত রোধ করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের যে ভিত্তি স্থাপন হয়েছে চীনে তা ধ্বংস হবে।

মাও বলল, সমাজতন্ত্র ক্ষমতাবান ও ওপরতলার মানুষ গ্রহণ করবে নীতি হিসেবে এবং তা অভ্যাস করবে ব্যক্তিগত জীবনে। বুর্জোয়াদের যে সব চোরা প্রতি-বিপ্লবী রয়ে গেছে তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে এবং বুর্জোয়া জীবন যাত্রা পদ্ধতিকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে। তার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রয়োজন। মাও তার পার্টি তথা দেশবাসীকে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্য মণ্ডিত করতে ডাক দিল। বলল, আমরা নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সর্বত্র সর্বহারার একনায়কত্ব চাই।

কেন চাই ?

আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করল।

রাশিয়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নির্মূল হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একদল বুদ্ধিজীবি এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষ কারিগর, অপর দল পরোপজীবি। এদের অধিকাংশই শিক্ষিত। বিপ্লবকে এরা সমর্থন করেছে কিন্তু এরা বিপ্লবের অর্থ বোঝেনি, মনে করেছে বিপ্লবের মাঝ দিয়ে তাদের স্বার্থ বজায় রাখবে। কুয়োমিনটাং-এর পাপপূর্ণ শাসন থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল চীনের মানুষ তাই সমর্থন এসেছে সর্বস্তর থেকে, একমাত্র কায়েমী স্বার্থের যারা স্তম্ভ তারাই বাদ।

বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবিরা আত্মগোপন করেছে। রাতারাতি তারা সমাজতন্ত্রী হতে পারে না। তাদের মানসিক পরিবর্তন মোটেই হয়নি। যারা বৈজ্ঞানিক, দক্ষ কারিগর তারা সমাজের উন্নতির জন্য

আত্মনিয়োগ করে, বাদবাকি সবাই গোপনে প্রতি-বিপ্লবের চিন্তা করে। এদের এককথায় বলা যায় "Scholar despots"—এরা শিক্ষা ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গোপনে প্রতি-বিপ্লবের বীজ বপণ করছে।

চীনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে চীনের কৃষকরা। তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত প্রশাসক পাওয়া যায়নি বলেই অনেক ক্ষেত্রে এই সকল বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন লোককে বসাতে হয়েছে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব না বদলালেও তারা সমাজবাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ভেক্ বদলেছে। আর শাসনক্ষমতার শীর্ষে যারা বসেছিল তারা এই সব বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের সমর্থক। ফলে ধীরে ধীরে চীনের জনজীবনে বুর্জোয়া চিন্তাধারা প্রবেশ করতে থাকে। সাহিত্য, অভিনয়, চলচ্চিত্র সর্বত্রই এই মনোভাবের সামান্য থেকে অনেক বেশি প্রকাশ দেখা দিতে থাকে।

হান তে-চিন জমিদার বাড়ির ছেলে। তার জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মনের পরিবর্তন হয়নি। হান কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য নয়। কম্যুনিজমকে সে বিশ্বাস করে না। পৈতৃক সোনা-রূপা যথেষ্ট সে লুকিয়ে রেখেছে। তার বিশ্বাস একদিন এই বিপ্লবীদের প্রাধান্য লোপ পাবে, সেদিন তার জমিদারী ফিরে না পেলেও নিশ্চয়ই সে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে সমাজের মাথায় বসতে পারবে। আবার তার পিতৃপুরুষের মত জীবনকে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে সে পারেনি সেজন্য সে চায় যেকোন উপায়ে তার মনোভাবকে সংক্রামিত করতে পারলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে। মানুষের দুঃখ দুর্দশার সুযোগ নিয়ে যেমন মাও বিপ্লবকে সফল করেছিল, তেমনি মানুষের গোপন অভিলাষ ব্যক্তিগত লাভকে জিইয়ে রাখলে আবার প্রতি-বিপ্লব ঘটিয়ে কায়েম করতে পারবে বুর্জোয়াতন্ত্র।

সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে মাও এইসব য়্যামেচার সর্বহারাদের।

মাও বলল, জন্ম মানুষের পরিচয় নয়। কর্ম তার পরিচয়।

মনোবৃত্তি দিয়েই বিচার করতে হবে সে কোন শ্রেণীর। মনোবৃত্তি জানা যাবে তার কাজ দেখে। দরিদ্র কৃষকও ক্ষমতা পেলে দুর্নীতি-পরায়ণ হতে পারে আবার জমিদারের ছেলেও সমাজতন্ত্রকে মনের সঙ্গে গ্রহণ করলে সর্বহারার নায়ক হতে পারে। তবে দরিদ্র কৃষককেই সর্বহারা মনে করা উচিত আর ধনীর সন্তানকে সন্দেহের চোখে দেখা দরকার। তারপর তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে। তখন শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব হবে।

পরিবার আর ব্যক্তিকে আলাদা করে দেখতে হবে।

ভাল পরিবারের ছেলেও এসে লালবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। দেখা গেছে তার চরিত্র নামক বস্তুটির অভাব। তাকে বিদায় করতে হয়েছে। ব্যক্তি রূপেই বিচার করা উচিত, পরিবারের ঐতিহ্য মানুষকে বড় করতে পারে না সব সময়।

কেন এসব ঘটে ?

সেই পুরাতন মন চোরের মত আস্তানা করে রেখেছে। সেই চোরকে তাড়াতে না পারলে চীন আবার পিছিয়ে যাবে, দক্ষিণপন্থী মনোভাব জাগবে, সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন মোটেই সম্ভব হবে না।

ওয়াং লি কাপড় কলের শ্রমিক।

কাপড় কলে কাজ করার সময় ফেলিস কুয়োর সঙ্গে পরিচয়।

ওয়াং লি দক্ষ শ্রমিক। কয়েক জোড়া তাঁতের দায়িত্ব তার। সাংঘাই শহরে দক্ষ শ্রমিক বলে তার খ্যাতিও আছে।

পাশের তাঁতের শ্রমিক ফেলিস কুয়ো। সেও কয়েকটা তাঁতের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে কয়েক বছর হল।

পরিচয় হল, সেই পরিচয় পরিণত হল প্রণয়ে। ওয়াং লি বিয়ে করল কুয়োকে।

বিয়ের পরই ফেলিস এসে উঠল ওয়াং-এর কোয়ার্টারে। স্বচ্ছন্দ পরিবার মনে করাই স্বাভাবিক। সবাই মনেও করত তাই। আ উন

তাদের প্রতিবেশী শ্রমিক। আ উনের স্ত্রীও কাজ করে কাপড়ের কলে। তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সামনের আঙ্গিনায় দৌড়াদৌড়ি করে খেলে বেড়ায়। ফেলিস তাদের সঙ্গে অবসর সময়ে খেলে। ওয়াং কাজ থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকলে আর বের হতে চায় না। ফেলিস বাজার হাট করে। রান্না করে। শিফট্ বদল করে দুজনে কাজ করে, একজন ঘরে থাকলে আরেকজন কাজে যায়। দিন রাতে সাত আট ঘণ্টা সাহচর্য লাভ করে পরস্পরের। ছুটির দিন অপেরা অথবা থিয়েটারে যায়। মাঝে মাঝে দু একখানা সস্তা নভেল কিনে এনে ওয়াং পড়ে। ফেলিসও অবসর পেলে বইয়ের পাতা উল্টে দেখে।

একদিন অপেরা থেকে ফিরে এসে ফেলিস বলল, চৌ রাজাদের এই উপাখ্যান ভিত্তিক নাটকটা বেশ মন জয় করেছে। সত্যি বলতে কি সে সব রাজা মহারাজারা খুবই ধার্মিক ও দয়ালু ছিল। অন্যায়কারীকে যেমন শাস্তি দিত ঠিক তেমনি তারা গরীবের প্রতি সদয়ও ছিল।

ওয়াং শুধু বলল, হুঁ।

আরেকদিন সিনেমা দেখে এসে ম্যাদাম আ উন আর ফেলিসের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। জমিদারবাড়ির অন্দরমহলের যে সব দৃশ্য দেখে এসেছে তাতেই ফেলিস উৎফুল্ল। আবেগ সহকারে বলল, ও রকম জমিদার আর গজাবে না। আমাদের যে কত সম্পদ ছিল তা বুঝতে পারা যায় জমিদার বাড়ির জৌলুষ দেখলে।

ম্যাদাম আ উন বলল, ওদের সম্পদ তৈরী হয়েছিল আমাদের মত গরীবকে শোষণ করে। ঐ সম্পদ চীনের সম্পদ নয়, জমিদারদের ব্যক্তিগত জীবনের সম্পদ।

আমরা কি ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধি চাই না। নিশ্চয় চাই। তাতে দোষ কি?

আ উন বলল, সমাজে ব্যক্তির কোন সম্পদ থাকা উচিত নয়। সমষ্টির স্বার্থই হল বড়। সবাই যদি সম্পদকে ভোগ করতে না পারে সে

সম্পদ থাকা না থাকা সমান। অপরকে শোষণ ও বঞ্চনা করে যে সম্পদ তা দিয়ে গৌরব করা অনুচিত।

ওয়াং তাদের আলোচনা শুনছিল। কোন মন্তব্য না করে শুধু বলল, মানুষ সব সময় একমত তো হতে পারে না। বিভিন্ন মতের লোক আছে। এ নিয়ে আলোচনা বৃথা।

সেদিনের আলোচনা বন্ধ করে তারা বোধহয় চিন্তা করছিল। ফেলিস সহকর্মীদের অনেকের সঙ্গেই এ বিষয় নিয়ে বেশ মুখরোচক আলোচনাও করল ক'দিন। কেউ তাকে সমর্থন করল, কেউ করল না।

ওয়াং রাতের বেলায় একখানা বই উল্টে রেখে বলল, এই বইখানা পড়েছ ?

বইখানা উল্টে দেখে ফেলিস বলল, পড়ছিলাম। সবটা পড়তে পারিনি। বড়ই নোংরা মনে হল বইখানা। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এভাবে লেখা উচিত হয়নি।

ওয়াং বলল, তোমার বড় সেকেলে মন। শিল্পবোধ তোমার নেই। বাস্তব জীবনে নারী পুরুষেব সম্পর্ক কি ওর চেয়ে আলাদা। তুমিই বল। তোমার সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্ক না থাকলে তোমাকে কি ভালবাসতে পারতাম।

কিন্তু।

কিন্তু আবার কি।

যে জিনিসটি সবাই জানে তাকে ওভাবে না লিখলেও চলত। নায়ক যতগুলো মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে তাদের দেহ বিনা আর কোন বস্তুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কয়েক ডজন নারী সহবাসের পর নায়ক যদি বলে যৌনজীবনই আসল, প্রেম ভালবাসা তুচ্ছ তা হলে তা কি সভ্য সমাজে কেউ স্বীকার করে। আদিম বন্য জীবনের ঘটনা বলেই আমাদের মনে হয়।

তোমার যদি কোন শিল্পবোধ থাকত তা হলে একথা বলতে না। মানুষ কত এগিয়ে চলেছে জানো। পশ্চিম দেশে নর-নারীর সম্পর্ক যে

ভাবে আমরা দেখতে পাই সে সবের এক কনিকা আমাদের দেশে ঘটলে তোমরা শিউড়ে উঠতে। এতো একটা উপন্যাস মাত্র, এর প্রভাব আছে সমাজ জীবনে ঠিকই কিন্তু পশ্চিমীদের মত আমরা এগোতে পারি নি, আমাদের সাহিত্য ও শিল্প তাদের বিচারে পেছনে পড়ে আছে। চাষা আর ছোটলোক বিনা আমাদের আর কোন জীবন আছে তা যেন ভুলতে বসেছি।

ফেলিস মনে মনে ওয়াং-এর যুক্তি মেনে নিল, সরমভরা মুখখানা উঁচু করে তার চোখ দিয়ে মনের সম্মতি জানাল।

কদিন পরে ওয়াং এসে বলল, নতুন একটা নাটক হচ্ছে। সামাজিক ঘটনা। মাঞ্চু রাজাদের সামনে যেমন আমরা ছিলাম তারই একটা দুর্দান্ত কাহিনী। পোষ্টার দেখেছ?

দেখেছি।

তুমি তো বলবে পোষ্টারগুলো যৌনবিকৃতির একটা ধারা। আমি বলব ওখানেই জীবন। এতেই শিল্পী তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ পাবে। যাবে দেখতে নাটক?

চল দেখে আসি।

সেদিন টিকিট পেল না দুজনেই। হল ভর্তি। টিকিটের আশায় গিয়ে শত শত লোক ফিরে এল। মাত্র এক সপ্তাহ চলবে এই অভিনয়। তাই ভীড় সামলাতে পুলিশকেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।

না হল না। কাল অগ্রিম টিকিট কাটব।

আ উন তার ছেলেদের পড়াবার সময় পেতনা। ফেলিস তার ছেলে মেয়েদের পড়াত। তাদের বইগুলো বিশেষ করে ইতিহাস আর সাহিত্য-পাঠ তাকে আচ্ছন্ন করত। চীনের রাজা মহারাজা, জমিদার বড় বড় ভূস্বামীদের কাহিনী ভরা এই সব বই পড়তে পড়তে ফেলিস যেন ফিরে যেত চীনের অতীত জীবনে। সৎ ও দয়ালু মানুষদের কাহিনী পড়তে পড়তে মোহিত হয়ে যেত। সত্যিই যে তার দেশের রাজা মহারাজারা মহান ছিল সে বিষয়ে তার আর কোন সন্দেহ ছিল না। আ উনের ছেলে

মেয়েরা মাঝে মাঝেই তাদের বন্ধু বান্ধবদের কথা বলত ফেলিসকে। তারা বলত, মাষ্টারমশায়রা বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সামনের বেঞ্চে আলাদা বসতে দেয়, তারা পেছনে বসে। কখনও বলত বাবা আমাদের পাবলিক স্কুলে ভর্তি করতে চেয়েছিল, ভর্তি করতে পারেনি। যাদের টাকা কম তাদের ছেলে মেয়েরা পাবলিক স্কুলে পড়বার সুযোগ পায় না। সুযোগ দেওয়াও হয় না।

একদিন আ উন দুঃখ করে ওয়াংকে বলল, তোমার ছেলেমেয়ে নেই ভালই আছ। ছেলেমেয়েদের বড় করা যে কি ঝামেলা তা আর বলতে চাইনা। আমাদের মজুরী কম তাই কোন সম্ভ্রান্ত স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে পারিনি। যেখানে দিয়েছি সেখানে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের ছেলেগুলো পড়ে। তারা আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত্যধিক মন্দ ব্যবহার করে। আমার মেয়ে তো যেতেই চায় না। বার তের বছরের মেয়ের কাছে ওরা যে সব কথা বলে তা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

ওয়াং বলল, কিন্তু স্কুল কলেজে কোন পার্থক্য নেই বলেই তো জানি। তুমি অভিযোগ করতে তো পার, প্রিনসিপ্যালকে অভিযোগ কর, শিক্ষামন্ত্রীকে অভিযোগ কর।

আ উন হেসে বলল, করেছি কিন্তু মনে হচ্ছে শিক্ষা বিভাগই এই তারতম্য চায়, একদল স্নব তৈরীর জন্যই এই ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু জানো ভাই ওয়াং এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে আমাদের গোটা পরিবার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। একমাত্র আমিই বেঁচে আছি আমার বংশে। আমার বাবা ছিল ভূমিহীন কৃষক, আমরা ছিলাম চার ভাই তিন বোন। কোয়াংসির ছোট গ্রামে আমরা থাকতাম। চিয়াং ফৌজের অত্যাচারে আমরা প্রায় শেষ হয়েছি। আমার তিনটে বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় চিয়াং-এর ফৌজ। বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ দেয় আমার বৃদ্ধ বাবা ও মেজ ভাই। আমরা নিরুপায়। আমরা সবাই মুক্তিফৌজে যোগ দিলাম। ময়দানে ময়দানে লড়াই করতে করতে আমার দুই ভাই

প্রাণ দিয়েছে, মায়ের সংবাদ আর পাইনি, শুনেছি না খেতে পেয়ে মারা গেছে। আমি ফৌজ থেকে অবসর নিয়ে কাজ নিয়েছি কাপড়ের কলে, শেষের কটা দিন সুখে কাটাব বলে। তা আর হচ্ছে না। এই মুক্তির জন্য রক্তপাত করেছি তা ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে। শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে আরও একটা 'ইলাইট' (Elite) শ্রেণী যেন গড়ে উঠছে।

ওয়াং রাজনীতি বোঝে না। সে অতশত ভাবতেও শেখেনি। বলল, যে সব ছেলে ইয়ারকি ফাজলামি করে তাদের ঠেঙ্গিয়ে দিলেই হয়।

তারাও দলবদ্ধ হবে। তারাও শোধ নেবার চেষ্টা করবে। ফলে শান্তি হানী ঘটবে। এটা কি ভাল।

আ উন তার ক্ষোভ অনেককেই জানিয়েছে।

কিন্তু শাসন ক্ষমতার শীর্ষে বসে লিউ শাও-চি অপ্রত্যক্ষভাবে এই অবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছে। তার কাজের ধারা দেখে মনে হল সে শোধনবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চীনের সাধারণ মানুষ যখন বুঝতে পারল তখন তাকে আখ্যা দিল 'চীনা ক্রুশ্চেভ'।

আ উনের মত বিক্ষুব্ধ লক্ষ লক্ষ চাষী মজুর। তাদের ব্যথা বেদনা শোনার লোকের অভাব ছিল না চীনে কিন্তু কোন প্রতিকারই যেন হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মত পরিবেশ নেই। চীনে দুটো শ্রেণীর উদ্ভব যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে তখন।

একটি ব্যক্তি কিন্তু চোখ বুঁজে ছিল না। সেই ব্যক্তিটি হল মাও সে-তুং।

মাও বুঝতে পারল মানসিক পরিবর্তন আজও হয়নি চীনে, বিশেষ করে চীনের শাসনক্ষমতার শীর্ষে যে লিউ শাও-চি তারই মনে রয়েছে ধনতন্ত্রের গুপ্ত অভিলাষ।

পিকিং-এর মেয়র পেং চেন।

পেং চেন একটি কমিটি গঠন করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে

আলোচনায় বসল। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব তুচ্ছ করা।

পেং যে রিপোর্ট পেশ করল তাতে স্পষ্ট অভিযোগ আনা হল উচ্চ-পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে। শ্রমিক চাষীরা মনে করছে সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে একটা শ্রেণী বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু সত্যিই তা নয়।

কিন্তু কেন এই অভিযোগ পেং বেশ চতুরতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গেছে।

মানসিক পরিবর্তন ঘটেনি, পরিবেশ তৈরী হয়নি। তাই চীন ক্রমেই যেন দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হতে চলেছে। রাশিয়ার মত অবস্থা তাদের। প্রতি-বিপ্লব আসন্ন। হাঙ্গেরীর অবস্থায় চীনকে পড়তে হবে এমন আশঙ্কাও আছে।

শিক্ষামন্দিরে যে অনাচার তার বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা করল ছাত্রের দল। জনসাধারণ তাতে মদত দিল।

ছেষট্টি সালের দোসরা জুনে প্রথম বিক্ষোভ প্রকাশ পেল কতক-গুলো পোষ্টারে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শ্রেণী বৈষম্যের অভিযোগ উত্থাপন করে। পোষ্টারগুলো লাগানো হল দেওয়ালে দেওয়ালে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রথম প্রকাশ পেল এই ভাবে।

দেখতে দেখতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হল। কারখানায় কারখানায় পার্টির যারা প্রশাসক তাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ হল বৈষম্যের দরুণ। এই হল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সারা চীন দেশে।

লিউ শাও-চি চুপ করে বসেছিল না। দেশের প্রধান সে, ক্ষমতা তার হাতে, পার্টিও তার ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। তারা এই আন্দোলন-

কারীদের বলল, বিদ্রোহী, এদের শ্বেতাতঙ্ক দেখা দিয়েছে। যুক্তির পাহাড় খাড়া করে লিউ বুঝিয়ে দিতে চাইল পার্টির প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধাচারণের অর্থ হল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধাচারণ।

ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ সব চেয়ে বেশি। তাদের দমন করতে সরকারীভাবে তাদের হোষ্টেলের আলো বন্ধ করে দেওয়া হল, স্কুলের ক্যান্টিন বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু আন্দোলন থামল না।

এই আন্দোলনের চাপে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে কর্মচ্যুত করা হল, পার্টি কমিটি নতুন ভাবে গড়া হল। এই সময় মাও পিকিং-এ ছিল না। জুলাই মাসে মাও পিকিং-এ এসে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পার্টি মিটিং আহ্বান করল। এই মিটিং-এ গুরুতর বাদানুবাদ চলতে থাকে। লিউ শাও-চির দল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। মাওকে সে জন্য বিশেষ বেগ পেতে হল ছাত্রদের এই বিদ্রোহকে সমর্থন করতে।

মাও চুপ করে থাকার লোক নয়। মাও নিজের নামে পোষ্টার প্রচার করল, "Bombard the Headquarters"—বিদ্রোহী ছাত্ররা গড়ে তুলল 'রেডগার্ড'—মাও সে-তুং-এর নামের এমন যাদু যে এই আন্দোলনের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই ছাত্র ও জনসাধারণ ভীড় করল মাওকে সমর্থন জানাতে।

ছাত্ররা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চিন্তা করে বিদ্রোহ করেছিল সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে তা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল শিল্প এলাকায়। বিক্ষোভ দেখা দিল সর্বত্র।

পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব।

যারা সব সাচ্চা পার্টি সদস্য তারা ধাঁধায় পড়ল। তারা স্থির করতে পারছিল না লিউ-এর মত সঠিক অথবা মাওয়ের পথ সঠিক। অনেকেই অনাগ্রহ দেখাল এই আন্দোলনে, অনেকে অনেক ভেবে চিন্তে এগিয়ে এল শেষ পর্যন্ত। সাংঘাই পৌরসভার কর্মীরা এই বিদ্রোহী ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হল।

কারখানায় কারখানায় দক্ষিণপন্থী ও বিদ্রোহীদের মাঝে দেখা দল প্রতিদ্বন্দ্বীতা। এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লাগল শহরের সর্বত্র ও প্রাদেশিক সরকারেও। দক্ষিণপন্থীরাও তাদের সমর্থনে জনসমাবেশ করতে থাকে। তাদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা হল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রে দাঙ্গা হাঙ্গামা গুরুতর চেহারা ধারণ করল। কারখানার কর্মীদের বোনাস, বেতন বৃদ্ধি, প্রমোশন দিয়ে দক্ষিণপন্থীরা তাদের দলে টানতে চেষ্টা করল। দলে দলে কারখানার কর্মীদের শহরে পাঠাল। এই শ্রমিকরা বিলাসদ্রব্যের দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম দিতে অস্বীকার করতে থাকে, আর বিদ্রোহীরা তাদের বাধা দিয়ে জিনিস ফেরত দিতে বাধ্য করে, অথবা মূল্য দিতে বাধ্য করে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল। বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীলরা উৎফুল্ল হল এই আত্মঘাতী বিরোধে। চীনের সমাজতন্ত্র যে বিপন্ন এই প্রচারকার্য চলতে থাকে দেশে বিদেশে। আবার চীন যে বুর্জোয়তন্ত্রকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে এমন ইঙ্গিতও দিতে থাকে তারা। তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে দলের ভাঙ্গন আনবে তা প্রমাণ করতে নানাভাবে দূর থেকে সচেষ্ট হল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বাধা দিল দুইটি শ্রেণী। শোধনবাদী দক্ষিণ-পন্থীরা আর চোরা বুর্জোয়ারা। দক্ষিণপন্থীরা পার্টির ওপর আঘাত হানতে থাকে, তারা যুক্তি তর্ক দিয়ে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অসারতা প্রমাণ করতে চায়, আর চোরা বুর্জোয়ারা চেষ্টা করতে থাকে পুরাতন বুর্জোয়া আদর্শ, কৃষ্টি, আচার আচরণকে চালু করতে।

রেডগার্ডরা বেশ সক্রিয় হয়ে উঠল এদের দমন করতে।

বিদ্রোহী রেডগার্ডদের আশঙ্কা হল, এরা প্রতি-বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ করবে।

বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ কারিগর রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত ছিল। জাতীয় স্বার্থে এদের রক্ষা করার প্রয়োজন।

কিন্তু এই আন্দোলনের মুখে অনেক বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ কারিগরও রেড-গার্ডের হাতে ভুলক্রমে নিগৃহীত হয়েছিল। অবশ্য সব সময় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে হবে, শক্তি দিয়ে নয়। মাও হিংসা ও বিশৃঙ্খলার বিরোধী। তবুও মাঝে মাঝে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে। কারণ, প্রতিপক্ষ যুক্তিকে গ্রাহ্য না করে তাদের ইচ্ছামত শোধনবাদ প্রবেশ করাতে চেষ্টা করত, তখন বাধ্য হয়েই রেডগার্ডদের শক্তি দিয়ে তা রুখতে হতো, ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা এড়ান যেত না।

কম্যুনিষ্ট পার্টিতেও তিনটি ভাগ দেখা দিল। একদল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থক, তারা সক্রিয় ভাবে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল, একদল ভীত হয়ে পড়াতে কোন নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করতে পারল না, অপর দল মনে মনে জানত দক্ষিণ পথ ভুল কিন্তু মুখে কিছু বলত না। আবার দক্ষিণপন্থীদের কয়েকজন সক্রিয় ভাবে তাদের মতামত প্রচার করতে থাকে।

সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছিল পার্টির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি-গত ভাবে যারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের আহ্বান জানান হল চিন্তাধারা বদল করার জন্য। যে সব মন্ত্রী এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারণ করেছে তাদের গৃহবন্দী অবস্থায় থাকতে হলেও কারখানায় কারখানায় দক্ষিণপন্থীরা বেশ শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলল।

মাও এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়েছে চীনের সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনতে আর সেই পরিবর্তন সম্ভব একমাত্র সমাজতন্ত্র সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানসিক পরিবর্তন ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মুক্তিফৌজ কোন সময়ই অংশ গ্রহণ করেনি, অথবা অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। যখনই দেখা গেছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হবার উপক্রম তখনই সৈন্যরা এসেছে দাঙ্গা হাঙ্গামা রোধ করতে। সৈন্যদের হাতে কোন অস্ত্র না থাকায়

উভয় পক্ষের আঘাত তাদের বেশি সহ্য করতে হচ্ছিল, ফলে বহু নিরস্ত্র মুক্তিসেনাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, মাল চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে মুক্তি ফৌজকে নিযুক্ত করা হল অন্তর্ঘাতী কাজ বন্ধ করতে। সাতষট্টি সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম মুক্তিসেনাকে নির্দেশ দেওয়া হল বামপন্থীদের সহযোগিতা করার, তারা প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থনে কাজে নেমে পড়ল।

যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে, প্রয়োজনমত শক্তি প্রয়োগ করে, প্রচার ব্যবস্থা প্রখর করে অবশেষে দক্ষিণপন্থীদের কোণঠাসা করে দিল বিদ্রোহীরা। এই কাজে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হয়নি, সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় গৃহযুদ্ধের। পার্টির মধ্যে যে মতটি সমাজতন্ত্রসম্মত তার জয় হল, দক্ষিণপন্থীরা জনসমাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

সমস্যা হল কে মাওপন্থী আর কে নয়। বেছে নেওয়াও একটা দুষ্কর কার্য। সাতষট্টি সালের অকটোবর মাস থেকেই এই বিদ্রোহ থামল। জয় হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। বিপ্লবের পথে বিপ্লবের জয় হল।

মাওয়ের জয়ের পেছনে জনসমর্থনই বড় কথা।

আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যত জয়ই হোক কিন্তু বৈদেশিক কূটনীতিতে মাও ভুল করল।

চীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। এশিয়া ও আফরিকার দেশগুলিতে চীনের বৈপ্লবিক সাফল্য গণচেতনা এনেছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু পশ্চিমী শক্তিও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছিল চীনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে। সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, হঠাৎ যেমন চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি হঠাৎ-ই হ্রাস পেতে থাকে।

ইন্দোনেশিয়াতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল খুব শক্তিশালী, অন্তত এই ধারণা ছিল অনেকেরই কিন্তু মূল সমস্যা যেখানে সেখানে ইন্দোনেশিয়ার

কম্যুনিষ্ট নেতা আইদিত মোটেই হাত দিতে পারেনি। লাল পতাকা হাতে নিয়ে বিপ্লবের বুলি শোনালেই যে কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় না তা গভীরভাবে অনুধাবন করা গেল ইন্দোনেশিয়াতে। সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে তথা মানসিক দিক থেকেও পরিবেশ সৃষ্টিতে আইদিতের ব্যর্থতা ইন্দোনেশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করল। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক চেতনার অভাবে কার্যকালে কম্যুনিষ্ট পার্টি না পারল ক্ষমতা দখল করতে না পারল জনসংগঠন জোরদার করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে রোধ করতে। চীন সর্বতোভাবে আইদিতকে সাহায্য করেছিল, সেই সাহায্য বস্তুত অপাত্রে দানের মত। নাম কা ওয়াস্তে যারা কম্যুনিষ্ট তারা নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠন করতে না পারায় একটি আঘাতে ইন্দোনেশিয়াতে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন সর্বাধিক পেছনে পড়ে গেছে। পৃথিবীর কোন দেশেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এভাবে ব্যাহত হয়নি। এই ক্ষেত্রে মাওয়ের নীতি যেন পরাজিত।

আবার ভারত ও পাকিস্থানের সঙ্গে সীমানা বিরোধে মাওয়ের দাবী যুক্তিসঙ্গত মনে করে অনেকেই। ভারতের সঙ্গে সীমানা বিরোধই হল গুরুতর কুটনৈতিক বিপর্যয়। ভারত গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বলে দাবী করে এসেছে কিন্তু যখন চীন ম্যাকমেহান লাইনকে অস্বীকার করে নতুন করে সীমানা স্থির করতে চাইল তখন ভারত রাজি হল না। সীমান্তে মাঝে মাঝেই সংঘর্ণ হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তা লড়াইতে পর্যবসিত হল। ভারতের গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার মুখোস খুলে গেল। ইংরেজ ও আমেরিকার দ্বারস্থ হল সাহায্য লাভের আশায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় ভারত তার সীমান্তরক্ষায় বাধ্য হল। অথচ সীমান্ত সমস্যা সমাধান হল না।

অন্যদিকে চীনের প্রভাব বিস্তারের আশায় পাকিস্থানের সঙ্গে মিতালিও বৈদেশিক নীতির অপব্যবহার বলে মনে করা হয়। ভারত ধনতন্ত্রবাদী এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী দেশ যদি হয় পাকিস্থানের প্রশাসন

ব্যবস্থা তার চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এটা চীনের অজানা নয় অথচ পাকিস্থানকে তোষণ করছে চীন। যদি প্রভাব বিস্তার করে পশ্চিমী শক্তিকে সন্ত্রস্থ রাখা উদ্দেশ্য হয় তা হলে সেখানেও ভ্রম রয়েছে।

যে বিপ্লব চীনকে মুক্ত করেছে, সেই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ বুর্জোয়াতন্ত্রী দেশেও সাফাল্যলাভ করতে পারে এ বিষয়ে যদি বেশি মনোযোগ দেওয়া হতো তা হলে বৈদেশিক ক্ষেত্রেও চীনের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আস্থাশীল মাও যে ভাবে নিজের দেশকে দক্ষিণ-পন্থী ও প্রতি-বিপ্লবীর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, ঠিক সেইভাবেই বিভিন্ন দেশে যাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক ধারায় ঘটে তার বনিয়াদ তৈরী করাই ছিল বৈদেশিক নীতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কাজ। বোধহয় সে ক্ষেত্রে মাও কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল।

পিকিং-এর মেয়র পেং চেন-ই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কি পদ্ধতি হওয়া উচিত সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে তা নিয়ে কমিটি গঠন করেছিল। পেং-কে পদচ্যুত করে বন্দী রাখা হয় তার এই প্রচেষ্টার জন্য। কারণ, পেং-এর উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করার সূত্র খোঁজা।

কিন্তু এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রবক্তা কে? – মাও অথবা অন্য কেউ, এ নিয়ে অনেকে অনেক রকম মত পোষণ করে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় মাও যা চেয়েছে, মাওয়ের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারা যেরূপ, তার পক্ষে এই আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করাই স্বাভাবিক।

মাও সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও The large part of the responsibility obviously rests on Lin Piao—বেশির ভাগ

দায়িত্ব ছিল লিন পিয়াওয়ের। আরেক জন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। এই বিশিষ্ট লোকটি হল মাওয়ের স্ত্রী ল্যান-পিং (চিয়াং চিং)। মাওয়ের সঙ্গে ল্যান-পিং-এর বিয়ে হয়েছিল ইনানে বিপ্লবের যুগে। কিন্তু কাই-হুই যেমন সব সময় স্বামীর রাজনৈতিক কাজে অংশীদার ছিল ল্যান-পিং প্রথমে তা ছিল না। বলতে গেলে নেপথ্যেই ছিল ল্যান-পিং। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ল্যান-পিং নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এল। বাষট্টি সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে দেখা গেছে। অন্য কোন রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনায় তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সহ-নেত্রী রূপে ল্যান-পিং এসে দাঁড়াল জন-সমাজে। এরপর বহু জনসভায় ল্যান-পিংকে দেখা যেত।

ল্যান-পিং গণমুক্তি বাহিনীর সাংস্কৃতিক বিষয়ে উপদেষ্টা নিযুক্ত হবার পর সে জনসমাজে তার নিজের স্থান গড়ে নিল। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে ল্যান-পিং যোগাযোগ স্থাপন করে সমাজতান্ত্রিক ধারায় শিল্প ও সাহিত্যকে গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাল।

মাওয়ের স্ত্রী যে ভাবে শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে এই বিপ্লবকে পরিচালনা করল তাতে নতুন প্রেরণা জাগল জনমনে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তিন জন নেতা -- মাও, লিন পিয়াও আর ম্যাদাম মাও তিন দিক রক্ষা করতে ব্যস্ত। মাও শ্রমিক চাষীদের সংগঠন করতে থাকে। লিন পিয়াও গণমুক্তি-ফৌজকে টেনে আনে এই বিপ্লবের অংশীদার হতে আর ম্যাদাম মাও সাহিত্য শিল্প নিয়ে কাজে নামল।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টার লাগাবার পরই পিকিং যন্ত্রপাতির কারখানায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পরের দিন কারখানার দেওয়ালে কয়েক হাজার প্রচারপত্র মারল শ্রমিকরা। শ্রেণীহীন সমাজে যে শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তার নিদর্শন হল কারখানার ডেপুটি চিফ ইনজিনিয়ার।

এই ইনজিনিয়ার ছিল কুয়োমিনটাং সরকারের কর্মচারী। তার নিজস্ব কারখানা ছিল এবং কুয়োমিনটাং আমলে সে একজন শিল্পপতি বলেই পরিচিত ছিল। তার আচার আচরণ ছিল সন্দেহজনক সেজন্য শ্রমিকরা তাকে পছন্দ করত না। উপরন্তু এই ইনজিনিয়ারের কারখানা সরকার গ্রহণ করার দরুণ কারখানার উৎপাদন থেকে সে ব্যাজ পেত।

কারখানার অফিসারদের অধিকাংশই কারখানার অতীত মালিক বা ডিরেকটার। তাদের কাজের পদ্ধতিতে সেই বুর্জোয়া পদ্ধতি। তারা যে শ্রমিকদের চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর এবং তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের পার্থক্য যে অনেক বেশি তা বুঝিয়ে দিত কাজকর্ম দিয়ে। শ্রমিকরা কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারকে ভিত্তি করেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। তারা যে চোরা ধনতন্ত্রবাদী তাও প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকে। এই সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মনে করত শ্রমিকরা তাদের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর এবং নিজস্ব তাদের জীবনধারা ছিল বুর্জোয়াদের তুল্য।

একদিন নদীতে স্নান করার সময় একটা বালক জলে ডুবে যায়। দেখতে পেয়ে একজন শ্রমিক ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে তাকে বাঁচাতে কিন্তু সেখানে যে সব উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল তারা এই কাজে মোটেই আগ্রহ দেখাল না, তাদের ব্যবহার ছিল হৃদয়হীনের মত। শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হল।

কারখানার গাড়ি নিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রতি রবিবারে মাছ ধরতে যেত। অথচ শ্রমিকদের গুরুতর প্রয়োজনেও গাড়ি দেওয়া হতো না কোন সময়ই ।

আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার স্ত্রীকে এনে বসাল কারখানার উচ্চপদে। এই কাজ করার মত যোগ্যতা না থাকলেও মহিলাটি অফিসারের স্ত্রী, সেজন্য তার পক্ষে এই উচ্চপদ পেতে কোন কষ্ট হয়নি।

যে সব উচ্চপদের কর্মচারীদের কায়িক পরিশ্রম করতে হতো তারা নানা কৌশলে সে সব কাজ শ্রমিকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা হালকা কাজে হাত দিত। কারখানার টাকায় সাঁতার দেবার 'পুল' তৈরী করত অফিস সাজাতো কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিত না। এ বিষয়ে অভিযোগ করেছিল শ্রমিকরা। অনুসন্ধানের জন্য পিকিং পৌর এলাকার কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি তদন্ত কমিটিও নিযুক্ত করেছিল।

কমিটির সদস্যরা এল তদন্তে। তারা শ্রমিকদের ডেকে বলল, আমরা তোমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সাহায্য করতে এসেছি। তোমাদের অভিযোগ তদন্ত করে তা সমাধান করতে চাই।

শ্রমিকরা খুশী মনে বলল, আমরা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চাই তার সুচনা হোক এই কারখানা থেকে।

নেতারা বলল, সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমরাও চাই কিন্তু কারখানায় কি করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারছি না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্র হল বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা এগুলোই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অঙ্গ, কারখানা তো নয়।

আমাদের মহান নেতা মাও বলেছেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্র সর্বত্র। চীনের জীবনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনতে না পারলে চীনের সর্বনাশ হবে। শিক্ষায়তনে, কলে কারখানায়, শিল্পে, গণমুক্তি ফৌজে অর্থাৎ সর্বত্র মানসিক পরিবর্তন চাই।

তদন্ত কমিটির নেতারা এই দাবী স্বীকার করল না। বলল, মাও সে-তুং মহান কিন্তু তার নির্দেশিত পথ ভ্রান্ত। তোমরা বিপথে চলেছ।

নেতারা তাদের বক্তব্য পোষ্টার দিয়ে প্রচার করল।

আবার শ্রমিকরাও রাতারাতি শয়ে শয়ে পোষ্টার দিয়ে প্রতিবাদ জানাল তদন্ত কমিটিকে।

পিকিং কম্যুনিষ্ট পার্টি দেখল শ্রমিকরা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ। তাদের শান্ত করতে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে সে কৌশল ব্যর্থ

হয়েছে। তারা আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে পাঠাল। এই কমিটি এসেই নিজেদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থক বলে জাহির করতে থাকে। শ্রমিকদের বক্তব্য শুনে একটি বিপ্লবী তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের হাতে দিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব। কিন্তু যে বিপ্লবী কমিটি তারা গঠন করল তার সদস্য হল কম্যুনিষ্ট পার্টির কয়েকজন সদস্য, কারখানার কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী কিন্তু শ্রমিকদের সেই কমিটিতে নেওয়া হল না। শ্রমিকরা বুঝতে পারল এই কমিটির উদ্দেশ্য হল বিপ্লবকে বিপরীতমুখী করে তোলা। যাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ভুলপথে পরিচালিত হয় তার জন্য চেষ্টা করা।

শ্রমিকরা তাদের মধ্য থেকে আঠার জন সদস্য নিয়ে আরেকটি কমিটি গঠন করে তথাকথিত বিপ্লবী কমিটিকে বিতাড়িত করার আহ্বান জানাল।

দ্বিতীয় তদন্ত কমিটি যখন ব্যর্থ হল তখন আরেকটি কমিটিকে পাঠান হল। এরা এসেই সরাসরি আক্রমণ করল বিদ্রোহী শ্রমিকদের। তারা শ্রমিকদের কমিটিকে প্রতি-বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে চোরা বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চেষ্টা করতে থাকে। তাদের বক্তব্য হল এই বিদ্রোহীরা শোধনবাদী এবং হাঙ্গেরীতে যেমন কিছু শোধনবাদী প্রতি-বিপ্লব ঘটিয়েছিল এরাও চীনে তাই ঘটাতে চায়। আরও তারা বলল এই তদন্ত কমিটি (Work Committee) কে প্রতিরোধ করার অর্থ চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাধা দেওয়া, চীন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বাধা দেওয়ার অর্থ চেয়ারম্যান মাও সে-তুংকে অমান্য করা।

এই তৃতীয় তদন্ত কমিটি মাওয়ের দোহাই দিয়ে কিছুটা সাফল্য-লাভ করল। শ্রমিকরা যখন দ্বিধাগ্রস্থ, তখন তাদের মধ্যে দল উপদল দেখা দিল। যারা পার্টির অন্ধ ভক্ত তারা এদের যুক্তিকে মেনে নিল। পার্টির নির্দেশ অমান্য করার মত মনোবল অনেকেরই ছিল না। পার্টি যে ধনতন্ত্রের পথ ধরেছে এ বিচার করার মত অধিকার ও যোগ্যতাও তাদের হয়ত ছিল না। 'যারা কর্তৃপক্ষকে

সমালোচনা করছে তারা পার্টির নির্দেশ অমান্য করছে'। এই বিশ্বাস কিছু লোকের মনে জন্মাল। এই সুযোগে তদন্ত কমিটি একটা বিরাট সভার আয়োজন করল, এই সভায় প্রকাশ্যে যে আঠার জন শ্রমিক কমিটিতে ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হল। সভার শেষে তদন্ত কমিটি এই আঠার জনের বাড়িতে গেল। তাদের পরিবারের সকলকে বুঝিয়ে দিল এরা প্রতি-বিপ্লবী, এরা চীনের সমাজতন্ত্র ধ্বংস করতে চায়। তদন্ত কমিটি পার্টির প্রতি আনুগত্যের ওপর বেশি জোর দিতে থাকে, তারা মাও সে-তুংকে পার্টি আদর্শের সামনে দাঁড় করিয়ে সাধারণ মানুষের ও পার্টি সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেও কিছুটা সাফল্য লাভ করল। কিন্তু যে মাও সে-তুং-এর নাম ভাঙ্গিয়ে এই প্রচার সেই মাও সে-তুং এ বিষয়ে কিছুই জানত না।

যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা ক্রমেই অপাংক্তেয় হতে থাকে। এমন কি তাদের পারিবারিক জীবনও অশান্তিময় হতে থাকে। স্বামীর কাজ স্ত্রী অপছন্দ করত, স্ত্রীর কাজ স্বামী অপছন্দ করত। গৃহ বিবাদ হল নিত্যকার কাজ। অনেকেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

কিন্তু যারা সত্যই সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বাস করত, যারা লিউ শাও-চির ধনতন্ত্রমুখী পথকে অপছন্দ করত, যারা সর্বত্র গণতন্ত্র স্থাপনে আগ্রহী, যারা শ্রেণীহীন সমাজে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব সহ্য করতে পারছিল না তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত এবং তারা কিছুতেই তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হল না।

দ্বন্দ্ব আরও কতদূর অগ্রসর হতো বলা যায় না। মাও পিকিং ফিরে এসে অবস্থা দেখে হতবাক্। কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং চলল দশ দিন ধরে, তারপরই মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থনে ফতোয়া দিল। ঘটনার গতি ও প্রকৃতি বদল হল সেই থেকে।

মাও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করল সাংস্কৃতিক বিপ্লবে।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মাও বলল, আমাদের এই

বিপ্লব প্রয়োজন আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থে। সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানসিক পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন।

তোমার এই চেষ্টা তো রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য।

মাও হেসে বলল, আমি পার্টির চেয়ারম্যান। রাজনৈতিক ক্ষমতা এর বেশি কি কিছু অধিকার করা যায়। আমার এই চেষ্টা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য নয়, আমার এই চেষ্টা সমাজতন্ত্রকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যারা চীনের মঙ্গল চায় তারা এই চেষ্টা থেকে বিরত হবে না। যদি আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চীনের জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তন না আনতে পারি তা হলে চীনে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করাও সম্ভব হবে না, দ্বিতীয়ত প্রতি-বিপ্লব ঘটার আশঙ্কা থাকবে, তৃতীয়ত চীনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

আমরা মনে করি All political struggle is a struggle for Power.

মাও বলল, Right, for this power should be for socialism—সমাজতন্ত্রের জন্যই ক্ষমতা দরকার। সর্বহারার মুক্তিযুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয় ফ্রান্সে - প্যারিস কম্যুন তার উদাহরণ কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই ব্যর্থতা থেকেই পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সর্বহারাদের নেতারা। পরবর্তীকালে সর্বহারার বিপ্লব হল রাশিয়ার অকটোবর বিপ্লব। এই বিপ্লব সাফল্যলাভ করে। আর তৃতীয় বিপ্লব হল চীনের বিপ্লব। ক্ষমতালাভ করাই বড় কথা নয়, ক্ষমতার প্রয়োগ হল আসল কথা।

তোমরা সর্বহারা কাদের বলতে চাও?

যারা বিপ্লবের পূর্বে ছিল দরিদ্র ভিখারী, ভূমিহীন কৃষক, বঞ্চিত মজুর, ছোট ছোট চাষী।

আর, বুর্জোয়া কাদের বলতে চাও?

অতীতে যারা ছিল সামন্ত, জমিদারীর উপসত্বভোগী ভূস্বামী, মিল মালিক, পুরাতন যুগের ভাবধারা প্রচারকারী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়।

এরা কি করতে পারে ?

এরা ব্যক্তিস্বার্থকে তুলে ধরবে জনমনে নানা কৌশলে, প্রতি-বিপ্লবের বীজ বপন করবে, সমাজে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করবে। সোভিয়েত আমাদের শিখিয়েছে, সম্পদ কেড়ে নিলেই বিপ্লব সফল হয় না, বিপ্লবের মূল নীতি যা সফল করতে রাশিয়া পারেনি, তাদের সমাজ-জীবনে চোরাগোপ্তা বুর্জোয়া থেকে গেছে, সেইজন্য তারা শোধনবাদী হতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের কাছেই শিখেছি শোধনবাদের পথ পরিহার করতে হলে চোরাগোপ্তা বুর্জোয়াদের সঙ্গে লড়াই করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন রয়েছে প্রত্যেক সমাজ-তান্ত্রিক দেশে, আমাদেরও।

এটা কি সম্ভব ?

অসম্ভব নয়। অবশ্য হাজার হাজার বছর ধরে যে বিষ সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়েছে তা শেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে। তার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি।

সাংঘাইয়ের মেঠাই কারখানায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার এসে ধাক্কা দিল। এই কারখানা ছিল একজন ধনীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সরকার থেকে কারখানা দখল করার পর পূর্বতন মালিক মাসিক তিনশ' ষাট য়ুয়ান (চীনের টাকা) করে উপসত্ব পেত। পরবর্তীকালে তার পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে একশ. ষাট য়ুনান করে উপসত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই কারখানায় প্রস্তুত মেঠাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠান হয়। কর্মীদের শতকরা ষাট জন ছিল মহিলা।

বিপ্লবের ঢেউ আসতেই পার্টির সদস্যদের সমালোচনা আরম্ভ করল। স্থানীয় পার্টি কোনক্রমেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমর্থন করল না। অবশেষে জানুয়ারী মাসের কোন একদিনে শ্রমিকরা দখল করল কারখানা কিন্তু তাতে অসুবিধাও হল যথেষ্ট। কাজ পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনেকেরই ছিল না ফলে উৎপাদন হ্রাস পেতে

থাকে। তারা পার্টির কট্টর সমর্থকদের বিদায় করে দিয়েছিল। শেষে স্থির করল, এই সব কট্টর সদস্যদের ভুল সংশোধন করতে সুযোগ দেওয়া উচিত। তারা প্রত্যেক সদস্যের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করল।

কারখানার উপাধ্যক্ষ পার্টির ভুল পথ অবলম্বন করেছিল। তাকে ডেকে আনা হল। তার অতীত পর্যালোচনা করা হল।

এই উপাধ্যক্ষ একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। বাল্যকালে পথে পথে সে ভিক্ষা করত। তের বছর বয়স থেকে একজন জমিদারের বাড়িতে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে থাকে। ষোল বছর বয়সে সে যোগ দেয় গণমুক্তিফৌজে। যখন তার আঠার বছর বয়স তখন পার্টির সদস্যপদ লাভ করে। বহুকাল যাবত পার্টির নির্দেশমত কাজ করে এসেছে এই উপাধ্যক্ষ।

স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তির পার্টির প্রতি আনুগত্য থাকবে। বিশেষ করে মাও সে-তুং-এর নাম করে যেখানে পার্টির নির্দেশ মান্য করার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে এবং বিদ্রোহীদের প্রতি-বিপ্লবী বলা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে ভুল করা সম্ভব।

কারখানার পার্টিতে যারা ছিল তাদের মধ্যে যে মহিলা ছিল সেক্রেটারী সে-ই বিশেষ ভাবে বাধা দিয়েছিল এই বিপ্লবকে। এর কারণ খুঁজতে হল শ্রমিকদের। তাকে ভুল সংশোধন করতে বলা সত্ত্বেও যখন সে বিদ্রোহীদের প্রতি-বিপ্লবী বলতে ক্ষান্ত হল না তখন তার অতীত জীবন বিশ্লেষণ দরকার হল।

বাল্যকালে এই মহিলাকে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় এবং নানা প্রকার নির্যাতনও সহ্য করতে হয়। পার্টিতে যোগ দিয়েই সে মনে করল বেশ উঁচুস্তরে সে উঠেছে। তার এই Complex চিন্তাধারাই তাকে এই ভাবে উত্তেজিত করেছিল। পার্টি তাকে উঁচু পদে বসিয়েছে, পার্টির বিরুদ্ধাচারণ করার অর্থ তার উঁচুপদ থেকে নেমে আসা। তাতে সে মোটেই রাজি হতে পারে না। তাকে সেক্রেটারীর

পদ থেকে নামিয়ে প্রচার কার্যে নিযুক্ত করল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুগামীরা।

কারখানার ডিরেকটার আবার ভুল করেছিল। সে বিশ্বাস করত বুর্জোয়া আর সর্বহারা একত্র বিনা বিবাদে সহাবস্থান করতে পারে। সেই জন্যই সরবরাহ বিভাগে একজন এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিল যে অতীতে ছিল উৎকট শ্রেণীর বুর্জোয়া। কারখানা পরিচালনা বিষয়ে শোধনবাদী পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেছিল প্রথম থেকেই, শ্রমিকদের কোন সময়ই বিশ্বাস করত না। শ্রমিকদের প্রায়ই বলত পুঁজি না হলে কারখানা চলতে পারে না। কারখানায় যে মাল তৈরী হতো তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলেও ডিরেকটারের ঝোঁক ছিল পুঁজিবাদের দিকে। শ্রমিকদের নীচু স্তরের মনে করত সব সময়। তার চেষ্টা ছিল, কারখানার লাভ বৃদ্ধি করা শ্রমিকদের ইনসেনটিভ বোনাস দেবার ব্যবস্থা করেছিল লাভ যাতে বেশি হয় তার জন্য। বুর্জোয়া পরিবারে এই ডিরেকটারের জন্ম, বুর্জোয়া ধরণের তার জীবনযাত্রা প্রণালী এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে উঠাবসা খানাপিনা চলত।

এই ব্যক্তি যে গুরুতর ভুল করেছে এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না। এর মানসিক পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাকে সুযোগ দেওয়া হল সংশোধন করার কিন্তু সে যেন ভীত হয়ে পড়ল। সেজন্য তাকে ডিরেকটার পদ থেকে সেলসম্যানের কাজে নিযুক্ত করেছিল শ্রমিক সংগঠন। এতে তার আমিত্ববোধ নিশ্চয়ই কমবে, সাধারণ মানুষের একজন বলে নিজেকে দাবী করতে পারবে।

বর্তমানে এই কারখানা পরিচালনা করছে শ্রমিকদের একটি কমিটি। এই কমিটিতে আছে এগার জন সদস্য, তাদের মধ্যে তিনজন মহিলা।

এই ব্যবস্থায় কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে, মালের চাহিদা ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল।

সাংঘাইয়ের একটি কারখানায় কাজ করত কিছু অন্ধ ও বোবা।

অন্যান্য দেশে অন্ধ ও বোবাদের কাজ দেওয়া হয়, কারণ কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রে এদের জন্য কিছু না করলে এরা জীবিকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই পায় না। মোটামুটি দাক্ষিণ্যের ব্যাপার। এদের দয়া করে সমাজ কিন্তু চীনের সমাজতন্ত্র এদের দয়া করে না, এদের সমাজতন্ত্র গঠনে সাহায্য করতে নিযুক্ত করে।

সাংঘাইয়ের এই কারখানায় যে সব অন্ধ ও বোবা কাজ করে তারা অতীতে পথে পথে ভিক্ষা করত, অথবা কোন দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে দায় স্বরূপ হয়ে বাস করত। এদের কাজ ছিল ভিক্ষা করা অথবা জ্যোতিষের মত অপরের ভাগ্য গণনা করা।

কিন্তু এদের নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছিল নতুন রাষ্ট্র। এই কার-খানায় যে চারশ ষাট জন কাজ করত তাদের মধ্যে মাত্র একশ' তিরিশ জন ছিল স্বাভাবিক মানুষ আর সবাই অন্ধ অথবা বোবা। আর এই একশ' তিরিশ জন ছিল অন্ধ ও বোবাদের সাহায্যকারী।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাঝ দিয়েই এই শ্রমিকরা জানতে পারল যে পার্টির যারা পরিচালক তারা ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রী পথ অবলম্বন করছে। কারখানার পরিচালন ব্যবস্থা মোটেই গণতন্ত্র সম্মত নয়। অন্ধ বোবা কর্মীরাও বিদ্রোহ করল। প্রথমে পার্টি থেকে এই বিদ্রোহ দমন করার সব রকম চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরা জয়লাভ করে। অন্ধ বোবা যারা সমাজে ছিল তারা জানতে পেরেছে তারা তাদের পরিবারকেই শুধু সাহায্য করছে না, তারা সমাজ গঠনের যে একটা অংশীদার তাও তারা বুঝতে পেরেছিল। অগণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের উপর যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিবিধানের জন্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল, তারা তাতে সক্রিয় ভাবে অংশও গ্রহণ করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিল ছাত্রসমাজ।

প্রথমত শিক্ষাসূচীর বিরুদ্ধেই তাদের বেশি অভিযোগ। শিক্ষাকাল বৃদ্ধি করা হয়েছিল অহেতুক ভাবে, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার কোন সমন্বয় ছিল না। কেতাবী পাঠ্য বেশি, বাস্তব সঙ্গতিহীন এই পাঠ-ব্যবস্থা। হাতে কলমে শেখার ব্যবস্থা অতি সামান্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠেছিল, সাধারণ কৃষক মজুরদের ছেলেরা সেখানে প্রবেশ করতে পারত না সহজে। কৃষক-মজুর সমাজ থেকে যে সব ছাত্র এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সঙ্গে অভিজাত মান্দারিণ ও চোরা বুর্জোয়া শ্রেণীজাত ছাত্ররা আলাদা করে দেখতো সুযোগ সুবিধাও অভিজাত মান্দারিণ ও চোরা বুর্জোয়া ঘরের ছাত্ররা বেশি পেত। যারা পশ্চাদপদ তাদের জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়া দূরের কথা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও বঞ্চনা সহ্য করতে হতো।

ভূবিদ্যা শিক্ষার কলেজে সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত বই থাকত পাঠ্য, পাঠ্যসূচীতে হাতে কলমে শেখার সুযোগ থাকত কম, কেতাবী বিদ্যাই বেশি। কলেজে রাজনৈতিক আলোচনা যাতে না হয় তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করত কর্তৃপক্ষ। কম্যুনিষ্ট পার্টিও এই নির্দেশ দেওয়াতে সবাই মনে করত স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করে ছাত্ররা পার্টির নির্দেশ মেনে চলবে ক্রীতদাসের মত।

ছাত্ররা এই শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করতেই পার্টি থেকে লোক গেল তদন্ত করতে। তারা চেয়ারম্যান মাওয়ের প্রতিনিধিত্ব দাবী করে ছাত্রদের এই বিদ্রোহকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল। ছাত্ররা যখন জানতে পারল এই তদন্তকারী দলকে লিউ শাও-চি পাঠিয়েছে, চেয়ারম্যান মাও নয় তখন বিক্ষোভ আরও ব্যাপক হল।

ভূবিদ্যা বিষয়ক দপ্তরের প্রতি-মন্ত্রী এল তুশ' সঙ্গী নিয়ে। ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে চাইল, যে পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা ব্যবস্থা তা সঠিক পথ, ছাত্রদের ভূমিকা আপত্তিজনক এবং প্রতি-বিপ্লবের গন্ধ রয়েছে

তাদের আন্দোলনে। এই শুনেই ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হল, প্রতি-মন্ত্রীর যুক্তি অগ্রাহ্য করে প্রায় দুহাজার ছাত্র বিদ্রোহ করে প্রতিবাদ জানাল। প্রতি-মন্ত্রীকে সদলে বিদায় করে দিল তাদের কলেজ থেকে।

আরেক দল তদন্তকারী এল পো ই-পোর নেতৃত্বে। পো নিশ্চিত-ভাবে বলল যারা এই আন্দোলন করছে তারা প্রতি-বিপ্লবী। ছাত্রদের আত্মসমালোচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেবার উপদেশও ছিল। যে সব পার্টি সদস্য বিদ্রোহী ছাত্রদের পক্ষে ছিল তাদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হল কিন্তু বিদ্রোহীদের নেতারা কোনক্রমেই মাথা নত করল না। ইতিমধ্যে মাও পিকিং-এ ফিরে আসতেই আন্দোলনের গতি অন্যপথ ধরল।

মাও তার ষোলটি পয়েন্ট প্রচার করার পরই ছাত্ররা ভূবিদ্যা বিষয়ক মন্ত্রণালয় দখল করে রাখল তিন দিন। পো ই-পোর অতীত নিয়েও আলোচনা আরম্ভ হল। মুক্তি যুদ্ধের আগেও পো ছিল বুর্জোয়ার এজেন্ট, মুক্তির পরও গোপনে সেই কাজ করত অথচ সে বুদ্ধি বলে উঠে বসেছিল মন্ত্রীর গদীতে। সবাই আশ্চর্য হল এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতক কি করে এতকাল মন্ত্রীর আসনে বসেছিল।

কলেজেও ঝাড়াই বাছাই করে দেখা গেল শিক্ষকদের মধ্যে তিন চারজন ধনতন্ত্রের পথকেই শ্রেষ্ঠপথ মনে করে এবং তার জন্য গোপনে প্রচার কার্য চালায়। এদের মনের পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রথম প্রথম অনেকেই ছিল এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিপক্ষে। ধীরে ধীরে তারা ভুল বুঝতে পারল, তারা এগিয়ে এসে নিজেদের ভুল সংশোধন করতে থাকে।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও বিদ্রোহ করেছিল। আট বৎসরের পাঠক্রমে হাতে কলমের কাজ ছিল মাত্র দু বছর। এতগুলো বছর নষ্ট করার পক্ষপাতী নয় ছাত্ররা বিশেষ করে চিকিৎসা বিদ্যা যে সমাজ সেবার উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজের সর্বস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ দরকার। সে বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা নীরব। চিকিৎসা

বিদ্যাকে অর্থোপার্জনের একটা যন্ত্র মনে করেই শিক্ষা দেওয়া হতো। আর শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল শুধু বুর্জোয়া মতাবলম্বী অভিজাত ও মান্দারিণ পরিবারের ছেলেদের। কৃষক-মজুর শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ দেওয়াই হতো না। ক্রমেই কৃষক-মজুর শ্রেণীর ছাত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু তাদের মনোভাব সেই সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে। বুর্জোয়া সমাজে দরিদ্র ছাত্ররা ধনীর ছেলের সঙ্গে পড়তে গেলে সব সময়ই দরিদ্র পরিবারের ছেলে তার যেমন দারিদ্র্য গোপন করার চেষ্টা করত, গরীব চাষীর ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত হতো সেই অবস্থা দেখা দিল মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়। একটা কুলী রমণী ঠেলা দিয়ে মাল বহন করত। তার ছেলে পড়ত মেডিক্যাল কলেজে। একদিন তার মায়ের সঙ্গে কলেজে দেখা হল। ছেলে নিজের মাকে মা বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত, নিজের গর্ভধারিণীকে সে চিনতে না পারার ভান করল। এই রকম নৈতিক অধঃপতন ঘটছিল শিক্ষা ব্যবস্থায়। সর্বহারার সন্তান নিজেকে সর্বহারা বলতে লজ্জিত হয়, এমন শিক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্বাভাবিক।

মেডিক্যাল কলেজে বিদ্রোহ ঘটতেই ডিরেকটার ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করল। এদিকে পার্টি থেকে সেখানেও তদন্ত কমিটি এসে উপস্থিত। তারা বিদ্রোহীদের স্বমতে আনতে না পেরে তাদের প্রতি-বিপ্লবী আখ্যা দিতে কসুর করল না।

মেডিক্যাল বিভাগের প্রতি-মন্ত্রী তাও চু এল ছাত্রদের সমর্থন করতে। পরবর্তীকালে দেখা গেল তাও সাংস্কৃতিক বিপ্লববিরোধী এবং ছাত্রদের স্বমতে আনতে তাদের বামপন্থী কাজকে বাইরে বাইরে মাঝে মাঝে সমর্থন জানায়। তার চাতুর্য বেশী দিন গোপন ছিল না ছাত্রদের কাছে।

ছাত্ররা স্লোগান দিল, "Down with the top party person taking the Capitalist road" পার্টির উচ্চপদে যারা বসেছিল তারা যে ধনতন্ত্রের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে তা যখনই বুঝতে পারল তখনই সবাই ধিককার দিতে লাগল পার্টির নেতাদের।

লিউ শাও-চি কিন্তু এই বিদ্রোহ দমনে মোটেই কসুর করেনি। 'work team' পাঠাতে লাগল ছাত্রদের বিদ্রোহ দমন করতে। তাও চেষ্টা করতে লাগল যে সব ছাত্র ও শিক্ষক বিদ্রোহীদের বিপক্ষে তাদের রক্ষা করতে। তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থকদের একটা তালিকা তৈরী করে তাদের প্রতি-বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে প্রচার চালাতে থাকে। ডিরেকটার ছাত্রদের আন্দোলনকে সমর্থন করায় তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হল। ছাত্রদের কাগজ, কালি দেওয়া বন্ধ করা হল যাতে কোন প্রচারপত্র তারা না লিখতে পারে। হোষ্টেলের আলো বন্ধ করা হল, ক্যান্টিনে খাবার দেওয়া বন্ধ করা হল। তবুও ছাত্ররা নতি স্বীকার করল না।

অবশেষে ছাত্ররা জয়লাভ করল। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কি ভাবে হবে তা স্থির করতে ত্রিপক্ষ নিয়ে কমিটি গঠিত হল। এতে রইল পার্টির সদস্য, বিদ্রোহী ছাত্র ও শিক্ষক এবং জঙ্গী ছাত্রদের প্রতিনিধি। এই কমিটির চেয়ারম্যান হল একজন তেইশ বছর বয়সের ছাত্র।

ইনজিনিয়ারিং কলেজেও ছাত্ররা বিদ্রোহ করল। তাদেরও কেতাবী বিদ্যার ওপর নির্ভর করতে হতো। হাতে কলমে কাজ করতে দেওয়া হতো না। কেউ কলেজে ভর্তি হতে এলে তাকে বলা হতো, একজন ইনজিনিয়ারের মগজ হবে দার্শনিকের মত, চোখে থাকবে চিত্রকরের দৃষ্টি, সঙ্গীত-বিদের মত থাকবে তাদের শ্রবণ শক্তি, আর হৃদয় হবে কবির মত। ছাত্রদের শেখান হতো কি করে তারা অভিজাত হতে পারবে। সমাজের প্রয়োজন মেটাবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হতো না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমছিল অনেকদিন থেকেই, সেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ল ছাত্র বিদ্রোহে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই লিউ শাও-চি এই বিদ্রোহকে প্রতি-বিপ্লব নামে অভিহত করে পূর্ব ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। শিক্ষাক্ষেত্রের এই বিদ্রোহ সাফল্যলাভ করল, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনও ঘটল। অবশেষে সাংস্কৃতিক বিপ্লব জয়লাভ করল শিক্ষার ক্ষেত্রে।

অপেরায় ও থিয়েটারে যে-সব নাটক অভিনীত হতো তাদের বিষয়-বস্তু ছিল জমিদার ও ধনীদের গুণ কীর্তন। ল্যান-পিং (ম্যাদাম মাও) নিজে ছিল অপেরা অভিনেত্রী। সে যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে নেত্রী হয়ে দাঁড়াল তখন তার কাজ হল বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক অভিনয় বন্ধ করে সাধারণ মানুষের জীবন কথা যাতে নাটকের মাধ্যমে রূপায়িত হয় তার চেষ্টা করা। কৃষক বিদ্রোহ, গণমুক্তির জন্য সংগ্রাম, বুর্জোয়ার অভিপাশ—এইসব বিষয় নিয়ে নতুন নতুন নাটক রচনা হতে থাকে, নতুন নাটকে জনজীবনকে উদ্‌ঘাটিত করতে সচেষ্ট হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমর্থকরা। তারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। সর্বত্রই তারা শুনতে পেত সূক্ষ্ম শিল্পবোধকে হত্যা করে চাষাড়ে ছোটলোকের কাণ্ড নিয়ে নাটক রচনা ও অভিনয় মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রথমে জনসাধারণ বাধা দিল পুরানো বুর্জোয়া নাটক অভিনয়ে। তারা দাবী করল মানুষের জীবন কথা, বিশেষভাবে সর্বহারাদের জীবন কথা নিয়ে নাটক রচনা করতে হবে। লিউ শাও-চির প্রভাবে যে সব পার্টি কমরেড এই দাবীকে অগ্রাহ্য করে পুরাতন ধরনের নাটক অভিনয় করতে গোঁয়ার্তুমি দেখাতে থাকে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে থাকে বিদ্রোহীদের। যুক্তি-তর্ক যখন ফলপ্রসূ হল না তখন দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হল। অনেক অপেরা বন্ধ হয়ে গেল।

ভিন্নমুখী দাবীর ঢেউতে শৃঙ্খলাভঙ্গও হল বহু ক্ষেত্রে। উভয় পক্ষের প্রচার ব্যবস্থাও সক্রিয়। পোষ্টারে পোষ্টারে শহর ছেয়ে গেল। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। মাও সে-তুং-এর নাম নিয়ে লিউ শাও-চির দল ম্যাদাম মাওয়ের এই আন্দোলনকে ভিন্নমুখী করতে কম চেষ্টা করল না।

ম্যাদাম মাও সরাসরি সংঘর্ষের মধ্যে পড়ল য়ু হানের সঙ্গে। য়ু হান পিকিং-এর ডেপুটি মেয়র। য়ু হান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বাধা দিতে নানা ভাবে বিরোধিতা করতে থাকে। ম্যাদাম মাও য়ু হানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে নামল কিন্তু য়ু হান সমর্থন জানাল মেয়র পেং চেনকে।

যে সব লেখককে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপক্ষে লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিল তারা পেং চেনের ভয়ে লিখতে রাজি হল না। পিকিং-এ সাফল্য লাভ না করতে পেরে চিয়াং চিং (ম্যাদাম মাও) এল সাংঘাইতে। এখানে এসে স্বেচ্ছাসেবক পেল তার কাজে সাহায্য করতে। এই স্বেচ্ছাসেবক চ্যাং চুন চাও ও ইয়াও ওয়েন য়ুয়ান ব্যক্তিগত বিপদকে তুচ্ছ করে য়ু হানের লেখা নাটক সমূহের সমালোচনা গোপনে লিখে প্রচার করতেই পিকিং-এর মেয়র পেং চেন সেই লেখা থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ বাদ দিতে নির্দেশ দিল। এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ছিল চেয়ারম্যান মাও সে-তুং সম্বন্ধে য়ু হান যে সব বিরূপ মন্তব্য করেছিল তারই তীব্র সমালোচনা। চিয়াং চিং পেং চেনের এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল। পেং চেন এই প্রবন্ধ পিকিং-এ ছেপে প্রকাশ করতে দিতে গররাজি হল। অবশেষে এই প্রবন্ধ ছেপে বের করা হল সাংঘাই থেকে।

পেং চেন বুঝতে পারল ঘটনার গতি তার বিরুদ্ধে। পেং প্রচার করল ঐতিহাসিক ঘটনাকে লোকচক্ষে তুলে ধরলে তা মোটেই সমাজতন্ত্র বিরোধী হয় না। লিউ শাও-চির সমর্থনে এই প্রচার চলতে থাকে, এবং ম্যাদাম মাওয়ের কার্যপদ্ধতি যে পার্টি বিরোধী তাও বলতে কেউ ত্রুটি করল না। নাটককে সাহিত্য ও অভিনয়কে শিল্প মনে করা উচিত, এতে কোন রাজনীতি থাকতে পারে না, এই হল লিউ শাও-চি ও তার অনুগামীদের বক্তব্য।

য়ু হানের "Three Family Village" বইখানা মূলত গোপন ভাবে মাও সে-তুং-এর বিরুদ্ধে লেখা। আর এর সমর্থক ছিল পেং চেন। ইয়াওয়ের নামে এই বইয়ের কঠিন সমালোচনা বের হল। তাকে দমন করার কোন পথ না পেয়ে চেন প্রচার করল সমালোচনায় কিছু ত্রুটি আছে ঠিকই তবে ইয়াওয়ের সমালোচনা করার অধিকার নেই, সমালোচনা করতে পারে একমাত্র পার্টি।

সাংঘাই থেকে ইয়াওয়ের সমালোচনা বের হয়েছিল। তখন

সাংঘাইয়ের মেয়র ছিল কো চিন-মে। কো খুবই জনপ্রিয় ছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পর মেয়র হল চাও। তার হাতে এল সাংঘাই সরকারের দায়িত্ব। চাও পেং চেনের সমর্থক তথা লিউ শাও-চির অনুগত। চাও মেয়র হতেই তারা ইয়াওয়ের প্রবন্ধ নিয়ে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করল। তারা যতই লোককে বুঝাতে চেষ্টা করল যে ইয়াও অন্যায় করেছে ততই তাদের আসল রূপ দেখতে পেল জনসাধারণ। তারা ক্রমেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। এখানেই প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রথম ধাপে পা দিল।

রেডগার্ডরা বুঝতে পেরেছিল তাদের পার্টি কমিটির কোথায় যেন গলদ থেকে গেছে।

মাও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকল।

সভায় তর্কাতর্কি, অনেক উত্তপ্ত আলোচনা হল।

সভায় মাওয়ের সমর্থক ছিল লিন পিয়াও আর রেড ফ্ল্যাগ পত্রিকার সম্পাদক চেন পো-তা।

লিন পিয়াও বলল, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন সম্বন্ধে যারা দ্বিমত তারা তাদের সমর্থনে যুক্তি দিতে পারে, আমরা তার যথাযথ জবাব দেব।

চেন বলল, বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে চীনে তা যে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী তা তোমরা কি করে বিশ্বাস করছ তা বুঝিয়ে বল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে আছে পুরাতন জমিদার, বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়ার দল। তারা রাতারাতি ভোল পালটে সমাজতন্ত্রীর সাজ ধরেছে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা রয়ে গেছে পুরাতন চিন্তাধারা নিয়ে। তারা সুযোগ পেলেই সমাজতন্ত্রের ওপর বিষাক্ত ছোবল মারবে, তার লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র। আমাদের প্রেসিডেন্ট লিও শাও-চি স্বয়ং বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষকামী

অর্থাৎ ধনতন্ত্রের পথ ধরতে চাইছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্য নেই, কারখানায় শ্রেণী বিভাগ হয়েছে, সাহিত্য, শিল্প দিয়ে অতীতের সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের প্রশংসা করা হচ্ছে। এতে জনমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। তারা মনে করছে চিয়াং আমলে বহু শ্রেণী থাকলেও সমাজতন্ত্রেও শ্রেণী আছে, যারা চাষী মজুর পরিবার থেকে এসেছে তারা মধ্যশ্রেণীর সমকক্ষ নয়, মধ্যশ্রেণীর মত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারীও নয়। এই চিন্তাধারা এনেছে লিউ শাও-চি ও তার অনুচররা। এতে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হবে। তাই মানসিক পরিবর্তন, পরিবেশ পরিবর্তন করে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে আমরা শক্ত করতে চাই, তার জন্যই চীনের সর্বক্ষেত্রে সাংস্কৃতি বিপ্লব দরকার। আমাদের মহান চেয়ারম্যান মাও সে-তুং সম্বন্ধে নানা ভাবে গোপনে প্রচার চালানো হচ্ছে, ধনতন্ত্রের গুণগান করতে অনেকেই পঞ্চমুখ। এ অবস্থা আমরা মেনে নিতে রাজি নই।

চেন বাধা দিয়ে বলল, পার্টি যে পথে চলছে তা আমরা অভ্রান্ত মনে করি। যারা, বিশেষ করে যে সব ছাত্র বিদ্রোহ করেছে তাদের পূর্ব ইতিহাস দেখলে দেখতে পাবে তারা জন্মগতভাবে অসৎ, অথবা তারা কোন জমিদারের ঘরের ছেলে। এরা জন্মগত ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল। এরা নেতৃত্ব করছে তোমাদের এই বোগাস সাংস্কৃতিক বিপ্লবে। এর ফলে প্রতি-বিপ্লব দেখা দেবে, সমাজতন্ত্র বিপন্ন হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেডগার্ডদের বিরুদ্ধাচারণ করছে শ্রমিকরা, কারণ তারা জানে পার্টির নির্দেশ মান্য করাই তাদের কর্তব্য।

লিন পিয়াও বলল, তোমার যুক্তি আমরা স্বীকার করি না। শ্রমিকরা ক্রমেই আমাদের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমর্থন করছে, জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, আর যাদের জন্ম নিয়ে পরিহাস করছ তারা এই বিপ্লববিরোধী। তারা তোমাদের কাজ সমর্থন করবে, তারা এই বিপ্লবকে সমর্থন করলে তারা যে সুখ সুবিধা

ভোগ করছে তা হারাবে। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু নিশ্চয়ই বলতে হবে না। যারা চাষী মজুরের ছেলে তারা সমাজের অসাম্য দূর করতে এগিয়ে এসেছে। তারা সর্বহারা, তাদের এতকাল বঞ্চনা করা হয়েছে, আজ তারা বঞ্চনা সহ্য করবে না, বঞ্চককেও মার্জনা করবে না।

চেন সেদিন তার বক্তব্য রেখেও যুক্তিতে টিকতে পারল না। চেন অন্যভাবে বিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জনসমর্থন হারাতে বাধ্য হল।

লিন পিয়াও ছিল দেশরক্ষা মন্ত্রী।

দেশরক্ষা মন্ত্রী হলেও গণমুক্তি বাহিনীর ওপর তার প্রভাব খুব বেশি ছিল না। লিন পিয়াও সব ঘটনা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারল সেনা-বাহিনীতে রাজনৈতিক শিক্ষা দানের প্রয়োজন আছে। সেনাবাহিনীকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সেনার মত তারা হবে ভাড়াটিয়া পেশাদার সৈন্য। সেজন্য গণমুক্তি ফৌজে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও করল লিন পিয়াও।

যারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারণ করছিল তারা নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করছিল এই আন্দোলনকে দমন করতে। কারখানার শ্রমিকদের উচ্চহারে বোনাস দিল, বকেয়া পাওনা মেটাল, শিক্ষানবীশদের পুরো বেতন দিল। তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগল, রাজনীতি সম্বন্ধে তোমরা শক্ত হও, আর্থিক বিষয়ে সুবিধা দাও। এইভাবে ধাঁধা সৃষ্টি করল শ্রমিকদের মধ্যে। তারা গাড়ি ভাড়া দিয়ে মনোনীত শ্রমিকদের পিকিং পাঠাল। এরা পিকিং পৌঁছে এই বিনা মেহনতের টাকা দু হাতে ব্যয় করে প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা এমনভাবে বৃদ্ধি করল যাতে যারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে অসুবিধায় পড়বে তারা কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হল।

কারখানায় কারখানায় উৎপাদনও হ্রাস পেল। হ্রাস পাবার কারণ উভয় মতবাদের সংঘর্ষ। লিউ শাও-চির অনুগত পার্টির সদস্যরা যে

স্থিতাবস্থার সমর্থক মাও সে-তুং-এর সমর্থক জনসাধারণ তার বিরোধী। রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষে বসে লিউ শাও-চি সমস্ত অবস্থাকে আয়ত্বে আনার সব রকম চেষ্টা করলেও জনমানসে লিউ শাও-চি কোন রেখাপাত করতে পারেনি, প্রথমে যারা বিভ্রান্ত তারাও ভ্রম সংশোধন করে মাও সে-তুং-এর মতাবলম্বী হয়ে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করল।

সবাই বলতে থাকে, We must combat self interest and eradicate revisionism in our own minds—শোধনবাদকে আমাদের মন থেকে বিদূরিত করব।

সামগ্রিকভাবে মনের পরিবর্তন ঘটাতে পৃথিবীর খ্যাতনামা ধর্ম-প্রচারকরাও পারেননি। একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সব সময়ই দেখা গেছে দ্বন্দ্ব আর চীনের মত বিরাট দেশের বিরাট জনতার মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে দৃঢ় করা সম্ভব কি না তাও ভাবতে হয়েছে সবাইকে, এমন কি বিদেশের মানুষও ভেবেছে, অনেকে ব্যঙ্গও করেছে। মাও একটাকে সম্ভব করতে এগিয়েছে, কারণ জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে আদর্শের কোন সংঘাত নেই, এবং সংঘাত ঘটতে পারে না মনে করেই মাও চেয়েছে এই বিপ্লব।

সাতষট্টি সাল শেষ হবার আগেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব মোটামুটি সাফল্যের দিকে এগিয়ে গেল।

লিউ শাও-চি উৎপাদনে লভ্যাংশের হিসাব করেছে, মনুষ্য জীবনের প্রয়োজন মেটাবার মত কোন প্রেরণা থাকত না উৎপাদন ব্যবস্থায়। মাও বিশ্বাস করে শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হল সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার তিনটি বিপ্লবী আন্দোলন। আর এই আন্দোলন আমলাতন্ত্র, শোধনবাদ ও রক্ষণশীলতা বহির্ভূত হতে হবে, তা হলে সমাজতন্ত্র অজেয় হবে। এগুলোর অভাব হলে জমিদার শ্রেণী, বিত্তশালী চাষা, প্রতি-বিপ্লবী, সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় পাবে, তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্থান গড়ে নেবে। জনসাধারণ ও পার্টি সদস্যরা

সব সময় এদের সম্বন্ধে সজাগ না থাকলে মার্কস্‌বাদ—লেলিনবাদ ব্যর্থ হবে, তার জায়গায় জন্ম নেবে শোধনবাদ ও ফ্যাসীবাদ—সমগ্র দেশের চেহারা বদল হবে, সমাজতন্ত্রের নামে শোষণ ও শ্রেণীবৈষম্য চলতে থাকবে। আর এই শোষণ ও শ্রেণীবৈষম্যকে রুখতে হলে জনসাধারণকে বিশেষ করে উত্তরপুরুষকে শিক্ষিত করতে হবে সর্বহারার একনায়কত্বের বিপ্লবে। তারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রকে নিষ্কলুষিত রাখতে পারবে যাদের মনের পরিবর্তন ঘটে এবং যারা নিজের কাজ দিয়ে সেই পরিবর্তনকে প্রমাণ করতে পারবে। মাও গণমুক্তি ফৌজকে রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষিত করে এবং শ্রেণী চেতনা তাদের মধ্যে জাগ্রত করে শ্রেণীসংগ্রামকে জোরদার করে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে মাও সম্পূর্ণভাবে পার্টি সমর্থন পায় বলেই 'রেডগার্ড' গঠন করতে হয়েছিল। মাও বলেছিল, পার্টি শক্তি পরিচালনা করে ঠিকই কিন্তু শক্তি যেন পার্টিকে পরিচালিত না করে (The party Commands the gun ; the gun must not Command the party). কিন্তু কার্যকালে শক্তি যে পার্টিকে পরিচালনা করবে তা মাও নিজেও কখনও বুঝতে পারেনি।

মাও জানত বর্তমান যুগের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা শাসনব্যবস্থা, অতীত যুগের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা সব সময় শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, শোধনবাদ সমর্থন করেছে, কিন্তু সর্বহারার দল যখন বিদ্রোহ করেছে তখন তাকে নিন্দা করেছে, তা দমন করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু মাও বিশ্বাস করত, বিদ্রোহই একমাত্র সমর্থনযোগ্য (To rebel is justified)—রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থা দখল কর (Occupy yourself with State affairs),—কেন কোথা থেকে জানতে চেষ্টা কর, জনসাধারণকে বিশ্বাস কর, তাদের উপর নির্ভরশীল হও, তারা যে কাজে অগ্রসর হয় তাকে সম্মান কর (Trust the masses, rely on them and respect their initiative),—জনসাধারণ ধীরে ধীরে সত্যে পৌঁছবে, যদি কোন

ভুল তারা করে তা সংশোধন করতে হবে, ধীরে ধীরে জনসাধারণ একমত হয়ে কাজে অগ্রসর হবে।

স্টালিন চেয়েছিল পার্টির আমলাতন্ত্র দিয়ে দেশ শাসন করতে, স্টালিন তা পারেনি। যখন স্টালিন দেখল পার্টি তার মত অনুসারে চলছে না তখন গোপন পুলিশ (secret Police) সৃষ্টি করল, আর যাদের বিরোধী মনে করল তাদের উৎপীড়ন করতে কসুর করল না। কিন্তু মাও পার্টির আমলাতন্ত্রে বিশ্বাস করত না, মাও জনসাধারণের ওপর বেশি নির্ভর করত। পার্টির আমলাতন্ত্র যে ধনতন্ত্রের পথে পা দিচ্ছিল তা রোধ করা সম্ভব হতো না যদি মাও জনসাধারণের ওপর বেশি আস্থা না রাখত।

মাও কিছুকাল রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছিল। সে সময় চারিদিকে গুজব শোনা গিয়েছিল, মাও দেহত্যাগ করেছে, কেউ কেউ বলেছে মাও জীবিত থাকলেও তার কর্মক্ষমতা আর নেই, আবার কেউ কেউ বলেছে মাওকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাওয়ের মতামতের সঙ্গে পার্টির অনেকের অমিল থাকায় মাও তাদের হাতে দেশের ভাগ্য তুলে দিয়েছিল কিনা তা বলা শক্ত, অথবা তার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়াতেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে চলে গিয়েছিল কিনা তাও বলা কঠিন, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ হতেই মাও এল পুরোভাগে। বৃদ্ধের মনে ও দেহে যে কত ক্ষমতা তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মাও যে একটা মোহময় নাম তা বুঝতে পারেনি হয়ত তার পার্টির কমরেডরা। যখন বুঝতে পারল তখন ঘটনার গতি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মাও 'রেডগার্ড' বাহিনী গড়ে তুলেছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তার সর্বক্ষমতা নিয়োগ করেছে।

মাও কি জনমতের কণ্ঠরোধ করে তার সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সফল করেছিল?

এই প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে।

কারণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে 'রেডগার্ড' বহু লোকের ওপর অত্যাচার করেছে। কয়েক হাজার লোককে ভীষণভাবে মারপিট করেছে, অনেকে প্রহারের ফলে মারা গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই 'রেডগার্ডের' পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল গণমুক্তি ফৌজ, আর তার নেতৃত্ব ছিল লিন পিয়াওয়ের। তাই সন্দেহ রয়ে গেছে অনেকের মনেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা সন্ত্রাস কিনা? অত্যাচারের ভয়ে রাতারাতি অনেকেই সমাজতন্ত্রার লাল গামছা গলায় বেঁধে আত্মরক্ষা করেছে কিনা? সত্য সত্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের মনোজগতে পরিবর্তন এনেছে কিনা সে প্রশ্নের জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। হয়ত ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উৎপাদন হচ্ছে, সামাজিক যে বৈষম্য মাথাচাড়া দিচ্ছিল তা আর নেই ;- ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক এই পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করেছে।

মাওয়ের সৈন্যবাহিনী (Liberation Army) গঠিত হয়েছিল গ্রাম্য চাষীদের নিয়ে। বিপ্লবের যুগে শহুরে মানুষ মোটেই এগিয়ে আসেনি বিপ্লবকে সাহায্য করতে (The urban workers did not lift a finger on behalf of the Communist Victory of 1949) তারা অপেক্ষা করেছে বিপ্লবের ফল লাভ করতে। সাধারণত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একটা অংশ যেমন অপেক্ষা করে আন্দোলনকারী প্রগতিশীল শক্তির সাফল্যের ফল ভোগ করতে, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু মুক্তিলাভের পর শহরে সর্বহারারা এল দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। এর ফলেই সামাজিক বৈষম্য দেখা দিল চীনের শাসন ব্যবস্থায় ও সমাজ জীবনে। প্রত্যেক দেশেই মজুর শ্রেণীর আন্দোলনের পেছনে থাকে একটা সুবিধা লাভের গোপন ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তারা আন্দোলনে আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু যদি কোন ফললাভ হয় তার অংশ গ্রহণ করে। শিল্প শ্রমিকদের এই সুবিধাবাদ ও তুষ্টি বিপ্লবী শক্তিকে নষ্ট করে কিন্তু চাষী শ্রেণীর সর্বহারাদের মধ্যে সুবিধাবাদ ও তুষ্টি এভাবে আসে না, সেজন্য তাদের বিপ্লব প্রচেষ্টা

সাফল্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যারা চাষীর আন্দোলন করে বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করতে চায় তারাই সঠিক পথে চলে।

মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সেই জন্য কৃষক শ্রেণীর বেশি সমর্থন লাভ করেছে, শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনে কিছুটা অর্থনৈতিক কারণও আছে।

ঘটনার প্রবাহ যে পথ ধরে চলে সেই পথের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

মাও সেই শিক্ষাই নিয়েছিল ঘটনার কাছ থেকে। সোভিয়েতের শোধনবাদী ভূমিকায় মাও শঙ্কিত হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতে চীনের ক্ষমতা যদি কোন শোধনবাদীর হস্তগত হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে।

সাতান্ন সালে মাও মসকো গিয়েছিল অকটোবর বিপ্লবের বার্ষিক সভায়।

মাও যখন বিমান বন্দরে এসে নামল তখন ক্রুশ্চেভ, ভরোশিলভ ও বুলগানিন তাকে অভ্যর্থনা জানাল। সোভিয়েতের সাধারণ মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বিমান বন্দরে অভ্যর্থনার উত্তরে মাও সোভিয়েতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। মাও চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চিরস্থায়ী হওয়ার স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছিল।

মাও মনে করত সমাজতন্ত্রী দুনিয়ার শীর্ষস্থান হল সোভিয়েত রাশিয়ায়। আর পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখতে আর নিপীড়িত মানুষের বন্ধু রূপে সোভিয়েতের অবদান সর্বাধিক। মাও বিশ্বাস ভরে বলেছিল, পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারে - তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

মাওয়ের এই বিশ্বাস পাঁচ বছরের মধ্যেই বদল হয়ে গেল।

সোভিয়েতে শোধনবাদের অনুপ্রবেশ দেখে মাও চিন্তিত। নেতাদের

বিরুদ্ধেই তার অভিযোগ। মাও বিশ্বাস করে রাশিয়ার জনসাধারণ চিরবিপ্লবী এবং শোধনবাদ বেশিদিন স্থায়ী হবে না সেখানে (Revisionist Rull will not last long)।

মাও একটি নাম। অর্ধ শতাব্দী ধরে চীনকে মুক্ত করে আধুনিক চিন্তাধারায় দীক্ষিত করে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ঘটতে এবং চীনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে মাও যা করেছে তা অবিস্মরণীয়। মাওয়ের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার অক্লান্ত অবদান। যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মাওকে বিচার করা হোক, মাও বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা, প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই।

মাওয়ের দেশে 'মাও' নাম যাদুকরের মত মোহ সৃষ্টি করে। তার কর্মক্ষমতা ও তার নাম যদি সর্বজন প্রশংসিত না হতো তা হলে লিউ শাও-চির Capitalist road-এর নীতি চীনের সর্বনাশ ঘটাত, এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না।

পিকিং থেকে অনেক দূরে ইয়াংসি নদীর উজানে একটি ছোট গ্রামে একদিন সকাল বেলায় দেখা গেল দলবদ্ধ মানুষরা ছুটছে মন্দিরের দিকে। সেখানে খুব বড় উৎসব। বাদ্যভাণ্ড সহকারে অগ্রসর হচ্ছে একটি যুবক তার সঙ্গে একটি যুবতী, তাদের পেছনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ভীড় করে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ চেন লির বিয়ে চিয়াং সে-মিনের সঙ্গে।

চেন যৌথ খামারের চাষী আর সে-মিন পাঠশালার শিক্ষয়িত্রী।

বিয়ের আগে তাদের পরিচয় ছিল যথেষ্ট ঘনিষ্ট।

সে-মিনের মুখের কথায় জানা যায় সে ছিল এক দাসীর কন্যা। তার বাবা ছিল চিয়াং বাহিনীর সৈন্য। কোথায় যে তার মৃত্যু ঘটেছিল তা জানত না কেউ-ই। অনেক দলিল দস্তাবেজ খুঁজেও তার হদিস

পাওয়া যায়নি। ছেচল্লিশ সালের পর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তার বাবার। মায়ের কোলে সে-মিন তখন তিন বছরের শিশু। আগে সরকার থেকে মাসিক বরাদ্দ আসত, কোন রকমে দিন কাটত তাদের। বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ পেয়েছিল সেই সঙ্গে মাসিক বরাদ্দও বন্ধ হয়েছিল।

সে-মিনের মা অকূল পাথারে ভাসল। ভাসতে ভাসতে নানকিং-এ এসে হাজির হল। কারখানার মালিক সু-চে-আনের বাড়িতে কাজ পেল দাসীর। সারাদিন খাটুনির পর মেয়েটাকে পাশে নিয়ে সিঁড়ির তলায় শুয়ে রাত কাটাত।

সে-মিনের তখন ছয় বছর বয়স।

ছেড়া ফ্রক পড়ে রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়ানো ছিল তার বাল্য-জীবন। হঠাৎ কামান বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠল শহরের সবাই। মালিক সু তখন বাকস প্যাঁটরা গোছাতে আরম্ভ করেছে। কোথায় যেন যাবার উদ্যোগ করছে সপরিবারে।

সে-মিনের মায়ের কেমন সন্দেহ হল।

খবর নিয়ে জানল তার মনিব দু'এক দিনের মধ্যেই তাইওয়ানে চলে যাবে তার পরিবার নিয়ে। কম্যুনিষ্টরা শীগ্‌গীরই শহর দখল করতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রস্তুতি চলছে চারিদিকে।

সু তার ঝি-চাকরদের ডেকে ছুটি দিল। সবার হাতে একশ' ডলারের নোট দিয়ে বলল, শহরে থাকা নিরাপদ নয়, তোমরা গ্রামে চলে যাও। এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হতে পারে। শহর হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

ঝি-চাকরের দল টাকা হাতে পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটল।

সু-ও সুযোগ মত বিমানে চেপে পাড়ি জমাল তাইওয়ানে।

শহর প্রায় খালি হয়ে গেল। যাদের কোন উপায় নেই কোথাও স্থান পাওয়ার তারাই রয়ে গেল শহরে। এমন সময় কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা

এসে শহর দখল করল। চিয়াং সরকারের শেষ চিহ্নও তখন আর নেই। পাখি পালিয়ে গেছে।

শহরের দায়িত্ব যারা নিল তারা সবার আগে শহরের গরীব মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করল, তারপরই তাদের আশ্রয় দিল ধনীর পরিত্যক্ত গৃহে।

সে-মিন এতকাল সিঁড়ির তলায় ঘুমিয়েছে, অপরের রন্ধনশালার উচ্ছিষ্ট খেয়েছে। হঠাৎ একটা প্রাসাদের গোটা একখানা ঘর পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তার মনে তখনও ভয়, হয়তো এই আশ্রয় থেকে শীগ্‌গীরই তাদের তাড়িয়ে দেবে।

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল যখন একগাদা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে গেল লালফৌজের লোকেরা। রন্ধনশালার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না, নিজেকেই রন্ধন করতে হবে। এও কি সম্ভব। তামাসা করছে বুঝি ঐ সব লোকেরা। বিশ্বাস করতে না পারলেও সত্যি সত্যি ঘটনাগুলো ঘটছিল।

অবশেষে একদিন সে-মিনকে তার মায়ের কোল থেকে টেনে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল স্কুলে, তার মাকে পাঠান হল যৌথ খামারে কাজ করতে। সে-মিন ছুটির দিনে ছুটে যেত মায়ের কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখত তার মা বন্দুক পিঠে বেঁধে মাঠের কাজ করছে।

বন্দুক কেন তোমার পিঠে বাঁধা? জানতে চাইল সে-মিন।

তার মা বলল, আমরা চাষী। চাষীর অনেক শত্রু। তাই বন্দুক নিয়ে কাজে হাত দিতে হয় সবাইকে, আমরা চাষী ও সৈনিক।

সে সময় বুঝতে পারত না সে-মিন। তবে যতই বড় হতে থাকে ততই স্পষ্ট হতে থাকে চাষী ও সৈনিকের যুগ্ম জীবন।

স্কুলের পড়া শেষ করেই সে-মিনকে নামতে হল কর্ম জীবনে। তার অভিরুচি মতই সে বেছে নিয়েছিল শিক্ষকতা জীবন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে সে পেয়েছিল অপার আনন্দ।

সাংঘাইতে কলেজে পড়ার সময় পরিচয় হয়েছিল চু লি-সানের সঙ্গে। চু'র বাবা ছিল বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক। একই সঙ্গে কলেজে পড়ত দু'জনে।

পরিচয় প্রণয়ের রূপ নিয়েছিল সহজেই। সে-মিন কল্পনার সৌধ তৈরী করেছিল ভাবী জীবন নিয়ে। আরও পাঁচ জনের মত সেও সংসার পাবার আকাঙ্খায় মেতে উঠেছিল। চু যে তাকে জীবন সঙ্গিনী করে নিতে অনিচ্ছুক এমন নয় কিন্তু চু যখন জানতে পারল সে-মিন একজন দাসীর মেয়ে তখন তার আভিজাত্যবোধ প্রণয়ের মাধুর্যকে করে ফেলল আচ্ছন্ন এবং সরাসরি সে-মিনকে জানিয়ে দিল তাকে বিয়ে করার অক্ষমতা।

সে-মিন প্রতিবাদ করেনি।

কলেজ জীবন শেষ করে নীরবে ফিরে এল কর্ম জীবনে। চাকরি নিয়ে সাংঘাই থেকে বহু দূরে চলে গেল। চু-এর কথা ভুলে গেল, ভুলে গেল তার সেই প্রণয়-মধুর দিনগুলোর স্মৃতি। তারপর একদিন পরিচয় হল চেনের সঙ্গে। চেন তার স্কুলের সম্মুখ দিয়ে বাঁকে মাল বোঝাই দিয়ে যেত পাহাড়ী গ্রামে তরিতরকারী বিক্রি করতে। তার বাড়িতেও আসত মাঝে মাঝে তরকারী বিক্রি করতে।

সে-মিন জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি বাঁকে করে পাহাড়ে তরকারী নিয়ে যাও কেন? সোজা শহরে গেলেই তো বেশি লাভ হয়।

চেন প্রথম প্রথম হাসত, কোন উত্তর দিত না। অবশেষে একদিন বলল, আমার কাজ সমাজকে সেবা করা।

বিস্মিত ভাবে সে-মিন বলল, এ আবার কেমন সমাজ সেবা!

এও সমাজ সেবা। পাহাড়ী গ্রামের মেয়ে পুরুষরা যখন জমিতে কাজে যায় তখন তাদের বাজার করার সময় থাকে না, বাজারে যেতে হলে একটা দিনই নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে জিনিসও কিনতে হয় বেশি মূল্য দিয়ে। সে মূল্য দেবার সামর্থ্যও অনেকের নেই, তৃতীয়ত ওরা টাটকা সবজীও পায় না শহরে। সেজন্য আমরা

তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেই টাটকা সবজী কম দামে আর তারা পায় কাজ করার সময়। শহরে গিয়ে তাদের সময় নষ্ট করতে হয় না। আমরা তো লাভের জন্য এই ভাবে তরকারী ফিরি করে বেড়াই না, আমরা তরকারী ফিরি করি সমাজ সেবার জন্য।

সে-মিন সমাজ সেবার এই নতুন ধরন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

সে-মিন ভাবত, তাই তো, আর্থিক লাভ ভিন্ন মানুষ এভাবে কাজ করতে পারে কেমন করে!

চেনকে জিজ্ঞেস করল আরেক দিন, এই সমাজ সেবা করতে কে শেখাল তোমাকে?

আমাকে নয় ম্যাদাম, দেশের সবাই এই ভাবে সমাজ সেবা করতে শিখেছে। আমাদের শিখিয়েছে আমাদের মহান নেতা মাও সে-তুং। আমরা যদি উৎপাদন বেশি করতে পারি তা হলে আমরা অল্প মূল্যে বেশি মালের জোগান দিতে পারব, অল্প লাভ হলেও তার পরিমাণ বর্তমানের চেয়েও বেশি হবে। মালের ঘাটতি ঘটিয়ে বেশি মূল্যে মাল বিক্রি করলে লাভ বেশি হতে পারে কিন্তু সমাজ জীবনের চাহিদা তাতে মেটেনা, ফলে দুর্নীতি দেখা দেবে, একজন আরেকজনকে বঞ্চনা করে বেশি ভোগ করতে চাইবে তার যদি অর্থ বেশি থাকে। তা হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে কি করে!

সে-মিনের মনে পড়ল তার পাঠ্য জীবনের কথা। কলেজে পড়ার সময় পার্থক্যবোধ সে নিজেই লক্ষ্য করেছে। সমাজ জীবনে যে পাঁক জমা হয়েছিল তা থেকে মুক্তির পথ তখন খুঁজছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। একদল ছিল পার্থক্যের বিরুদ্ধে, আরেক দল পার্থক্য বজায় রেখেই অগ্রসর হতে চাইছিল। তারপর তাকে কলেজ জীবন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, ঘটনার পরিণতি দেখে সে আসতে পারেনি। কিন্তু নিজের জীবনের পরিণতি সে ভাল করে উপলব্ধি করেছে চু-র প্রত্যাখ্যানে। সে-মিন ভুলেই গিয়েছিল তার অতীত। চেনের সমাজ সেবার উদ্দেশ্য জানতে পেরে তীক্ষ্ণভাবে তার মনে আঘাত করল চু'র

প্রত্যাখ্যানে। যারা অভিজাত তাদের ভোগের অধিকার বেশি, তারা নিশ্চয়ই মনে করে যারা চাষী মজুর শ্রেণীর তাদের চেয়ে অভিজাতরা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য শ্রেণী।

সে-মিন চেনকে মাঝে মাঝেই এইসব জিজ্ঞেস করত। অবশ্য এ নিয়ে তাকে বিশেষ ভাবতে হয়নি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড় উঠেছিল ইতিমধ্যে। বছর না ঘুরতেই দেখা গেল চীনের নতুন চেহারা। মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে মাও সে-তুং-এর এই বিরাট সাফল্য তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। সাংঘাই গিয়েছিল নিজের কাজে, সেখানে দেখা হয়েছিল চু'র সঙ্গে। চু তখন কোন দোকানের সেলসম্যান। দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে তার সহকর্মী চাষী মজুরের সন্তানদের সঙ্গে কাজ করছে। সে-মিনকে দেখে চু এগিয়ে এসে পুরাতন পরিচয় নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল।

তারপর আজকাল কি করছ সে-মিন?

শিক্ষকতা। তুমি তো দেখছি সেলসম্যান হয়েছ। শুনেছিলাম তুমি এখানে একজন অফিসার ছিলে।

করুণ হাসি হেসে চু বলল, দুটোই সত্যি। আমাকে ওরা সমাজতন্ত্র বিরোধী মনে করে এই ভাবে টেনে নামিয়েছে। মুড়ি-মিছরির একই দর এই রাজত্বে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল চু।

তুমি খুশী হতে পারনি।

কেউ হতে পারেনা। জোর করে যদি মাথার টুপি দিয়ে পায়ের জুতো তৈরী করা হয়, সে জুতো কি আরামে পায়ে দেওয়া যায়। যার যেখানে স্থান তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত।

সে-মিন কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিল।

চু ডাকাল তাকে।

একটা কথা বলব মনে করেছি।

সে-মিন হেসে বলল, বল।

তুমি কি বিয়ে করেছ?

এ প্রশ্ন কেন?

ভাবছিলাম।

ভাবছিলে আমাকে দয়া দেখিয়ে নাম কিনবে। কিন্তু আমি সেই দাসীর মেয়ে, সেদিনও যা ছিলাম আজও তাই আছি। আমার প্রতি দয়া তোমার আভিজাত্যে আঘাত করবে। ও পরিকল্পনা বাদ দাও।

চু মাথা নীচু করে রইল, সে-মিন ধীরে ধীরে পথ ধরল।

পরিবর্তন এসেছে, সেই পরিবর্তনের জোয়ারে অনেক নোংরা ভেসে চলে গেছে। সে-মিন সব লক্ষ্য করেছে, তার অতীত ও বর্তমানকে বিশ্লেষণ করেছে। তারপর একদিন চেনকে পাশে বসিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছে হয়।

চেন হেসে বলল, তামাসা করছ ম্যাদাম। আমি হলাম দিন মজুর। এর আগে মিং টোম্ব ড্যামে কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোকের দঙ্গলে পাথর কেটেছি, ড্যাম তৈরী করতে উদয়াস্ত মেহনত করেছি, জলকে আয়ত্বে এনে শুকনো মাটিকে সরস করেছি। আমি যে দেশের একজন তার বেশি তো শিখিনি, তুমি কি পারবে মাঠে হাল বইতে, মাটি কাটতে!

আমার মা তাই করত, এখনও সে জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

তুমি তা পারবে কেন।

তুমি ভয় দেখাচ্ছ চেন। আমি ভয় পাই না। সমাজকে সেবা করতেই তো আমাদের জন্ম।

তোমার যোগ্যতা অনুসারে তুমিও তো সমাজকে সেবা করছ।

আরও আরও বেশি কিছু করতে চাই চেন। আমার সহকর্মী ছিল ওলান। সে গেছে পুনর্বাসন কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চীনের অত্যাচারিত অবনমিত মেয়েদের নতুন জীবনের সন্ধান দিতে।

তুমিও তো শিশুদের বড় করার দায়িত্ব পেয়েছ, এটা কি কম কথা। মাও সে-তুং আমাদের শিখিয়েছে ক্রীতদাস সুলভ মনোভাব নিয়ে

প্রশাসনকে মেনে চলা অন্যায়, এমন কি পার্টি যদি ভুল নির্দেশ দেয় তারও প্রতিবাদ করা উচিত। নেতার যেমন অধিকার আছে পার্টিতে তেমনি সদস্যদেরও অধিকার আছে, আর অধিকার আছে সমালোচনা করার। যদি তা না থাকে তা হলে পার্টিতে ফ্যাসীবাদের সৃষ্টি হবে, গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটবে। এমত অবস্থায় আমি যে কাজের যোগ্য সেই কাজই আমাকে দেওয়া হয়েছে, তোমার যোগ্য কাজ তোমাকে দেওয়া হয়েছে, এর বেশি সেবা করার ক্ষমতা আমাদের হয়ত নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনার যে প্রকল্প তাকে রূপদান করাই তো তোমার পক্ষে বড় সমাজসেবা।

সে-মিন খুশী হল চেনের যুক্তিতে।

প্রতিদিন সকালে ফেরী করতে যাবার আগে সে-মিনের সঙ্গে দেখা করে যায় চেন। আবার ফিরবার পথে সে-মিনের দাওয়াতে বসে মাথার টুপি খুলে পাখার মত করে বাতাস করে নিজের দেহ শীতল করতে।

সে-মিনের সঙ্গে পরিচয় ক্রমেই ঘনিষ্ট হতে থাকে।

সেই সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিল সে-মিনের। সেই পুরাতন মনটা মাথা নীচু করেছিল এতকাল। হঠাৎ তার মনে হল 'আমি শিক্ষিতা ও শিক্ষয়িত্রী' আর চেন, 'সামান্য শিক্ষিত ও ফেরীওলা'— সমাজে আমাদের দুজনের জন্য দু রকম স্থান নির্দিষ্ট। আমরা কি যুগ্ম জীবন যাপন করতে পারি? পুরাতন মনটা বলল, করা উচিত নয় কিন্তু বর্তমান ধারায় সে-মিন খুঁজে পেল না এমন কোন ত্রুটি যা দিয়ে চেনের অযোগ্যতা স্থির করা যায়। সহকর্মিনীদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করার সাহস পায়নি, তবুও তাদের পারিবারিক জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, মনে হয়েছে ওদের জীবন খুবই সুখের। স্বামীরা যোগ্যতার মাপকাঠিতে কত বড় তা না জানা থাকলেও, তারা মানিয়ে নিয়েছে জীবনের সঙ্গে।

সে-মিন মনে মনে অঙ্ক কষে স্থির করল, মানিয়ে নেওয়াটাই

হল জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ। পারিবারিক জীবনে প্রয়োজন বুঝা-পড়া। তার কোন ত্রুটি যাতে না হয় তার জন্য সঙ্গী খুঁজে নেওয়াই হল সব চেয়ে মূল্যবান নীতি।

সে-মিন মন ঠিক করে ফেলল।

চেনও চেয়েছিল সে-মিনকে আপন করে নিতে কিন্তু তার মনেও ছিল পুরাতনের প্রভাব। কোনমতেই সে ভাবতে পারছিল না সে-মিন তাকে যোগ্য মনে করতে পারে। যতই সমাজ সেবার ধর্ম-পালন করুক আসলে চেন তো একজন ফেরীওলা আর সে-মিন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তবুও যখন সে-মিনের আলাপ আলোচনা শুনেছে, আচার আচরণ দেখেছে তখন তার মনেও হয়নি কোন পার্থক্য আছে সে-মিনের সঙ্গে। একদিন সে-ও মনস্থির করে ফেলল। সে-মিনকে মনের কথা বলতে প্রস্তুত হল।

একই দিনে দুজনে মনের গোপন অভিলাষ জানিয়ে দিল পরস্পরকে।

রাগ, অনুরাগ ও বীতরাগ সব শেষ হয়ে একদিন দুজনে রেজিষ্ট্রারের কাছে গিয়ে নাম লিখিয়ে এল বিবাহের খাতায়।

তারপরই উৎসব।

উৎসব মূলত বিবাহের জন্য নয়। মানুষের মনোবৃত্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর তাকে সম্মান দেখাতে গ্রামের মানুষ উৎসবে যোগ দিয়েছে, ফেরিওলার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর বিয়ে চীনের ইতিহাসে নতুনত্ব এনে দিয়েছে, তাই সবাই উৎসাহভরে উৎসবে এসেছে।

শিশুদের বিদ্যালয়ে মাওয়ের ছবি টাঙ্গানো। দুপাশে দুটো চীনের জাতীয় পতাকা। শিক্ষক শিক্ষিকারা শিশুদের মাওয়ের গল্প বলে। রূপকথার কাহিনীর মত শিশুরা শোনে। তাদের কল্পনায় মাও যে

একজন বিরাট পুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাওয়ের 'লাল কেতাব' থেকে তাদের পড়ে শোনান হয়। পড়ুয়াদের সবাই চাষী মজুর শ্রেণী থেকেই এসেছে। এদের পিতৃপুরুষদের কেউ কখনও বিদ্যালয়ে আসেনি, শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষাও তাদের মধ্যে কেউ কখনও সৃষ্টি করার চেষ্টাও করেনি, অথচ বাধ্যতামূলক ভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের আসতে হয়। তাদের পরণে আর তাদের পিতৃপুরুষদের মত ছিন্ন নোংরা পোষাক নেই, বেশ ফিটফাট সেজেগুজে তারা স্কুলে আসে। আগের মত পণ্ডিতমশায়ের দিকে পেছন ফিরে ধর্মস্তোত্র পাঠ করতে হয় না। শিশুরা বৃদ্ধি পাচ্ছে খেলাধূলার মাধ্যমে, শিক্ষার ধারা বদল হয়েছে। শিক্ষককে সম্মান করে, পাঠ গ্রহণ করে আর দেহটাকেও মজবুত করতে চেষ্টা করে। এইভাবেই ওরা এগিয়ে চলেছে পাঠ্য জীবনে।

হঠাৎ একদিন পাঠশালার সামনে এসে দাঁড়াল একখানা গাড়ি। গাড়ি থেকে সাদা কামিজ আর পাতলুন পড়া সবলদেহী এক বৃদ্ধ নামল। সঙ্গীরা গাড়ি থেকে নেমে একপাশে দাঁড়াতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটে এল এই অতিথি কে জানার জন্য।

শিক্ষক-শিক্ষিকা অবাক হয়ে দেখছিল অতিথিকে। খুবই চেনা অথচ চিনতে পারছে না। অতিথি গাড়ি থেকে নেমে শিক্ষক-শিক্ষিকার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে দিল অভ্যর্থনা জানাতে।

একজন ফিস ফিস করে বলল, চিনেছি।

কে ?

চেয়ারম্যান মাও সে-তুং।

বিস্ময় সবার চোখে। সাহস করে হাত বাড়িয়ে মাওকে অভ্যর্থনা জানাল। ভেবে পেল না মাও এভাবে কেন বিদ্যালয়ে এল।

কি ভাবছ তোমরা ? হেসে বলল মাও।

তুমি আমাদের এখানে আসবে তাতো ভাবতেও পারছি না মহান চেয়ারম্যান মাও।—বলল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

মাও হাসতে হাসতে বলল, সব সময়ই আমার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু সময় পাই না। বিরাট দেশের হাজার হাজার বিদ্যালয়ের শিশুকে কোলে তুলে নেবার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু তাতো সম্ভব হয় না। এই পথে যেতে যেতে তোমাদের স্কুল দেখে নেমে পড়লাম। এক গ্লাস জল দিতে পার?

ঠেলাঠেলি করতে করতে দু তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা গেল জল আনতে।

মাও ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে ঢুকে শিশুদের পাশে বসে তাদের নামধাম জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেছে। শিশুরা তাকে বিদ্যালয় পরিদর্শক মনে করে দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে মাও সোহাগভরা কণ্ঠে বলল, তোমাদের মাষ্টারমশাইরা তোমাদের খুব ভালবাসেন?

একটা মেয়ে মাথা কাত করে বলল, খু-ব।

তাদের কাছে গিয়ে তোমরা কথা বল নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ।

তা হলে আমার কাছে আসছ না কেন? ভয় কিসের। চীনের ছেলেমেয়েরা ভয় পায় না। তাদের মনে জোর থাকে, তারা সব কাজ করতে পারে। ভাল কাজের জন্য তারা প্রাণ দেয়। তা জানো?

শিশুরা মাওয়ের সব কথা বুঝতে না পারলেও তারা বুঝল এই ব্যক্তিটিকে ভয় পাবার মত কিছু নেই।

মাও একটা ছোট্ট ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, আজ কি খেয়েছ?

ভাত।

শুধু ভাত?

ভাত তরকারী।

মাও তার সঙ্গীকে বলল টফির বাক্স আনতে। ছেলেমেয়েদের

হাতে একটা করে টকি দিতে দিতে প্রধান শিক্ষিকাকে বলল, এদের চীনা তৈরী করবে, কেমন?

মাও উঠে পড়ল।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাত বাড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ধ্বনি দিল, চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ।

শিশুরা সঙ্গে সঙ্গে বলল, জিন্দাবাদ।

মাও ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, মাও চিরকাল বাঁচবে না। তাকে 'জিন্দাবাদ' জানিয়ে লাভ হবে না বন্ধু। বরং চীনের সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি জিন্দাবাদ বললে বেশি খুশী হব।

বলা শেষ করেই মাও গাড়িতে উঠে বসল। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে গেল।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গাড়ির দিকে। যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল ততক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে ছিল আঙ্গিনায়। মাও যে তাদের এই বিদ্যালয়ে আসতে পারে তা তখনও তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না, অথচ তা সত্যি।

শিক্ষিকা সুই বলল, চেয়ারম্যান শুধু রাজনীতি করে না। তার দরদও রয়েছে।

প্রধান শিক্ষিকা বলল, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, মাও শিশুদের ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে। আমরা বুঝতে পারিনি কত স্নেহপ্রবণ মাও। আজ প্রত্যক্ষ করলাম তার আসল চেহারা।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে মাওকে দেখা গেল পিকিং-এর রাস্তায় ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাত্ররা দেওয়ালে পোষ্টার সাঁটছে, মাও দেখছে তাদের কাজ। পথ চলতি মানুষ মাওকে দেখে ভীড় করল। সবাই মাওয়ের নাম শুনেছে। মুক্তিফৌজের সদস্যরা মাওকে আপন করে পেয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। আহত সৈনিক

যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, মাও দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সান্ত্বনা দিয়েছে, সেবার নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে শুকনো রুটি চিবিয়ে দিন কাটিয়েছে।

কামানের গোলা ছুটছে, আহতের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, মাও নিবিষ্ট মনে শিবিরে বসে কবিতা লিখছে। হয়ত সেই সময় সংবাদ এল কোন গুরুতর পরাজয়ের। মাও তুলি ফেলে বন্দুক হাতে তুলে ছুটল শত্রু নিধনে। আবার কোন সময় বসে বসে মাও লিখছে রাজনীতির ভাষ্য। মার্কসীয় দর্শনকে কি ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করছে। ক্লান্তি নেই কোন কাজে।

কাপড়ের কলে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, খবর পেল মাও। চিন্তার রেখা দেখা দিল তার কপালে। রাজনীতি ও কাব্যের জগৎ থেকে অর্থনীতির জগতে আছড়ে পড়তে হল মাওকে, মাও চিন্তিত কিন্তু অবিচল। জাপান যখন অবরোধ করেছিল কম্যুনিষ্ট শাসিত উত্তর সীমান্ত অঞ্চল সেদিনও মাও চিন্তা করেছে এই অবরোধ ভাঙ্গার কথা এবং তার সঙ্গে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করেছে। বছর না ঘুরতেই স্বাবলম্বী করে তুলেছে নিজের এলাকা। জাপানের অবরোধ ভাঙ্গতে আর অসুবিধা হয়নি। মুক্তির পর উৎপাদন হ্রাস কেন পেল তার খোঁজ করতে গিয়ে মাও আবিষ্কার করল, লাভের দিকে নজর দিয়ে উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়েছে কাপড় কলের পরিচালকরা। মাও বলল, লাভ নয়, প্রয়োজন। প্রয়োজন মেটাও, লাভ চাইনা। অর্থনীতির এই ফর্মুলাতে সাফল্য এল, পরিচালক বদল করে নতুন প্রেরণা এনে দিল শ্রমিকদের মাঝে।

ভরা দুপুরে মাও আর ঝু-চেন বেরিয়েছে সাংঘাইয়ের শ্রমিক এলাকায়। সঙ্গী সাথী নেই।

মাও কি চায়?

মাও দেখতে চায় সত্যিকার সমাজতন্ত্র তার পথ করে নিতে পেরেছে কিনা। গাড়ি দূরে রেখে পায়ে হেঁটে দুজনে চলেছে। শ্রমিক বস্তিতে

তখন লোকজন নেই বললেই হয়। মেয়ে-পুরুষ সবাই গেছে কারখানায় কাজ করতে। শিশুরা গেছে বিদ্যালয়ে, শুধু দুগ্ধপোষ্যদের নিয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। দুজনে প্রবেশ করল শ্রমিক আ-উনের ঘরে। আ-উনের বৃদ্ধা মা চোখে কম দেখে। তার সামনে কম্বলের ওপর শুয়ে আছে আ-উনের ছয় মাসের শিশু। আ-উন আর তার স্ত্রী গেছে কারখানায়।

মাও জিজ্ঞেস করল, বুড়িমা কেমন আছ?

বৃদ্ধা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল। ঝাপসা দেখল মাওয়ের চেহারা। চিনতে পারল না তাকে। প্রশ্নের উত্তরে বলল, ভালই আছি।

তোমার ছেলে যত্ন করে তো তোমাকে?

বৃদ্ধা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মাও বুঝল কোথায় যেন একটা কাঁটা ফুটে আছে। প্রশ্ন করবার আগেই বৃদ্ধা বলল, কোথা থেকে আসছ বাবা?

মাও বলল, শহরের লোক আমরা। তোমাদের খবর করতে এসেছি। তোমরা ভাল আছ কিনা জানতে এসেছি। তোমাকে পেনশন দেয় কি সরকার?

তাতো জানি না বাবা। ছেলে জানে।

মাও আর দেরী করেনি সেখানে। সস্ত্রীক আবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে তখন।

পিতা মাতার দায়িত্ব বহন করা সন্তানের কর্তব্য, বলল মাও।

ম্যাদাম মাও বলল, বৃদ্ধ বয়সে যখন কাজের ক্ষমতা থাকবে না তখন তাদের এ দায়িত্ব নেওয়া নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু নীতিবোধ অনেকেরই নেই। এটা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

মাও ফিরে গিয়ে পার্টি মিটিং-এ উত্থাপন করল তার বক্তব্য।

পারিবারিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করল পার্টি ও সরকার।

জনতার সঙ্গে মাওয়ের পরিচয় কাগজে কলমে নয়, বক্তৃতার মঞ্চে নয়; মাওয়ের ব্যক্তিগত পরিচয় জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াতে। কর্মজীবনে মাও যেমন জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পারিবারিক জীবনে তেমনি সন্তান স্ত্রী ও স্বজনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তাদের সব কিছুর ওপরই তার ব্যক্তিত্বের ছাপ যেমন রেখেছে তেমনি রেখেছে স্নেহের পরশ।

কাই-হুইকে হারিয়ে মাও আত্মহারা হয়নি কিন্তু কাই-হুইয়ের প্রতি তার ভালবাসা যে কত গভীর তার প্রমাণ রয়েছে তার ব্যথাভরা কবিতার প্রতিটি ছত্রে। ঝু-চেন তার পাঁচটি সন্তানের মা, কিন্তু কতটা প্রভাব ছিল ঝু-চেনের তার স্বামীর ওপর সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ঝু-চেনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদটা নেহাত রুটিন মাফিক কিছু নয়, বরং এটা তাকে কোন মানসিক পীড়ন থেকে রক্ষা করেছিল বলেই মনে হয়।

চিয়াং-চেনকে মাও প্রাণভরে ভালবাসে তার প্রমাণ আজও বর্তমান। চিয়াং-চেন কিন্তু তার রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ অংশীদারত্বের দাবী করতে পারেনি। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুয়েকার্ণোকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় চিয়াং-চেনকে মাওয়ের পাশে দেখা গেছে। অবশ্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনায় ম্যাদাম মাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে সাহিত্য ও শিল্পকে পাপমুক্ত করতে ম্যাদাম মাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে মাও প্রেমিক স্বামী, স্নেহময় পিতা কিন্তু তার কর্মজীবন নিয়ে মানুষ এত বেশি গবেষণা করেছে যার ফলে তার ব্যক্তিগত জীবন নেপথ্যে চলে গেছে।

মাওয়ের রেডগার্ড বাহিনীর যারা সদস্য তাদের সবারই জন্ম উনপঞ্চাশ সালের পরে। মুক্ত চীনে তারা জন্মগ্রহণ করেছে, জন্মের পর জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় তারা বর্ধিত হয়েছে। তারা চেয়ারম্যান মাওয়ের জীবন ও কর্মের সঙ্গে বাল্য থেকেই পরিচিত। তারা জানে চীনের রক্ষাকর্তা মাও, এবং এই রক্ষাকর্তার আদর্শ তাদের অনুপ্রাণিত করেছে সব সময়। এই বাহিনীর সদস্যদের

মনে পুরাতন সংস্কৃতির ছাপ তেমন ছিল না যতটা রয়েছে তাদের পিতামাতার মনে। তাদের সামনে যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ এল তখন তারা তাকে আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল এবং প্রতিক্রিয়াশীল গ্রন্থ, চিত্র এবং নিয়মাবলী ধ্বংস করতে মেতে উঠল। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত অত্যাচার অনাচারও হয়েছে। পুরাতনপন্থী চীনা যারা আছে তাদের মনে কঠিন আঘাত লেগেছিল ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে বেশি উপকার হয়েছে জনসাধারণের। জনসাধারণ মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। এই অবস্থাকে ঠিক স্বীকার করতে পারেনি লিউ শাও-চির দল।

ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে চীন বড়ই ব্যস্ত। আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে যথেষ্ট। আমেরিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মনে করল, চীন তার ঘর সামলাবে, এখন ভিয়েতনামকে সাহায্য করতে পারবে না, এমন কি রাশিয়াও প্রয়োজনমত সাহায্য দিতে পারবে না। তারা আশান্বিত, জয় নিকটবর্তী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফৌজ তথা ভিয়েতকং তথা গোরিলা বাহিনী দুর্বল হবে। অচিরেই তাদের ধ্বংস করা সম্ভব হবে। তারা প্রকাশ্যে বলল, In the coming years we may well see a China turning on herself in bitterness and frustration, away from a world in which the ostensibly socialist Countries such as the U. S. S. R. are.—চীন বিযুক্ত হবে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে, তার আভ্যন্তরীণ তিক্ততা ও হতাশা তাকে তার প্রোগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখবে। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে চীন মোটামুটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে মাওয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে গেছে, বিপন্ন ভিয়েতনামকে সাহায্য করছে, আবার রাশিয়ার সঙ্গেও আপোষ আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা মেটাতে সচেষ্ট হয়েছে।

চীনের বৈদেশিক নীতির পরাজয় ঘটেছে, এই মন্তব্য শোনা যায়। নিরপেক্ষ বিচারে এটা আংশিক সত্য বলেই মনে হয়।

চীন-ভারত সম্পর্কে অবনতি ঘটার জন্য উভয়পক্ষ পরস্পরকে দোষারোপ করে আসছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ-ই এগিয়ে আসছে না।

মাওয়ের তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষে বুর্জোয়াতন্ত্র কায়েম হয়েছে। এটাও ঠিক। কিন্তু বান্দুং-এ বসে Peaceful co-existence-এর প্রতিশ্রুতি দেবার পর অপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে মাথা ঘামানো মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ভারতবর্ষ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচতে সচেষ্ট ভারতীয় প্রগতির দাবীদার অধিকাংশই বুর্জোয়াদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বিপ্লবের অলীক স্বপ্ন দেখছে। এটাও সত্যি। কিন্তু এর সঙ্গে চীনের সম্পর্ক যে কোথায় তা বুঝা দায়। মাও যেমন মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে চীনের উপযোগী করে প্রয়োগ করে থাকে, তেমনি ভারতীয় পরিবেশে মার্কস ও লেনিনের আদর্শ প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত অনেকেই মনে করে, অবশ্য কায়েমী স্বার্থের অনেক চোরাকারবারী, পাতি-বুর্জোয়া, উচ্চ-বিত্তশ্রেণীর বহু ব্যক্তি এই সব প্রগতিশীল দলের নেতৃত্বলাভ করায় কোনক্রমেই তারা অগ্রসর হতে পারছে না, হয়ত পারবেও না। বিপ্লবের ফাঁকা বুলি দেওয়া যায় কিন্তু বিপ্লবের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে কোন বৈজ্ঞানিক পথ ধরে চলা অত সহজ নয়। ভারতীয় প্রগতিশীল দলের অধিকাংশই বিপ্লব করার মত মেরুদণ্ডহীন, ফলে পার্জিং হচ্ছে। হবেও। কিন্তু তাতে চীনের বিশ্বকম্যুনিজম প্রচার করার অছিলায় রূঢ় সমালোচনাও সব সময় যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

চীন ভারত সমস্যা সীমান্ত নিয়ে। তার ফয়সলা করতে আন্তরিক-ভাবে অগ্রসর হলেই তিক্ততা হ্রাস পাবে নিশ্চিত।

আর যদি ভারতকে চীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র মনে করে, অপাংক্তেয় মনে করে তা হলে পাকিস্থানকে কোন পর্যায়ে আনা যায় তা কি চীনের

নেতারা চিন্তা করেছে কখনও। পাকিস্থান আগ্রাসী, যুদ্ধবাজ, সমাজতন্ত্রীর শত্রু বুর্জোয়া রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে মিতালি কতটা যুক্তিযুক্ত তাও চিন্তার বিষয়।

বৈদেশিক নীতি যদি সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় প্রণোদিত হয় তা হলে বোধহয় চীনকে আবার চিন্তা করতে হবে। আর যদি মনে করে তার বৈদেশিক নীতি অপর দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে তা হলেও ভুল হবে কেন না কম্যুনিজম বা সোস্যালিজম রপ্তানী যোগ্য বস্তু নয়। আর তা আমদানী করতেও কোন আত্মসম্মান সম্পন্ন দেশ বা দল রাজি হবে না। কম্যুনিজম বা সোস্যালিজম স্বয়ম্ভু আর তা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর। চীন-ভারত বিবাদের মূলে যে সীমান্ত সমস্যা তা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কারণ অর্থনৈতিক। সেদিকে নজর দিলেই বুঝা যাবে এই সমস্যা সমাধান করতে হলে যে অবস্থা সৃষ্টির দরকার তা অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে কিনা সন্দেহ। সেই সঙ্গেই আন্তরিকতার প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

এশিয়াতে জাপানের পরেই শিল্পোন্নত দেশ ছিল ভারতবর্ষ। ভারতের কাঁচা মাল, উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্য পৃথিবীর বাজারে এতকাল চালু ছিল, এখনও আছে। আগে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু চীনের শিল্পোন্নতির ফলে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর বাজারে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্যের বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, ভারতের ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির অর্থ হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বার্থহানি। ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের এজেন্টরা পরিচালনা করছে, ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে রোধ করতে বিবাদ দেখা দিয়েছে, যার বাহ্যিক বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে সীমান্ত সমস্যায়। এই সমস্যার সমাধান খুব সহজ নয় বলেই মনে হয়। অবশ্য পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীনের প্রতিযোগী নয় বলেই বোধহয় মিতালি কিন্তু আসল ঘটনা ও উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার নয় অনেকের কাছেই। সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে

অস্ত্রের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু জহরলালের দ্বৈত ভূমিকাই হল এই সংঘর্ষের কারণ। একদিকে জহরলাল ভারতীয় বণিক স্বার্থের পাহারাদার অপর দিকে আমেরিকার স্তাবক, সে জন্য রক্তাক্ত সংঘর্ষ এড়াতে পারেনি কোনক্রমেই

আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও মাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। মাও লাভের জন্য উৎপাদন এই নীতিকে সমর্থন করেনি। প্রয়োজনের নীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হল আসল উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশে। যখনই লাভের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হবে তখনই দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে, জনতার বৈপ্লবিক চিন্তায় ঘুণ ধরবে। তখন সমাজতন্ত্রের জন্য যে রাজনৈতিক সংগ্রাম তা প্রভাবিত হবে অর্থনীতির দিকে, ক্রমেই ব্যক্তিস্বার্থ হবে প্রধান। সমাজ উন্নয়নের পবিত্র দায়িত্ব পালন না করে জনসাধারণ দুর্নীতির দিকে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা, সমষ্টির স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। সর্বহারার বিপ্লবকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করবে এই সব স্বার্থপর ব্যক্তিরা।

উৎপাদন কমে যাবে যদি লাভের চিন্তা বৃদ্ধি পায়। বাজারে কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি করতে চাইবে উৎপাদনকারীরা; সামাজিক অধিকার, জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে সবার অজ্ঞাতে, সঙ্গে সঙ্গে শোধনবাদ জন্মাবে, শোধনবাদ ডেকে আনবে ধনতন্ত্রবাদকে। সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যে অর্থনীতির উন্নয়ন তা চিরকালের মত রুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রতি-বিপ্লব দেখা দেবে দেশে। মাও এই জন্য 'Economism-কে পরিহার করতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে আরও জোরদার করে তোলে। যদি কোন রকমে এই 'Economism' তার দাঁত বসাতে পারে সমাজ-তান্ত্রিক দেশে তা হলে প্রতি-বিপ্লব আসবে, প্রতি-বিপ্লব ডেকে আনবে বুর্জোয়াতন্ত্রকে। বুর্জোয়াদের গণতন্ত্র বলে যা প্রচার করা হয় তা শোষণের একটি যন্ত্র মাত্র। সেই গণতন্ত্রের মোহ সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্রের পথ চিরতরে রোধ করতে প্রয়াসী হবে প্রতিক্রিয়াশীলরা।

মাও তার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বিরোধীরা সতর্ক করে দেয়। মাও বলেছে যারা এর বিরোধিতা করবে তারা ধ্বংস হবে। মাও চেয়েছে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হোক, চাষী শ্রমিক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঐক্যবদ্ধ হোক

সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের মানুষকে পুরোপুরি চীনা তৈরী করেছে। আগের দিনে চীনের বুদ্ধিজীবি লোকেরাও মার্কস লেনিনের কথা বলেছে, তারা রাশিয়া, জার্মানী, গ্রীসের ইতিহাস আলোচনা করেছে, তারা মার্কস, লেনিন, এনজেল, স্টালিনের অনেক তথ্য মুখস্ত বলতেও পেরেছে, পারেনি শুধু তাদের পূর্ব পুরুষদের বিষয় বলতে, তারা ভুলেই গেছে চীনকে, চীনের গৌরবকে। এর জন্য তারা লজ্জিত হয়নি বরং গর্ববোধ করেছে। অনেকেই জানত না কোনটা চীনের, আর কোনটা বিদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি।

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গেছে বিদেশীকে অনুকরণ করার উৎকট চেষ্টা। তারা বিদেশী পোষাক ও বিদেশী ভাষা এমন রপ্ত করেছিল যাতে চীনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এইসব লোক সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

বিয়াল্লিশ সাল থেকে মাও এই অধঃপতন রোধ করতে চেষ্টা করেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে চিন্তাধারায় এবং আচার ব্যবহারে। এখানেই মাওয়ের অসামান্য কৃতিত্ব।

মাও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যধিক অনাসক্ত। বিলাস বলতে কিছু নেই। চীনের পাতলুন ও কামিজ ও কোট বিনা অন্য পরিধেয় মাও ব্যবহার করে না। এবং এই পোষাকও খুব মূল্যবান নয়। অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করেই মাও তার জীবন কাটিয়েছে ও কাটাচ্ছে।

মাওকে বিচার করতে হলে একমাত্র তার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করলে সম্পূর্ণ হয় না। তার ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবন তার কর্মজীবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি তার কর্মজীবনও প্রভাব বিস্তার করেছে তার ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনকে।

"আমার শিশু সন্তানের হাসি, আধো আধো কথা আমাকে আনন্দ দেয় কিন্তু আমার স্নেহ মায়া মমতার ওপর রয়েছে দেশের প্রতি দায়িত্ব তাই হাসি মুখখানাকেও ভুলে থাকতে হয়।"

স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যৌন আবেদন রয়েছে তার চেয়েও বেশি মূল্যবান হল দুজনের ভালবাসা। ভালবাসার গভীরতা স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে।

একজন মোটর ড্রাইভার। বয়স তার ছাব্বিশ বছর। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল সে। তারপর যখন তার মত পরিবর্তন হল তখন তাকে জিজ্ঞেস করল তার কমরেড, কেন এমন হল?

ড্রাইভার বলল, আমি গরীব চাষার ছেলে।

তার কমরেড বলল, তা হলে আমরা আশা করব তুমি খাঁটি লাল-বাহিনীর চিন্তায় অনুপ্রাণিত।

নিশ্চয়। আমি মনে করেছিলাম সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে নিজেকে খাঁটি লালবাহিনীর লোক বলে পরিচয় দেব। কিন্তু আমার মনের তাতে পরিবর্তন ঘটবে কিনা তা চিন্তা করে দেখিনি সে সময়। আমরা জানি সরকারের যে শীর্ষে সেই আমাদের নীতি পরিচালক। তাই যুক্তি বা বিচার দিয়ে কোন কাজে এগোতে চেষ্টাও করিনি।

তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই।

ড্রাইভার গম্ভীরভাবে বলল, নিশ্চয়ই। আমার এই হঠকারিতা আমাকে বুর্জোয়া মনোভাব জন্মাতে সাহায্য করল। আমার মনের গোপন স্তরে ছিল ধনলিপ্সা, এই লিপ্সা জেগে উঠল, আমি বুর্জোয়াদের সঙ্গী হলাম। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধী হয়ে পড়লাম। মনের পরিবর্তন না ঘটিয়ে হঠকারিতা দিয়ে কোন সময়ই খাঁটি সর্বহারা হওয়া যায় না।

কি করে তা বুঝলে ?

যখন জনসাধারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে আন্দোলন করছিল আমি তাদের ব্যঙ্গ করেছি, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলেছি। সুযোগমত তাদের দুচারজনকে ধরে প্রহারও করেছি। হঠাৎ মনে হল আমি যা করছি তা ঠিক কি না। আমার আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি নিজেকে চিন্তা করলাম, নিজের কাজকে চিন্তা করলাম, আমি চিন্তা করলাম আমি সঠিক পথে যাচ্ছি কিনা, আমি চিন্তা করলাম আমি নিজেকে সর্বহারা করে গড়ে তুলতে পেরেছি কিনা।

মহান চেয়ারম্যান তো আমাদের সামনে আদর্শ রেখেছিল, তুমি সেই আদর্শ অনুসরণ করনি কেন ?

ড্রাইভার গম্ভীর ভাবে বলল, আমি মাওয়ের নীতিকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তার প্রতিবাদ করেছি। আমি এই শিক্ষা নিতে চাইনি। ভয় ছিল, আমার মনের কথা জানলে কেউ যদি তা সমালোচনা করে, কেউ যদি রূঢ় মন্তব্য করে, কিন্তু চুপি চুপি পড়লাম মাওয়ের বাণী। আমি বুঝতে পাড়লাম, কে সর্বহারা আর কে সর্বহারার শত্রু। চেয়ারম্যান মাওয়ের বাণী সব বিষয়ে আমাকে শিখিয়ে তুলল। আমি বুঝলাম, আমি যে পথে চলছিলাম তা সন্ত্রাসের পথ। ডাকাতি, সমাজবিরোধী কাজ, সন্ত্রাস দিয়ে জনচিত্ত জয় করা যায় না। জনতার সঙ্গে ঐক্যবোধ না জন্মালে কোন রকমেই জনচিত্ত জয় সম্ভব নয়।

তারপর কি করলে ?

মাওয়ের “Combat Liberalism” পড়লাম, তার ষোল দফা প্রস্তাব পড়লাম। উদারপন্থী মতবাদের এগারটি দফা পড়ে মনে হল এগুলো আমার ওপর বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। আমি কাজে গাফিলতি করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। মাওয়ের বাণী পাঠ করার পর আমি কাজে আগ্রহী হলাম, আমি আদর্শকে আঁকড়ে ধরলাম। এখন আমি খুশী মনে চলতে ফিরতে পারছি, আমার মনে জেগেছে

শৃঙ্খলাবোধ। এর চেয়ে আর কি আছে। কিন্তু কমরেড তুমি তো তোমার কথা বললে না।

বলছি। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমর্থন করেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী মোটেই আমাকে সমর্থন করেনি। প্রতি কাজেই বাধা দিয়েছে।

এখন !

এখন আমি একা। অনেক চেষ্টা করেছি তার মানসিক পরিবর্তন আনতে। চাষার ঘরের ছেলে আমি। অভাব অনটন ছিল, যার অভাব অনটন বেশি তার ভোগের স্পৃহাও বেশি, সে সুযোগ পেলেই অপরকে বঞ্চনা করার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু বাল্যকাল থেকে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে মেনে চলেছি সেজন্য আমি বুর্জোয়াদের সহ্য করতে পারিনি। কিন্তু গরীব চাষীর ঘরের মেয়ে আমার স্ত্রী, সে কোন রকমেই তার মনের গোপন লিপ্সাকে দমন করতে পারেনি। যখন দেখলাম সে কিছুতেই আমার তথা মহান নেতার নির্দেশ মানতে রাজি নয় তখন তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটল।

ড্রাইভার বলল, তুমি তাকে ভালবাসতে ?

এখন মনে হচ্ছে ভালবাসিনি ওকে। দেহের প্রয়োজনেই স্ত্রী ছিল। আদর্শ যদি ভিন্ন পথ ধরে তা হলে বিবাহ হয় নরক যন্ত্রণার সমান। আমার জীবনে সেই নরকযন্ত্রণা সহ্য করেছি। তাই তার হাত থেকে মুক্তি নিয়েছি।

তোমার সেই স্ত্রী কি আবার বিয়ে করেছে ?

বোধহয় করেনি। বিবাহ বিচ্ছেদের পর উত্তরে কোথাও গেছে, খবর জানি না। বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন কোন ব্যক্তিকে সে তল্লাস করছে বলেই মনে হয়। আমার বিশ্বাস সে নিরাশ হবে।

তুমি বিয়ে করলে না কেন বন্ধু ?

একবার ঠকেছি, বার বার ঠকতে চাইনা। মনের মত বউ যদি না পাই তা হলে আবার আদালতে ছুটতে হবে। তার চেয়ে একাই থাকব।

তা কি সম্ভব।

সম্ভব নয়। তবে অসম্ভব হবার আগে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব কোন সঙ্গী সাথী। তুমি বিয়ে করনি কেন?

আমার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। আমি জনসাধারণকে সেবা করতে চাই, বিপ্লবের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে চাই। আমার জীবন সীমাবদ্ধ কিন্তু আমার কর্ম যেন অসীম হয়। সেই অসীমের দিকে চলতে সত্যি যেদিন কর্মসঙ্গিনী পাব সেদিন বিয়ে করব স্থির করেছি।

আরেকজন বাসের ড্রাইভার দুঃখ করে বলছিল, হাঁ এই বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। আমার সহকর্মীদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জেগেছিল, তারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে জটলা করত। গুলতানী করত। সবাই নিজেকে মনে করত আমি একটি বিরাট ব্যক্তি। তার ফলে অশান্তি লেগেই থাকত আর কাজে গাফিলতি ঘটত। অবশেষে আমরা জয় করলাম তাদের। গায়ের জোরে তাদের জয় করিনি, আমরা :মিটিং করে সবাইকে বুঝিয়ে বললাম এই মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি। কেমন করে জনতার সেবা করা সম্ভব, কেমন করে আদর্শগত ভুলকে সংশোধন করা যায়, জনতার মধ্যে যে বিপরীত-ধর্মী মনোভাব রয়েছে তা কেমন করে জয় করা যায়, এই সব নিয়ে সভাসমিতি করে আমরা সাফল্যলাভ করেছি। আর দলে উপদলের কোন্দল নেই। কাজে গাফিলতি নেই।

মাওকে যে ভাবে আমেরিকার অধিবাসীরা বিশ্লেষণ করেছে, তা সর্বদা সমর্থনযোগ্য নয়। মানুষের মানসিক পরিবর্তন সব সময়ই যুগধর্মী। যৌবনে মাও ডাকাতদের উপকথা পড়ে যে ভাবে তার মনকে তৈরী করেছিল, পরবর্তীকালে সান ইয়াত সেনের প্রভাবে তার মনোভাব যা হয়েছিল, এমন কি লঙ্ মার্চের পরও যে ভাবে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আপোষ করতে ইচ্ছুক ছিল তার সেই মনোভাব চীনের মুক্তি

যুদ্ধ শেষ হবার পর আর হয়ত দেখা যায়নি। মাওকে নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, অনেক সময় কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক উত্থান পতনও হয়েছে কিন্তু মাওয়ের চারিত্রিক পরিবর্তন আর লক্ষ্য করা যায়নি। তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করে একটা নির্দিষ্ট মতে আসাই যুক্তিযুক্ত।

মাও জন্মেছিল আঠারশত তিরানব্বই সালে। আঠারশত পঁচানব্বই সালে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়। সেই বছরই জাপান কোরিয়াকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাইওয়ান (ফরমোজা) ও পেসকাডোর জাপান দখল করে। মাঞ্চু শক্তির অক্ষমতা দেখে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয়েছিল কাং য়ু-উই, লিয়াং চি-চাও এবং তান স্যু-তুং। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজরোষে তারা দণ্ডিত হয়। উনিশ শত সালে বকসারে চীনারা বিদ্রোহ করে, পাশ্চাত্যশক্তি নির্মমভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে। মাওয়ের বাল্যজীবন এই সব ঘটনায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। মাঞ্চু সম্রাটদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য তাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয় বাল্যকাল থেকেই। উনিশশত এগার সালে যখন মাও আঠার বছরের যুবক ও ছাত্র তখন সান ইয়াত সেনের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে এবং বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে ছয় মাস সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করে। ছয় মাস পরে মাও চ্যাংসায় তার পুরাতন চতুর্থ নর্মাল স্কুল প্রথম নর্মাল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হতেই মাও প্রথম নর্মাল স্কুলে ছাত্ররূপে যোগ দিয়েছিল। পাঠ্য জীবনেই চেন তু-স্যুইয়ের সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠ করে দেশের অবস্থা জানতে থাকে এবং রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে থাকে। আঠার সালে মাও স্নাতকত্ব লাভ করে। এই বৎসরই লি তা-চাওয়ের নেতৃত্বে মার্কসবাদী সংস্থা গড়ে উঠল পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতদিনে মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে মাও পরিচিত হল। পরের বছরে যখন তার বন্ধুরা (চৌ এন-লাই ও অন্যান্য) ফ্রান্সে গেল লেখাপড়া শিখতে তখন থেকেই মাওয়ের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। জার্মান অধিকৃত চীনের অংশ জাপানের

হাতে তুলে দেওয়াতে চৌঠা মে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবাজ সামন্তদের ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে মাও আত্মনিয়োগ করে। সেই সময় থেকে তার রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ বলা যায়। এই হল মাওয়ের কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়।

বিশ সাল থেকে মাও তার নিজের প্রদেশ হুনানে কম্যুনিষ্ট দল গঠন করতে থাকে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। একুশ সালে চীনের প্রথম কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে মাও যোগদান করে। সাংঘাইতে এই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ফরাসী প্রভাবান্বিত অঞ্চলে একটি বালিকা বিত্থালয় বসেছিল। পুলিশের অত্যাচারে তাদের শেষ বৈঠক বসে একটি লেকের নৌকাতে। সেই বছরই মাও হুনানের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ লাভ করে। পরের বছরে স্থির হয় কম্যুনিষ্টরা ব্যক্তিগত ভাবে কুয়োমিনটাং-এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে। মাও কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সেই সময় থেকে সহযোগিতা করতে থাকে। অবশ্য তার কম্যুনিষ্ট চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি তাতে।

তেইশ সালে মাও কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয়। এই বছর কম্যুনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পরের বছর জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং দল কম্যুনিষ্টদের সদস্যরূপে গ্রহণ করতে রাজি হয়। বাইশ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যক্তিগত ভাবে কুয়োমিনটাং-এ যোগ দেবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা এইবার ব্যাপক ভাবে কার্যকরী হয়। মাও সে-তুং কুয়োমিনটাং কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। সাংঘাইতে কুয়োমিনটাং-এর বিশিষ্ট কাজে :নিযুক্ত হয়। মাওকে ওয়াং চিং-উই এবং হু হান-মিনের অধীনে কাজ করতে হয়। মাও যে ভাবে কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে অত্যধিক উৎসাহ ভরে সহযোগিতা করছিল তাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যান্য সদস্যরা মোটেই খুশী হতে পারেনি। তারা তীব্র ভাষায় মাওয়ের সমালোচনা করতে আরম্ভ করল। মাও অপদস্থ হতে থাকে

পার্টি কমরেডদের কাছে। অবশেষে মাও ফিরে গেল তার জন্মভূমি শাওসানে। সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর মাও হাঁপিয়ে উঠল। পঁচিশ সালে মাও হুনান প্রদেশে কৃষক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করল। সেই বছর মে মাসে ছাত্র, শ্রমিকদের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। সাংঘাইয়ের বৃটিশ প্রভাবান্বিত এলাকায় ছাত্র ও শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলী চালায়। এই গুলী চালনার ফলে বহু ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। পরের সপ্তাহে সাংঘাইতে ধর্মঘট আরম্ভ হল। এই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল ক্যানটনেও এমন কি হংকংকে বয়কট করল চীনের অধিবাসীরা। সেই সময় মাও কৃষক সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত ছিল হুনানে। হুনানের প্রশাসক তার কাজ মোটেই সুচক্ষে দেখত না। তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতেই মাও ক্যাণ্টনে পালিয়ে এল। সেখানে কুয়োমিনটাং-এর কৃষক ফ্রণ্টে কাজ আরম্ভ করল। সেই বছরই মাও সে-তুং কুয়োমিনটাং-এর মুখপত্র চেং-চি চৌ-পাও পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হল। এবার মাও হল সাংবাদিক। এই পর্যন্ত মাওয়ের কর্ম জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

ছাব্বিশ সাল থেকে মাওয়ের জীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ।

মাও কুয়োমিনটাং-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য প্রস্তাব পেশ করল। মাওয়ের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল কুয়োমিনটাং-এর নেতারা। সেই বছরই সর্বপ্রথম মার্চ মাসে চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের মতান্তর ঘটতে থাকে।

মাও কুয়োমিনটাং-এর কৃষক আন্দোলন ট্রেনিং সেণ্টারের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিল। তখন মনে হল মাও আর কুয়োমিনটাং-এর স্বার্থ এক ও অভিন্ন।

চীন তখন দুই ভাগে বিভক্ত।

দক্ষিণ দিকে চীন প্রজাতন্ত্রের নায়ক জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেক আর উত্তর দিকে রাজত্ব করছে চীনের যুদ্ধবাজ সামন্তরা। চিয়াং

স্থির করল উত্তরের প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধবাজদের হটিয়ে গোটা চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করবে। সাতাশ সালে চিয়াং কাইশেক আক্রমণ করল উত্তর অঞ্চল। দখল করল সাংঘাই ও নানকিং। মাও তখন কুয়োমিন-টাং-এর তৃতীয় প্লেনামে যোগ দিয়ে কুয়োমিনটাং-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে মোটেই ত্রুটি করল না। চিয়াং কাইশেক কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল, কম্যুনিষ্টদের সায়েস্তা করতে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হল, ধর্মঘট রোধ করতে সেবার বহু শ্রমিককে হত্যা করে নিজের শক্তিকে সংহত করতে ত্রুটি করল না। মাও ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে রিপোর্ট দিয়ে কুয়োমিনটাং-এর সামনে প্রস্তাব রাখল জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার। মাওয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সামনে শস্য ওঠাবার সময়। চাষীরা ফসল কাটবে, জমিদার আর সম্পন্ন চাষীর খামার ভর্তি হবে। কুয়োমিনটাং-এর নীতি হল শ্রমিক ও চাষীদের শোষণ করা। তাদের বাধা দিতে হবে ফসলের মরশুমে। চাষীদের জোটবদ্ধ করা দরকার। মাও এই সময় চাষী আন্দোলন জোরদার করে জমিদার ও সম্পন্ন চাষীদের হাত থেকে ধান ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট হল। এই চেষ্টার সঙ্গে অহিংস আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। চাষীরা তাদের প্রাচীন-কালের অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই আক্রমণ করেছিল জমিদারদের ও সম্পন্ন চাষীদের কিন্তু এই আন্দোলন ব্যর্থ হল। চিয়াং-এর ফৌজ সর্বতোভাবে বাধা দিল মাওকে। মাও পালিয়ে গেল চিং কাং পাহাড়ে। সেখানে স্থাপন করল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। কম্যুনিষ্ট পার্টি মাওয়ের এই জঙ্গী আচরণ মোটেই সমর্থন করেনি। তারা মাওকে পার্টি থেকে বের করে দিল। মাওয়ের কর্ম জীবনের তৃতীয় পর্যায় এখানেই শেষ। আরম্ভ হল তার জীবনের চতুর্থ পর্যায়।

আঠাশ সালে মাওয়ের সঙ্গে যোগ দিল জেনারেল চু টে। চু টে চতুর্থ শ্রমিক ও কৃষকের লালফৌজ গড়ে তুলল। এই বৈপ্লবিক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হল চু টে আর রাজনৈতিক কার্যাবলীর দায়িত্ব নিল

মাও সে-তুং। পরের বছর মাও এবং চু টে কিয়াংসি প্রদেশে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তন করল, সরকারী ফৌজকে বার বার আঘাত করে মুক্ত করল কিছু অঞ্চল। সেই অঞ্চলকে সোবিয়েতে বিভক্ত করে কম্যুনিষ্ট প্রশাসন স্থাপন করে চ্যাংসার দিকে নজর দিল কিন্তু চ্যাংসা কোন-ক্রমেই দখল করতে পারল না। এই আক্রমণের সময় ধৃত মাওয়ের স্ত্রী কাই-হুই এবং ভগ্নীকে ফাঁসি দিল চ্যাংসার শাসক। চিয়াং মাওয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হল। কম্যুনিষ্টদের নির্মূল করতে চিয়াং সৈন্য প্রেরণ করল কম্যুনিষ্টদের ঘেরাও ও হত্যা করতে। চিয়াং-এর নির্দেশ হল Sarround and kill— ঘেরাও কর আর হত্যা কর।

কম্যুনিষ্ট পার্টি মাওয়ের এই জঙ্গী ব্যবস্থাকে আগেও সমর্থন করেনি, এবারও সমর্থন করল না। অবশ্য চিয়াং-এর প্রথম 'ঘেরাও-হত্যা' প্রকল্প নিষ্ফল হয়েছিল মাওয়ের কৃতিত্বে তবুও মাও, চু টে এবং লি লি-সানের জঙ্গী কার্যাবলী সমর্থন করতে চায়নি কেন্দ্রীয় কমিটি। একত্রিশ সালে চিয়াং দ্বিতীয়বার 'ঘেরাও-হত্যা', প্রকল্প নিয়ে আবার সৈন্য পাঠাল। দ্বিতীয় বারও চিয়াং ব্যর্থ হল, সেই বছর-ই আবার তৃতীয় অভিযান সুরু করল চিয়াং। হয়ত এই অভিযান কিছুটা সাফল্যলাভ করত কিন্তু সেপটেমবর মাসে জাপান মানচুরিয়া আক্রমণ করাতে ঘটনার মোড় ঘুরে গেল। চিয়াং ছুটল জাপানের সঙ্গে লড়াই করতে, সর্বতোভাবে কম্যুনিষ্ট দমনে সমর্থ হল না। ফলে এই তৃতীয় অভিযানও ব্যর্থ হল। চিয়াং তখন তার প্রভাবাধীন এলাকার কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিল, আর কম্যুনিষ্ট সদস্য যারা আত্মগোপন করেছিল সাংঘাইতে তারা পালিয়ে এল মাও সে-তুং-এর কিয়াংসি এলাকার সোবিয়েতে। নভেমবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে কম্যুনিষ্ট অধিকৃত এলাকায় প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হল আর মাও সে-তুং হল তার চেয়ারম্যান। আর জুইচিন হল তার প্রশাসন কেন্দ্র।

জাপানের আগ্রাসী নীতিতে চীনের স্বাধীনতা বিপন্ন। মাও প্রথমে বলেছিল আগে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াংকে বিদায় করতে হবে, কিন্তু যখন

দেখল চিয়াংকে বিদায় করার চেয়ে জাপানকে বিদায় করা বেশি প্রয়োজনীয় কারণ একাধারে জাপানের আক্রমণে চীন ক্ষতবিক্ষত, অত্যাচারিত অপর দিকে চীনের সার্বভৌমত্বও বিপন্ন এবং চিয়াং-এর সামর্থ্য নেই জাপানকে বিতাড়িত করার তখন মাও নতুন সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষ থেকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। চিয়াং মাওয়ের তথা কম্যুনিষ্ট আদর্শের গোঁড়া শত্রু তবুও মাও আবেদন জানাল চিয়াংকে সম্মিলিতভাবে জাপানকে বাধা দেবার জন্য। অনেক আলোচনার পর চিয়াং ও মাওয়ের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি স্থির হল। মাও পূর্ণ উদ্যমে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। কিন্তু চিয়াং তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে আবার চতুর্থ :অভিযান পাঠাল কম্যুনিষ্টদের 'ঘেরাও-হত্যা' করতে। বলা বাহুল্য এবারও চিয়াং সাফল্য-লাভ করল না। আবার চিয়াং জাপানকে সম্মিলিত ভাবে আক্রমণের প্রস্তাব গ্রহণ করল। প্রস্তাব কার্যকরী করার আগেই চিয়াং আবার তার পঞ্চম অভিযান আরম্ভ করল তেত্রিশ সালের অকটোবর মাসে। ফুকিয়েনে একদল বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটল কিন্তু কম্যুনিষ্ট বাহিনী এই অভ্যুত্থানে কোনরূপ সাহায্য করতে না পারায় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল।

পরের বছর অকটোবর মাসে লঙ্‌ মার্চ আরম্ভ।

মাওয়ের কর্মজীবনের চতুর্থ পর্যায় এখানেই শেষ। পঞ্চম পর্যায় আরম্ভ হল এই লঙ্‌ মার্চ থেকে।

প্রথম পর্যায় আলোচনা করলে দেখা যায় মাওয়ের অপরিপক্ক চিন্তাধারায় য়্যাডভেনচারের গন্ধ ছিল বেশি। বাল্যকালে দস্যুদের জীবন কাহিনী পড়ে মাওয়ের মনে জেগেছিল দুর্মদ য়্যাডভেনচারের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ও শিক্ষাগত উৎকর্ষতা তাকে পরবর্তী পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ফৌজী শিবিরে। তখন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং জাতীয়তাবাদের মোহ ছিল তার মনে। তৃতীয় পর্যায়ে মাও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার স্পর্শে এসে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেও জাতীয়তাবোধের উগ্রতা ছিল যথেষ্ট।

ভারতবর্ষে অনেকে যেমন মনে করে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের ধনতন্ত্রবাদকে রুখতে হলে কংগ্রেসের মধ্যে গিয়ে নবীন তুর্কী হওয়া যুক্তিযুক্ত সেই রকমেই কুয়োমিনটাং-এর জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া তোষণকারী দলে ঢুকে নিজেদের প্রাধান্য সৃষ্টি করার অত্যুগ্র বাসনা বোধ হয় ছিল মাওয়ের মনে। তাই কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে কোন রকম ইতস্তত করেনি। ভারতে কয়েকজন কংগ্রেসবিরোধী আইন সভার সদস্য কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের ধাঁচ শুনে যেমন রাতারাতি দল বদল করে কংগ্রেসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তেমনি ঘটনাও ঘটেছিল চীনে। মাও একসময় কুয়োমিনটাংকে প্রগতিশীল বলে ভুলও করেছিল। কিন্তু মাও সে-তুং-এর ভূমি সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব যখন অগ্রাহ্য হল তখনই মাও বুঝতে পারল বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে বাস করে বুর্জোয়াকে প্রগতিশীল করতে চেষ্টা করার মত মূর্খতা আর নেই। ধনতন্ত্রকে সর্বহারাতন্ত্রে রূপায়িত করার অর্থ হল ব্যক্তিস্বার্থকে বলী দেওয়া। যারা কায়েমী স্বার্থের বাহক ও পোষক তারা কোনক্রমেই সর্বহারাতন্ত্রকে স্বীকার করে না তাই প্রগতির বুলি ধনতন্ত্রীদের মুখে শুনে যারা তাদের বিশ্বাস করে তাদের রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞানেরও অভাব। মাও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল, অবশেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাও পরিত্যাগ করল কুয়োমিনটাংকে।

মাওয়ের পরবর্তী পঞ্চম পর্যায়ে মাওকে আসল পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পার্টি তাকে নিন্দা করেছে, পার্টির উচ্চপদ থেকে তাকে নামিয়ে দিয়েছে, কারণ তার জঙ্গী মনোভাবকে চীনের উপযোগী তারা মনে করেনি, দ্বিতীয়ত মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের অপব্যাখ্যা করতেও তারা পিছপা হয়নি। শুধু মাওয়ের ক্ষেত্রেই নয় যারা প্রগতিশীল বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া আখ্যা দিয়ে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটাতে তথাকথিত প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালি করতে চায় তারা মার্কস ও লেনিনকে বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন দেখে। এমত অবস্থায় পার্জিং হয় সর্বদেশেই। চীনেও

তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই সব বিপথগামী দলীয় সদস্যকে আত্মগোপন করতে বুর্জোয়া দলে যেতে হয় অথবা শোধনবাদকে স্বীকার করে কম্যুনিজম অথবা সোস্যালিজমের বুলি শুনিয়ে সব সময় জনতাকে প্রতারণা করতে হয়। তাই ঘটেছিল চীনেও। মাও তার প্রতিবাদ মাত্র।

রাজনৈতিক চিন্তাধারায় চিয়াং মোটেই শিশু নয়। তার হাতে ক্ষমতা। সে বুঝতে পেরেছিল কম্যুনিষ্টরা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্য সে সর্বশক্তি দিয়ে কম্যুনিষ্টদের নির্মূল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। জাপান যদি মানচুরিয়া আক্রমণ না করত তাহলে ইতিহাসের গতি কি হতো বলা কঠিন। ইন্দোনেশিয়ার আইদিতের মত কম্যুনিষ্টদের যদি নৈরাশ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো তাও আশ্চর্য নয় কিন্তু ঘটনার গতি ভিন্ন পথ ধরেছিল এবং চিয়াং-এর জনসংযোগের ব্যর্থতাই তার পতনের কারণ। বুর্জোয়া শাসনকে সহজে উৎখাত করা যায় না। রাশিয়াতেও যদি সামরিক বাহিনী এসে কৃষক ও শ্রমিকদের পাশে না দাঁড়াত তাহলে রাশিয়ার বিপ্লবের চেহারা কি হতো তাও বলা কঠিন। তেমনি মাওয়ের জন-সংযোগ না থাকলে এই মহান প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্যলাভ করত তাও বলা কঠিন। মাওয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তার জন-সংযোগ। চীনের চাষীরা মাওয়ের নেতৃত্ব পেয়েছিল বলেই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছিল।

চিয়াং-এর আক্রমণে মাওকে লঙ্ মার্চের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল। পঞ্চম পর্যায়ের এই যে সংগ্রাম এটাই হল মাওয়ের আসল চরিত্র। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই লঙ্ মার্চ ও তৎপরবর্তী কালে যে ভাবে সবাই দেখতে পেয়েছে তার তুলনা পৃথিবীতে আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য এই সময়ও তাকে পার্টির কাছ থেকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে, একবার তার ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, পারিবারিক জীবনে তার পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে, ছুটো ভাইকে হত্যা করেছে

চিয়াং-এর অনুচররা তবুও অকুতোভয়ে স্থির বিশ্বাস নিয়ে মাও তার আদর্শের পথে এগিয়ে গেছে।

ছত্রিশ সালে কুয়োমিনটাং-এর সহযোগিতায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি চিয়াংকে পত্র দিয়েছিল। চিয়াং এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। মাও ও তার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে স্বয়ং চিয়াং গিয়েছিল সিয়ানে তথাকার জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এখানে তার একজন অনুগত ব্যক্তি তাকে বন্দী না করলে বোধহয় তার মতের পরিবর্তন ঘটত না। চিয়াং অবশেষে সম্মিলিত ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি হল। সাঁইত্রিশ সালে কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে চুক্তি হল জাপানের আগ্রাসনকে রোধ করতে। লালফৌজের নাম হল অষ্টম বাহিনী এবং নতুন একটি চতুর্থ বাহিনী গঠন করা হল। কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতার কারণ বর্ণনা করে মাও সে-তুং তার বক্তব্য পেশ করল জনসমক্ষে। জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে মাও সে-তুং প্রচার চালাতে নির্দেশ দিল। মাওয়ের প্রচারকে স্বাগত জানাল সবাই, হাজার হাজার চাষী শ্রমিক এসে যোগ দিল তার লালফৌজে।

এবারও চিয়াং বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিলম্ব করল না।

বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিক্যান অস্ত্রে বলশালী চিয়াং তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে একচল্লিশ সালে চিয়াং বাহিনী কম্যুনিষ্টদের নতুন চতুর্থ বাহিনীকে আক্রমণ করল। মাও এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য এবারও বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। মাওয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তাকে।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময় মাও সম্মিলিত ভাবে সরকার গঠনের প্রস্তাব দিল চিয়াং কাইশেককে। গৃহযুদ্ধ থেকে যাতে নিস্তার পায় চীনের মানুষ তার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন জানাল মাও কিন্তু চিয়াং কোনক্রমেই কম্যুনিষ্টদের স্বীকার করতে রাজি হল না। মাও

যখন কথাবার্তা শেষ করে ইনানে ফিরে এল তখন চিয়াং আবার আক্রমণ শুরু করেছে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে।

এইখানেই পঞ্চম পর্যায়ের শেষ ও ষষ্ঠ পর্যায়ের আরম্ভ।

বিশ্বযুদ্ধের নেতারা চীনের গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে। তারা আপোষ মীমাংসা চায়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দূত পাঠাল কিন্তু চিয়াং কিছুতেই কম্যুনিষ্টদের স্বীকার করতে রাজি হল না। মাও এবার দৃঢ়তা সহকারে নির্দেশ দিল সর্বাত্মক আক্রমণের। ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হল চীন। একপক্ষ আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট, আরেক দল আত্মসমর্পনকারী জাপানের অস্ত্রে বলীয়ান। পৃথিবীর কোন গৃহযুদ্ধে এত বেশি সৈন্য কোন দেশেই অংশ গ্রহণ করেনি। মাও কোন সময়ই আপোষবিহীন মনোভাব দেখায়নি; সব সময়ই মাও চেয়েছে চিয়াং-এর সঙ্গে মিটমাট করতে কিন্তু চিয়াং-এর দম্ভ ও মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা কোন সময়ই আপোষ করতে দেয়নি।

উনপঞ্চাশ সালের জানুয়ারী মাসে লাল ফৌজ দখল করল পিকিং। মাও আবার আপোষমূলক মনোভাব নিয়ে চিয়াং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল কিন্তু চিয়াং কিছুতেই তার পুরাতন একগুঁয়েমি পরিত্যাগ করল না। মাও লালবাহিনীকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে নানকিং দখল করে কম্যুনিষ্টদের জয় সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিল।

চিয়াং পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল তাইওয়ানে। এইভাবে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটল।

অকটোবর মাসে মাও চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল। চীনে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে ষষ্ঠ পর্যায়ের শেষ। মাওয়ের সাধনার পরম ফলপ্রাপ্তি।

মাও সব সময়ই চিয়াং-এর সঙ্গে সম্মানজনক আপোষ মীমাংসায় উপনীত হবার যে চেষ্টা করেছে তা থেকে মনে হয় মাও গৃহযুদ্ধ এড়াতে চেয়েছে। চিয়াং-এর যুদ্ধবাজনীতি কোন সময়ই মাও গ্রহণ করেনি

এবং ক্ষমতাসান অবস্থায় চিয়াং যে ভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে মাও তা কখনও করেনি। মাও যুদ্ধ করেছে ক্ষমতালাভের জন্য নয়, নিপীড়িত জনসাধারণকে অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে।

পরের বছর মাও সোভিয়েতের সঙ্গে সন্ধি করল বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। মাও এবং লিউ শাও-চি ভূমি সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তার জন্য, ভূমি সংস্কারকে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার না করে কিছুটা উদারতা সহকারে প্রয়োগ করেছিল।

এমন সময় কোরিয়াতে সর্বনাশা যুদ্ধ আরম্ভ হল।

আমেরিকা কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতি দমন করতে দক্ষিণ কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্য নিযুক্ত করল উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে। মাও দেখল মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যদি উত্তর কোরিয়া দখল করে এবং চীনের সীমান্তে এসে যায় তা হলে চীনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হতে পারে, কোরিয়ার পথে চিয়াং তার মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ফৌজ নিয়ে উত্তর চীনে অশান্তি সৃষ্টি করতেও পারে, উপরন্তু উত্তর কোরিয়ার সমাজতন্ত্রী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয় যেতে পারে সেজন্য মাও চল্লিশ লক্ষ স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাল উত্তর কোরিয়াতে মার্কিনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কোরিয়া যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল দেশ গঠনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা। তিপ্পান্ন সালে মাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাজির করল জনসাধারণের সামনে। চীনকে নতুন ভাবে গড়বার নতুন পথ আবিষ্কার করল মাও। প্রাচ্যের প্রভাব পশ্চিমী প্রভাবকে যাতে খর্ব করে তার জন্য মাও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করল, মাও ঘোষণা করল, henceforth the East wind will prevail over the Weast wind ; এশিয়া তথা আফরিকার মানুষকে এগিয়ে চলার ডাক দিল মাও, তার ডাকে সাড়া দিয়ে এশিয়া ও আফরিকার সত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি নানা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করতে থাকে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে চীন নিপীড়িত এশিয়া ও আফরিকাকে নেতৃত্ব দেবার গৌরব লাভ করল।

মাও প্রজাতন্ত্রের শীর্ষব্যক্তি। প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান মাও। উনিশ সাল থেকে তিরিশ বৎসর যাবত যুদ্ধ, জনসংগঠন ও দেশ গঠন নিয়ে কাজ করেছে মাও, এবার সে যেন ক্লান্ত। বয়সও পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হয়েছে। মাও প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতে আর ইচ্ছুক নয়। মাও পরিত্যাগ করল তার চেয়ারম্যান পদ। আটান্ন সালের ডিসেম্বর মাস থেকে অবসর নিল। কিন্তু মাওয়ের অবদান সবাই সমান ভাবে গ্রহণ করেনি, উণষাট সালে লুসানে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে অধিবেশন বসল তাতে পেং তে-হুই মাওয়ের আধুনিকতাকে আক্রমণ করে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করল। পেং-এর বক্তব্যে বুর্জোয়া ঘেঁষা অভিযোগ। পেং তখন দেশরক্ষা মন্ত্রী। তার এই অভিযোগ আলোচনা হল, কেন্দ্রীয় কমিটি পেং-কে ক্ষমা করেনি। তাকে দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করল। পেং মনে করেছিল যেহেতু মাও আর প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান নয় সেজন্য তার অভিযোগ নিশ্চয়ই সমর্থন পাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিন্তু সবাই তো মাওকে অশ্রদ্ধা করে না, মাওয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল প্রায় সকলেরই, তার মহান চরিত্র ও কর্মধারার প্রভাব ছিল জনমনে তথা কেন্দ্রীয় কমিটিতে, সেজন্য মাওয়ের বিরুদ্ধে অবান্তর অভিযোগে সবাই রুষ্ট হল, পেং বিদায় নিল রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা থেকে।

আভ্যন্তরীণ বিষয়ে উন্নতির দ্রুতগতি যতটা লক্ষ্য করা গেছে, বৈদেশিক বিষয়ে অবনতির লক্ষণ দেখা দিল ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষ ও চীনের সীমান্ত নিয়ে মন কষাকষি চলতে থাকে, রাশিয়া চীনের দাবীকে অহেতুক ও অযৌক্তিক মনে করত, সেজন্য চীন ও রাশিয়ার সম্পর্কে ফাটল দেখা দিল। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই সর্ব প্রথম চীন রাশিয়ায় মতানৈক্য।

পরের বছরে সোভিয়েত থেকে যে সব কারিগর এসেছিল চীনের বড় বড় শিল্প ক্ষেত্রে সাহায্য করতে, রাশিয়া তাদের ফেরত নিয়ে গেল নিজেদের দেশ। যাট সালে মসকোর কম্যুনিষ্ট সম্মেলনে চীন ও রাশিয়ার

দ্বন্দ্ব দেখা দিল। রাশিয়া শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র লাভের যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে বাধা দিল চীন। রাশিয়ার এই নীতিতে চীন ক্ষুব্ধ হল, রাশিয়া যে শোধণবাদীতে পরিণত হচ্ছে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হল না। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রমেই তিক্ততা সৃষ্টি হল। কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের ভাসিয়ে না দিয়ে চীন আপোষকামী মনোভাব দেখাল। একষট্টি সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই গেল রাশিয়াতে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে যোগ দিতে। চৌ মার্শাল স্টালিনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক স্থাপন করল, তারপরই হঠাৎ ফিরে এল পিকিং-এ।

চীন সোভিয়েত সম্পর্কের কোন উন্নতি ঘটলনা। চৌ এন-লাইয়ের রাশিয়া পরিত্যাগের পেছনে ছিল মতবাদের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব ভাল ভাবে প্রকাশ পেল।

পরের বছর মাও শ্রেণী সংগ্রামের ওপর জোর দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে জাতিকে শ্রেণী সংগ্রাম না ভুলতে আহ্বান জানাল।

চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে ইতিমধ্যেই, এবার ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নষ্ট হল ভারত সীমান্তে চীন-ভারত সংঘর্ষে। চীন সীমানার পুনর্বিন্যাস চায়, ভারতবর্ষও চায় সীমানা চিহ্নিত করতে। এই বিষয়ে উভয় পক্ষই অপর পক্ষের বক্তব্য ও দাবীকে স্বীকার করতে না চাওয়াতে হানাহানি আরম্ভ হল। ভারত গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বলে দাবী জানিয়েছে, কিন্তু এই আক্রমণের সময় দেখা গেল শক্তিশালী চীনবিরোধী রাষ্ট্রের পক্ষপুটে ভারত আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আর মধুর হয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক—সম্মিলিতভাবে এই অশান্তি সৃষ্টি করেছিল এটা কিছুকালের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সবার কাছেই। এতে চীনের বৈদেশিক নীতির যেমন অপযশ তেমনি ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নেতৃত্বের পশ্চাদপসরণ।

কেবলমাত্র ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, চীনের বৈদেশিক নীতির ত্রুটির

জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে ইন্দোনেশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও ব্যাহত হয়েছে। চীনের ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল প্রতি-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের পথ রোধ করতে, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে অপর দেশেও তা যাতে কার্যকরী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার মত পরিবেশ তৈরীর প্রস্তাব রাখা উচিত ছিল। সে কাজ হয়নি বলেই ইন্দোনেশিয়ার মার্কিন অর্থ ও অস্ত্রপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে কঠিন আঘাত হেনেছে।

ঘানার বিষয়েও চীনের দ্বিধা এবং নক্রুমার অস্থির সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি নক্রুমাকে প্রতিক্রিয়াশীলদের আঘাত সহ্য করতে বাধ্য করেছে। এইভাবে বহুক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতির পথ রুদ্ধ হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাওয়ের নীতি হল, শ্রেণী সংগ্রাম চলুক, উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রাম চলুক আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলুক, তাতেই চীনের উন্নতি, সর্বহারার একনায়কত্বের সাফল্য।

রাশিয়ার নীতি চীন সমর্থন করতে পারেনি। রাশিয়া বিপ্লবের পথ ছেড়েছে, শোধনবাদের দিকে ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছে, ফলে সারা বিশ্বের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। মাও এ-বিষয় লক্ষ্য করে সোভিয়েত রাশিয়াকে সতর্ক করে জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মৃত্যু ঘটলেও এশিয়া, আফরিকা আর লাতিন আমেরিকা হবে বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্র। এই ঝড়ের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে এই তিন মহাদেশে। বিশ্ব জুড়ে যে বিপ্লবের জোয়ার বইছে এবার তার নেতৃত্ব দেবে এশিয়া, ইউরোপ নয়।

চৌষট্টি সালে সোভিয়েত রাশিয়ার কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলন বসল। এতকাল চীন সোভিয়েত রাশিয়ার কার্যকলাপ নিয়ে বিপরীত সমালোচনা করেছে, এবার সোভিয়েত রাশিয়া চীনের কাজের তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করল। তারাও বলল, মাও একজন ডিকটেটার। এই ডিকটেটরী নিন্দাযোগ্য এবং এ থেকেই চীনের পতন হবে। তত্ত্বের

দিক থেকে রাশিয়া স্বীয় নীতিকে সমর্থন করল, আর চীনের নীতির প্রতিবাদ জানাল।

মাও সোভিয়েতকে আক্রমণ করল তার প্রবন্ধ দিয়ে। রাশিয়া ক্রমাগত যে ধনতন্ত্রের পথে এগোচ্ছে তার উদাহরণ দিয়ে মাও বলল, সোভিয়েত রাশিয়া মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং শ্রেণীস্বার্থকে বড় করে দেখছে। এই ঘটনা চীনে কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। মাও তার বক্তব্যকে জোরদার করতে বহু উদাহরণও দিয়েছিল। সোভিয়েতকে নিন্দা করে মাও "Khrushchev's Phoney Communism and its lessons for the world"—নাম দিয়ে যে সম্পাদকীয় লিখল তাতে সোভিয়েতের প্রতি চীনের দৃঢ় মনোভাব পরিস্ফুট হল।

পঁয়ষট্টি সালে তত্ত্বগত এই আলোচনা সমালোচনা, তর্ক, বিতর্ক, নিন্দা ও প্রশংসার সাময়িক বিরতি ঘটল। ইতিমধ্যে আমেরিকা উত্তর কোরিয়াতে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করেছে। জেনেভা চুক্তি অমান্য করে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামের তথাকথিত সরকার যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল মুক্তিফৌজদের বিরুদ্ধে তাকে জোরদার করতে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য হাজির হল দক্ষিণ ভিয়েতনামে। অবশেষে কোনক্রমেই যখন উত্তর ভিয়েতনামকে দমন করতে পারল না তখন আমেরিকা নিষ্ঠুর ভাবে সমস্ত বৈদেশিক চুক্তি ও ভদ্রতা লঙ্ঘন করে এবং বিশ্বজন স্বীকৃত "International law কে অমান্য করে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ শুরু করল। বিশ্ব জনমত ক্ষুব্ধ হল কিন্তু মার্কিন সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্র এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও সাহস পেল না। ফলে চীনের সীমানার কাছে এসে মার্কিন বিমান বোমা বর্ষণ করতে থাকে। চীন প্রতিবাদ জানাল, উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করল। বকলমে যুদ্ধ হচ্ছে এখনও, একদিকে সরাসরি মার্কিন সৈন্য অপর দিকে চীন ও সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট উত্তর কোরিয়া।

পঁয়ষট্টি সালেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বীজ রোপিত হল। পিকিং-এর

ভাইস-মেয়র বুঝতে পারল সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি ভাবে চীনের বর্তমান অবস্থাকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করতে পারে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম বিদ্রোহ করল, ধীরে ধীরে সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ। মাও সে সময় পিকিং-এ উপস্থিত ছিল না। পিকিং-এ এসে মাও সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে বিপ্লবের উপযোগিতা স্বীকার করল এবং নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ছেষট্টি সালে মাও ঘোষণা করল, "Bombard Head-quarters"—চীনের কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি মাওয়ের ষোল দফা দাবী স্বীকার করল এই বিপ্লবের সমর্থনে। মাওয়ের নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ রেডগার্ড সমবেত হল পিকিং-এ, মাও তার বক্তব্য রাখল তাদের সামনে। পর বৎসর সাংস্কৃতিক বিপ্লব নতুন রূপ নিল, কর্মী, রাষ্ট্র ও পার্টির সম্মিলিত কমিটি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র নেতা ও পার্টির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। প্রেসিডেণ্ট লিউ শাও-চির বিরুদ্ধে তত্ত্বগত আক্রমণ আরম্ভ হল, সবাই লিউকে "চীনের ক্রুশ্চেভ" আখ্যা দিয়ে লিউয়ের কার্যাবলীর নিন্দা আরম্ভ করল। পরবর্তী বৎসরে লিউ শাও-চিকে বিশ্বাসঘাতক, ধনতন্ত্রী ও নীতিহীন বলে নিন্দা করল সমগ্র দেশ। লিউ বিদায় নিল তার প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে। উনসত্তর সালের আগেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করল। মাওয়ের জীবনে সপ্তম পর্যায় আরম্ভ হল তখন থেকে।

মাওয়ের কর্মজীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের বাইরেও কিছু রয়ে গেছে। সে সব নিয়ে নানা আলোচনাও হয়েছে। মাওয়ের রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা মাওয়ের মতকে সমাজতান্ত্রিক তথ্যের দিগ্‌দর্শক মনে করে। এই তথ্যকে তারা নতুন আখ্যা দিয়েছে মাওইজম্। লেনিন, স্টালিন, প্রভৃতির মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার মতের মোটেই বিরোধিতা নেই কেবল-মাত্র প্রয়োগবিধিতে তারতম্য।

মাও রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস মনে করে বন্দুককে। এ বিষয়ে সকলে একমত নয়। মাওয়ের জীবন ও কর্ম আলোচনা করলে দেখা

যায় মাও সব শক্তির মূল আধার মনে করত জনসংগঠন। এমন কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় 'Triple union' সৃষ্টি করে ক্ষমতা রাষ্ট্র ও পার্টির হাতে না রেখে জনসাধারণকে (শ্রমিক ও চাষীকে) তার অংশীদার করে নিয়েছিল। কিউবাতে দেখা গেছে ফিদেল কাস্ত্রো মুক্তিযুদ্ধের জন্য সর্বপ্রথম অস্ত্র ধারণ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জনসংযোগ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছিল কিন্তু মাও সর্বপ্রথম জনসংযোগ করেছিল, জনতাকে বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত করে তারপর তাদের হাতে হাতিয়ার দিয়ে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মাওয়ের পথই যে সঠিক পথ তা প্রমাণিত হয়েছিল বলিভিয়াতে। চে গুয়েভারা সশস্ত্র বিপ্লবের মত ভূমি তৈরী না করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়াতে তার চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল। আবার মানুষের মনকে তৈরী না করে ফাঁকা বিপ্লবের বুলি শুনিয়ে এবং প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালি করে ইন্দোনেশিয়াতে আইদিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিত আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সব দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের যে অগ্রগতি বাধা পাচ্ছে তার মূলে রয়েছে মার্কস ও লেনিন প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুতি, তার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ।

সোভিয়েত সম্পর্কে মাওয়ের কিন্তু চিরকালই বিরূপ মনোভাব ছিল না। চীনের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত মাঝে মাঝে মাতব্বরী করলেও বাস্তবত কোন সাহায্যই করেনি, তবে মানচুরিয়াতে যখন জাপান আত্মসমর্পণ করে তখন সোভিয়েত জেনারেল চু টের হাতেই জাপানীদের সমর্পণ করে, অবশ্য এতেও সোভিয়েত প্রথমে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। জাপানের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে কম্যুনিষ্টদের আরও বহুকাল হয়ত যুদ্ধ করতে হতো চিয়াং শক্তিকে নির্মূল করতে।

মুক্তিযুদ্ধ সাফল্যলাভ করার পরই চীন সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাদের সম্পর্কও মধুর ছিল।

মাও সাতান্ন সালে অকটোবর বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপনে মসকোতে গিয়েছিল। সেই সময় তার মনোভাব ছিল সোভিয়েতপন্থী। মাও বলেছিল ঃ

"সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নেতা হল আমেরিকা। সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়ার নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রয়েছে একমাত্র রাশিয়ার। যদি আমাদের কোন নেতা না থাকে তা হলে ঐক্যবোধ থাকবে না। চৌষট্টিটি দেশের সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি আজ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছে, এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে পৃথিবীর সকল কম্যুনিষ্ট ও শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ এবং সোভিয়েত রাশিয়া হল সকলের কেন্দ্র। সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের দ্বন্দ্বে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমী শক্তির প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রাচ্যের সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

মাওয়ের হিসাব মত পৃথিবীর ২'৭০ বিলিয়ন জনসংখ্যার এক বিলিয়ন বাস করে সমাজতান্ত্রিক দেশে, সাতশত মিলিয়ন লোক এখনও সংগ্রাম করছে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে। সমাজতান্ত্রিক শক্তি কত দ্রুত প্রসারলাভ করছে তা এই অঙ্ক থেকেই জানা যায়।

সাম্রাজ্যবাদ! বাপরে। সহ্য করা যায় না, বলল মাও।

কেন? কেন? প্রশ্ন করল তার বিরোধীরা।

সাম্রাজ্যবাদের শীর্ষ হল আমেরিকা। তার বৈদেশিক নীতি অনুধাবন কর।

বিরোধী সান লি বলল, আমেরিকা না থাকলে ভারতকে অনাহারে থাকতে হতো তা বিশ্বাস কর কি, ভারত নয় পৃথিবীর বহু দেশকেই ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে মার্কিন উদারতা।

মাও হেসে বলল, আমেরিকাকে স্বার্থহীন মহাপুরুষ তোমরা মনে করতে পার কিন্তু তোমরা জান কি ভারতকে সাহায্য দেবার সঙ্গে রাজনৈতিক সর্ত হল উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ।

উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণকে আক্রমণ করেছে, সে ক্ষেত্রে আমেরিকা সর্ত আরোপ করতে পারে, সেটা তো অন্যায় নয়।

গুরুতর অন্যায়। আমেরিকা যুদ্ধ করছে মহান নেতা হো-চি-মিনের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ চলছে মার্কিনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী তুনিয়ার ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রের। দক্ষিণ ভিয়েতনাম উপলক্ষ মাত্র। আমেরিকার কোন অধিকার নেই এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা, এটা নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম বিরুদ্ধ, বিশ্বরাষ্ট্রের সনদ বিরুদ্ধ। এতেও যদি অন্যায় না হয় তা হলে ভারত যদি উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য করে তাতেই বা অন্যায় কোথায়! দ্বিতীয়ত উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ যোগ দেবে এটা কোন নীতি স্বীকার করে না। এসব অন্যায় জেনও মার্কিন যুদ্ধবাজদের নিন্দা করতেও পশ্চিমী শক্তিরা অনিচ্ছুক। অন্যায় কোথায় তা তোমরাই স্থির কর।

কিন্তু আমেরিকাকে যতই ধনতন্ত্রী বল স্বদেশে আমেরিক্যানরা ধন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ও সুখী।

মাও বাধা দিয়ে বলল, এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইনডিয়ানদের প্রায় নির্মূল করেছে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্য-বাদীরা আর নিগ্রোদের তুরবস্থার শেষ নেই। একজন নিগ্রো নেতা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে কিউবাতে আশ্রয় নিয়েছে।

ওরা সমাজবিরোধী।

মোটেই নয়। উত্তর কারোলিনার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আমাকে তু-তুবার নিগ্রোদের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে বলেছে, তারা যে ভাবে আন্দোলন করছে নিগ্রোদের রক্ষা করতে তার জন্য আমি এবং সমগ্র চীন সহানুভূতি ও সমর্থন নিশ্চয়ই জানাব। উনিশ মিলিয়ন আমেরিক্যান নিগ্রো কেবলমাত্র গাত্রচর্ম কৃষ্ণ এই অপরাধে যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে তার তুলনা নেই। অথচ আমেরিকা নিজের গৃহকে ক্লেদমুক্ত না করে স্বাধীন বিশ্বের স্বপ্নে মেতে দিকে দিকে হাহাকার সৃষ্টি করেছে অস্ত্রের ঝনঝনায়। নিগ্রোদের বিনা কারণে গ্রেপ্তার করছে, প্রহার করছে, হত্যা করছে আর একাজ যেমন করছে আমেরিকার রাষ্ট্র নেতারা তেমনি করছে বর্ণ বিদ্বেষী

Ku Klux Klan নামক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান। কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যেও চেতনা জেগেছে, তারা দিনের পর দিন প্রতিবাদ করছে। বাধা দিচ্ছে এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বন্ধ করতে। অথচ আমেরিকার রাষ্ট্র নায়করা মানুষের প্রতি মানুষের এই বর্বর আচরণ নিবারণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

আমাদের মনে হয় এটা অতিরিক্ত উদ্দেশ্যমূলক প্রচার।

তোমরা তা বলতে পার। সাতান্ন সালে নিগ্রো সন্তানদের শ্বেতাঙ্গদের বিদ্যালয়ে পড়তে না দেওয়ার জন্য লিটল রকে নিগ্রোরা আন্দোলন করেছিল। আন্দোলন দমন করতে আমেরিক্যান সৈন্যরা গুলী চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করে। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রোদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়, তাদের সম্পত্তি লুঠ করে এবং নারীর মর্যাদাহানি করে। সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে এই অন্যায় করেছে এবং শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন জানিয়েছে। এটা উদেশ্য মূলক প্রচার অথবা ঘটনা কি তা তোমরা বলতে পার। বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নিগ্রোরা আন্দোলন করছিল। আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করা হল, প্রহার করা হল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নেতা মেগার এভারসকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল শ্বেতাঙ্গরা। সর্বশেষ উদাহরণ হল মার্টিন লুথারকে হত্যা। কাপুরুষের মত এই হত্যাকে পৃথিবীর সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি ধিক্‌কার দিয়েছে। এরপরও বলতে চাও আমেরিকায় আভ্যন্তরীণ শান্তি আছে। অথবা সেখানে গণতন্ত্র আছে, অথবা সেখানে সাম্য আছে, অথবা সেখানে মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সাম্রাজ্যবাদীদের ভজনা করছে যারা তারা ওদেরই গোষ্ঠী এবং কায়েমীস্বার্থের বাহক। এই সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণ্য, একে আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।

রাজনৈতিক তথ্য জটিল। তাকে কত সহজ করে জনতাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য মাও নানা রকম উদাহরণ তুলে ধরত জনসাধারণের সম্মুখে।

জনসাধারণ আর পার্টি কর্মীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে মাও বলল, পার্টি কর্মীরা হল জলের মাছ। জল না হলে মাছ বাঁচতে পারে না, তেমনি জনসাধারণ না হলে পার্টি কর্মীরাও বাঁচতে পারে না। জল হল জনসাধারণ আর মাছ হল পার্টি কর্মী।

আবার একবার মাও বলল, ডিমে তা দিলে বাচ্চা ফোটে। কিন্তু পাথরকে ডিমের মত সাইজ করে হাজার বছর ধরে তা দিলেও তা থেকে বাচ্চা জন্মাতে পারে না। তেমনি তথ্য যদি নির্ভুল না হয় তা হলে হাজার বছর ধরে সেই তথ্য নিয়ে আন্দোলন করলেও কোন ফল লাভ হয় না। মূল বস্তুটি ঠিক থাকাই হল আসল কাজ।

আরেকবার বলল, নারী ও পুরুষ সহবাস না করলে যেমন সন্তান সৃষ্টি হয় না, তেমনি জনসাধারণ ও তত্ত্বের সমন্বয় না ঘটলে সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হতে পারে না।

মাও বলল, এক ডাকাত ছিল। সে অনেক টাকা লুঠে আনত। দেশের গরীব মানুষেরা তার কাছে এলেই তাদের সাধ্যমত সাহায্য করত। ডাকাত খুব জনপ্রিয়। দেশের গরীব জোয়ান ছেলেরা এসে যোগ দিত তার দলে। এই উদার ডাকাতকে অনেকে কিছুটা ভালও বাসত, কারণ তারা তার সাহায্য পেত।

ডাকাত ধরা পড়ল। বিচারে তার ফাঁসি হল। দল ভেঙ্গে গেল। গরীব মানুষ যারা তারা বেদনাবোধ করল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল ডাকাতের কথা সবাই ভুলে গেছে। শুধু মনে রেখেছে তারাই যাদের বাড়িতে ডাকাতি করেছিল। যারা মনে রেখেছে তারা তাকে ঘৃণা করত।

কিন্তু ডাকাত কি সমাজের সত্যিই কোন উপকার করেছিল?

না।

কারণ!

কারণ আমাদের দেশের জমিদাররা শোষণ করেছে চাষীদের। তারপর কেউ একটা পুকুর কেটেছে, কেউ হয়ত গ্রামের একটা ছোট

রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে, হয়ত সপ্তাহের কোন একটা দিনে অথবা কোন বিশেষ পরবে ওদের খেতে দিয়েছে। এতে অনেকেই তার জয়গান করেছে। কিন্তু আসলে সে-ও আরেকটা ডাকাত। শাসনক্ষমতা ওদের হাতে ছিল বলে আইনে আশ্রয়ে বসে ডাকাতি করেছে, আর সেই গল্পের ডাকাতের হাতে শাসনক্ষমতা ছিল না বলেই সে হল বে-আইনী ডাকাত। চরিত্রগত পার্থক্য কোথাও নেই। এরা সমাজের কোন উপকার করেনি, করতেও পারে না। এরা পরবর্তীকালে ঘৃণ্য বলেই পরিচিত হয়েছে।

মাওয়ের ব্যক্তিত্ব ভাল ভাবে পরিস্ফুট হয় তার কবিতায়। কবিতার প্রতিটি ছত্র যেমন বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তেমনি মানুষের প্রতি দরদের ছবি ফুটে ওঠে। রণক্ষেত্রে বসে মাও যে সব কবিতা লিখেছে তা অনবদ্য ও অনিন্দ্যনীয়।

মাওয়ের জীবন নিয়ে পৃথিবীর বহু মনীষি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই সব গ্রন্থ কেউ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে লিখেছেন, কেউ তার লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে লিখেছেন। যারা তার বিরোধী তারা বিরূপ সমালোচনা করেও মাওকে বিংশশতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, সমরবিশারদ, কবি ও মনুষ্যপ্রেমী বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে মাওকে পরিবেশ উপযোগী বিভিন্ন অবস্থায় তাকে দেখা গেছে। সেই অবস্থার ক্রমোন্নতিও দেখা গেছে। সে জন্য মাও সম্বন্ধে হঠাৎ একটা মতামত দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। যারা তা করে তারা অর্বাচীন ও মূর্খ। বিতর্কিত প্রতিভার ধারক এই মানুষটি যে বর্তমান যুগের উন্নত জীবনের পথপ্রদর্শক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার সময় মাওকে বহু অপ্রিয় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষ করে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর যে সব যুবক বিপ্লবের ধূয়া তুলে লাল পতাকার তলায় আশ্রয় নিয়েছিল

তারা কোনক্রমেই বিশ্বাস করেনি মাওয়ের কাজ বিপ্লবকে কোন প্রকারে সাহায্য করবে।

ঐ নেংটি ইঁদুরগুলোর ক্ষমতা কতটুকু বলতে পার? প্রশ্ন করেছিল ওয়াং।

মাও হাসতে হাসতে বলেছিল, কাকে তোমরা নেংটি ইঁদুর মনে করছ বন্ধু? অনাহারী শোষিত কৃষকদের? এ ধারণা তোমাদের ভুল। চীনের এই বঞ্চিত কৃষকরা অতি শীঘ্রই তুফান সৃষ্টি করবে, সেই তুফানে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে ধনীর উচ্চ সৌধ।

এ তোমার আকাশকুসুম কল্পনা।

তোমরা তাই মনে করবে। আমার কথায় আস্থা রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই কৃষক সংগঠনের শক্তি তোমরা শীগগীর দেখতে পাবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই এই কোটি কোটি লোকের শক্তিকে রোধ করবার। এরা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যুদ্ধবাজের শক্তি, দুর্নীতি-পরায়ণ আমলা গোষ্টিকে কবরে ঠেলে দেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বন্ধুরা হেসেছিল।

কিন্তু যেদিন চিয়াং-এর ভাড়াটিয়া সৈন্য দল ছেড়ে মাওয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, সে দিন দেখা গেল সৈন্যরা আর ভাড়াটিয়া পেশাদারী সৈন্য নয়।

বন্ধুরা বলেছিল, এদের বেতন না দিলে কাজ করবে না। পালিয়ে আসবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

মাও বলল, আদর্শ এদের তেজীয়ান করবে, বিশ্বস্ত করবে। আমরা এদের আহার্য আর ব্যক্তিগত কিছু খরচের বেশি তো দিতে পারব না। এরা যদি ভাড়াটিয়া পেশাদার সৈনিক হয় তা হলে কেন এরা আসবে আমাদের লালফৌজে। এরা জেনেই এসেছে, এরা এসেছে আদর্শকে রূপদান করতে। তার জন্য বুকের রক্ত দেবে এরা।

কেন করবে?

এদের শ্রেণী সচেতন করতে হবে। কমপক্ষেও ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা, আমাদের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা, শ্রমিক ও কৃষকদের কিভাবে লড়াইয়ের যোগ্য করা যায়—এ সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এরা এর মধ্যেই জানতে পেরেছে, এরা কোন রাজার অথবা ডিকটেটরের স্বার্থরক্ষা করতে যুদ্ধ করছে না, কোন শ্রেণী বিশেষের স্বার্থরক্ষার এরা প্রহরী নয়। এরা জানে, নিজের স্বার্থে, শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে এরা সংগ্রাম করছে। এই আদর্শে যারা অনুপ্রাণিত তারা সব রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করেই সংগ্রাম করে ও করছে।

তোমার সৈন্যবাহিনী যে সম্প্রদায় থেকে এসেছে তাদের ওপর ভরসা করা উচিত হবে না মাও।

আমি বিশ্বাস করি ওদের। মানুষকে যারা বিশ্বাস করে না, জনসাধারণের ওপর যাদের শ্রদ্ধা নেই তাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই। আমাদের সৈন্য ছয়টি শ্রেণী থেকে এসেছে। প্রথমটি হল ইয়ে আর হো'র যে সব সৈন্য ছিল তারা এসে যোগ দিয়েছে। দ্বিতীয়টি হল উচাং-এর রক্ষীবাহিনী, তৃতীয়টি লিউয়াং আর পিকিয়াং-এর জঙ্গী কৃষক সম্প্রদায়, চতুর্থটি আমার নিজের প্রদেশের জঙ্গী কৃষক ও শ্রমিক, পঞ্চম দফায় এসেছে জেনারেল সু কে-সিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর বন্দী সৈন্য থেকে, আর শেষ দফায় এসেছে সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী থেকে। আমাদের মেরুদণ্ড হল প্রথম চারটি দেশ। কিন্তু বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই বাহিনীর সংখ্যা কমে গেছে। তবুও তারাই আমাদের চতুর্থ ফৌজ-বিভাগের শক্তির উৎস।

তোমার সৈন্য সংখ্যা তো দিন দিন কমছে।

কমছে ঠিকই আবার নতুন নতুন জোয়ান ছেলে এসে যোগ দিচ্ছে আদর্শের আমন্ত্রণে। এদের ছয় মাস করে ট্রেনিং দিয়ে আবার শূন্যস্থান পূর্ণ করছি। কিন্তু সব সময় আমাদের সৈনিকদের ছয় মাস দূরের কথা ছ দিনও ট্রেনিং দেবার সুযোগও পাইনা। আজ যে দলে এসেছে কালই তাকে বন্দুক কাঁধে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়েছে। এর ফলে

সমর বিদ্যায় এরা অনেক পিছিয়ে আছে। চিয়াং-এর বাহিনীর চেয়ে এরা অনেকাংশেই হীন, কিন্তু এদের একটি জিনিস আছে যা চিয়াং বাহিনীর নেই। সেটি হল এদের সাহস। এই সাহসই এদের অজেয় করে তুলেছে।

তাহলেও এদের রসদ জোগাতে তো পারছ না। বিনা রসদে এরা লড়াই করবে কি করে। এরা তো বলীর পাঁঠা, এদের তুমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ।

রসদের কথা স্বীকার করছি। আমাদের অর্থ নেই তাই প্রয়োজনীয় পোষাক, প্রয়োজনীয় খাবার, প্রয়োজনীয় বাসস্থান এদের দিতে পারছি না। তা বলে তাদের মৃত্যুর মুখে আমি ঠেলে দিচ্ছি না। আমাদের সৈন্য ক্ষয়ের তুলনায় চিয়াং-এর সৈন্যক্ষয় দশ গুণ। আমার সৈন্যদের মাথা পিছু খাবারের জন্য পাঁচ সেণ্টের বেশি ব্যয় করতে পারি না। চাল কিনতেই পয়সা ফুরিয়ে যায়। তরিতরকারী মাছ মাংস হল এদের কাছে বিলাস। মাসে দু একদিন কোন রকমে সংগ্রহ করে দেই। সেজন্য আমরা দুঃখিত কিন্তু আমাদের ফৌজ হাসিমুখে এই অসুবিধা সহ্য করে, কষ্ট স্বীকার করে, দুর্দশাকে মাথায় পেতে নেয়। আমাদের বর্তমানে যে খাবার ব্যবস্থা তাও অনেক সময় দিতে পারি না। তখন ওদের কষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ওরা জানে, ধনতন্ত্রকে নির্মূল করতে পারলেই পেট ভর্তি খেতে পাবে তাই সুদিনের প্রতীক্ষা করছে।

তুমি যা মনে করছ মাও তা হবে না। এই সৈন্য বাহিনী পেটভর্তি খেতে না পেলে পালিয়ে যাবে, বিদ্রোহ করবে।

মাও গম্ভীর ভাবে বলল, তাও চিন্তা করেছি। আদর্শ মানুষকে মহৎ কাজে টেনে আনে, আদর্শের জন্য প্রাণও দেয় কিন্তু তাদের রুটি যদি না দেওয়া যায় পেটের জ্বালায় তারা হতাশ হয়ে পড়তেও পারে। সেই জন্যই আমরা যে ব্যবস্থা করেছি তাতে কারও কোন অভিযোগ করার সুযোগ নেই। আমাদের শোচনীয় পোষাক পরিচ্ছদ, নিকৃষ্ট শ্রেণীর আহার্য ও ভাঙ্গা বন্দুকের সঙ্গে তারা পেয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার ও

সাম্যবোধ। অফিসাররা সৈন্তদের ওপর কোন রকম অত্যাচার করে না, অফিসার ও সৈন্তদের আহার্য একই প্রকার, সর্বক্ষেত্রে অফিসার ও সৈন্তরা আমাদের কাছে সমান ব্যবহার পায়, কোন তারতম্য করা হয় না, সৈন্তরা নিজেদের মধ্যে সভা করতে পারে, নিজেদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কতকগুলো অর্থহীন নিয়মকানুন রদ করাও হয়েছে। অফিসার, পার্টি মেম্বার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যাতে শ্রেণীগত কোন বিসম্বাদ না ঘটে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা জানার অধিকার সবার আছে। কারও মনে যেন সন্দেহ না জাগে। কেউ যেন মনে না করে যে ক্ষমতাবান যারা তারা বেশি সুখ সুবিধা নিচ্ছে। সাধারণ সৈনিকদের প্রতিনিধি আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিদর্শন করার অধিকারী। এতে সৈনিকদের মধ্যে কোন প্রকার অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারেনি। বিশেষ করে চিয়াং-এর যে সব বন্দী সেনা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তারা আমাদের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে। গতকাল তারা যেখানে ছিল সেখানে গণতন্ত্রের চিহ্নও ছিল না, আর আজ যেখানে তারা এসেছে সেখানে তার ব্যক্তি-সত্বাকে সম্মান দেখিয়ে গণতন্ত্রী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এতে কোন সুফল হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

ভুল করছ বন্ধু। গতকাল যে সৈনিক হতাশা নিয়ে চিয়াং-এর দলে যুদ্ধ করেছে, তারা আজ আমাদের দলে এসে বেশি উৎসাহ নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এ রকম শত শত উদাহরণ রয়েছে। এ থেকেই তো বুঝতে পারছ আমাদের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওরা কতটা খুশী হয়েছে। চীনে শুধু চাষী আর শ্রমিকদেরই গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, গণতন্ত্র সৈন্যবিভাগেও প্রয়োজন এবং তারই প্রয়োজন বেশি (In China not only the masses of workers and peasants need democracy, but the army need it even more urgently.—Mao) গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিয়ে আমরা সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু ঘটাতে পারব।

গণতন্ত্রী সৈন্যের ক্ষমতা যে কত তা বর্ণনা করতে মাও শোনান তার নিজের লেখা কবিতা :

পাহাড়ের চূড়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে আমাদের ঝাণ্ডা,
গিরি শীর্ষে ধ্বনিত হচ্ছে আমাদের বিউগিল ও যুদ্ধ বাদ্য,
শত্রু বেষ্টন করেছে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে,
আমরা অচল অটল, নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করতে।

আমাদের রক্ষা ব্যূহ দৃঢ় প্রাকারের মত শক্তিমান,
আমাদের মনের শক্তি অজেয় দুর্গের মত দাঁড়িয়ে,
গর্জে উঠল আমাদের কামান, ছুটল গোলাগুলী,
রাতের অন্ধকারে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে শত্রু সৈন্য।

লালফৌজের শক্তি সম্বন্ধে মাওয়ের এই কবিতাই যথেষ্ট প্রমাণ। মাও বিশ্বাস করত তাদের, শ্রদ্ধা করত তাদের তাই বিরুদ্ধ সমালোচনার মুখেও নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

কেন যুদ্ধ ?

যুদ্ধই তো রাজনীতি, রাজনীতির বহিঃপ্রকাশই যুদ্ধ। পৃথিবীতে আজ অবধি এমন কোন যুদ্ধ হয়নি যার পটভূমিকায় কোন রাজনীতি নেই। জাপান চীনকে আক্রমণ করেছিল কেন ? রাজনীতির খোরাক জোটাতে। অর্থনীতির গর্ভজাত রাজনীতি সম্প্রসারণ চায় তাই তাকে রুখতে সমগ্র চীন একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিল। চীনের জয় তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এ জয় এসেছে তাদের জনসাধারণ, যোদ্ধা, কৃষক, শ্রমিক সবার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায়। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহায়তাও ছিল, ছিল সম্মিলিতভাবে কাজ করার নীতি। এই সব মিলিয়েই তো রাজনীতি। এই রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল, অংশীদার ছিল চীনের আপামর জনসাধারণ। এ থেকে বাদ দেওয়া হয়নি যোদ্ধা অথবা কৃষক অথবা চাষী অথবা জনসাধারণকে। কিন্তু জাপানী সৈন্য এসেছিল প্রভুর

হুকুম :তামিল করতে। রাজনীতি শুধু প্রভুদের, সৈন্যদের শুধু হুকুম তামিল করাই ধর্ম। তাদের কোন রাজনীতি নেই, তারা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভ্রম চীনে ঘটেনি তাই জাপানকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, চীনকে জয়ের পথে নিয়ে গেছে। যুদ্ধ আর রাজনীতি অচ্ছেদ্য। যোদ্ধাদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ভ্রম।

সুয়ান চি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রামে ফিরে এসেছিল।

গ্রামে আসার সময় বিশেষ নির্দেশ ছিল তার গ্রামের লোকদের গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝিয়ে বলতে হবে। সুয়ান ফিরে এসে সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করল।

গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক তে-হুয়াই একদিন বলল, ওহে ছোকরা আমি তো শুনেছি তুমি লালফিতে বাঁধা ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছ, কোন সাহসে তুমি এসেছ এই গ্রামে। পুলিশ খবর পেলে তোমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। বড় বড় বুলি দিয়ে মানুষের মাথা খেও না।

সুয়ান চি বলল, মাষ্টার তুমি খাঁটি কথা বলেছ। কিন্তু আমি যদি মানুষের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলি তাতেই বা তুমি এত খেপে উঠছ কেন। আমি যে ডাকাতের দলে যোগ দিয়েছি এ-সুসংবাদটাই বা কে তোমাকে দিল?

খবর কি গোপন থাকে।

আমিও তো শুনেছি তুমি নাকি লাল দস্যুদের রসদ জোগাচ্ছ কিছু কাল থেকে।

অবাক হয়ে তে-হুয়াই বলল, আমি?

তুমি না হয়ে আর কেউ কি? বলছি তো তোমাকে। আমি যাচ্ছি পুলিশ ফাঁড়িতে। দেখি কার কথা কে বিশ্বাস করে।

তে-হুয়াই সত্যিই ভয় পেল। ছোড়াটা ছোট বেলা থেকেই গোঁয়ার। কি করতে কি করে তারই বা ঠিক কি। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল মিথ্যা খবর দিয়ে তাকে নাজেহাল করতে পারে। কি লাভ সুয়ান।

বেশ, তুমি যখন বলছ লাল ডাকাতের দলে নেই তখন তো বলার কিছু নেই। আমিও ভেবেছি তোমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে, শত্রু তোমার অনেক আছে দেখছি। তা বাপু যা ইচ্ছা কর, আমাকে আর ফ্যাসাদে টেনে নিওনা।

স্নুয়ান হেসে বলল, মাষ্টারের ধর্মবুদ্ধি আছে দেখছি। এমন বেয়ারা কথা আর বলনা মাষ্টার। মন না মতি, মতি হল কুমতি। মেজাজ খারাপ হলে ভাল না হয়ে মন্দও হতে পারে।

স্নুয়ান গেল তে-হুয়াইয়ের বাড়িতে। তার মেয়ে চিং-ফেন স্নুয়ানকে দেখে একগাল হেসে বলল, বাবার সঙ্গে কি আলোচনা করছিলে স্নুয়ান ?

রাজনীতি।

মানে ?

মানে তোমার বাবা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার ভয় দেখাচ্ছিল।

কারণ ?

কারণ, আমি লাল ডাকাত দলে যোগ দিয়েছি।

বললাম তার আগেই আমি গিয়ে পুলিশকে বলে আসব তে-হুয়াই রসদ জোগাচ্ছে লাল ডাকাতদের। তারপরই তার গলার সুর পর্যন্ত বদলে গেল।

এমন কথা না বললেই হতো।

রাজনীতি তুমি বুঝবে না চিং-ফেন। আমরা যুদ্ধ করছি কিন্তু ভাড়াটিয়া পেশাদারী সৈন্য আমরা নই। আমরা লড়ছি আদর্শের জন্য। পৃথিবীর মানুষ জানে যোদ্ধাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখাই হল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি কিন্তু আমাদের মহান নেতা জানে, রাজনীতি আর যুদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাই যারা যুদ্ধ করে তাদের রাজনীতির দীক্ষা থাকা দরকার।

যোদ্ধাদের আবার রাজনীতি কি। তারা হুকুম মানবে, মানুষ মারবে, এই তো তাদের কাজ।

স্বয়ান হেসে বলল, আমাদের মহান নেতা বলেছে, war is a special political technic for the realisation of certain political objective—যুদ্ধ হল বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক কায়দা। এই কৌশল দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণ দেবে তারা জানবেনা সেই রাজনীতি কি অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারাও জানবে। আমরা জানি। আমাদের কাজ হল অপরকে সেই উদ্দেশ্য জানিয়ে দেওয়া। তোমার বাবা তা সহ্য করতে চায় না।

কারণ আমার বাবা তার জামাতাকে ভাল ছেলে দেখতে চায়।

ফল হবে আমাদের আদর্শগত বিরোধ। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে দুঃখজনক করে তুলবে এই মনোভাব।

তুমি কি আমাকে ভালবাস না?

ভালবাসি ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালবাসি আমার দেশকে এবং আমাদের মহান নেতার আদর্শকে।

চিং-ফেন হাসল।

হাসছ কেন?

তোমাদের মহান নেতার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পার?

পারি। কেন?

তাকে একবার জিজ্ঞেস করব ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোন সময় সমষ্টির চিন্তা সম্ভব কিনা।

মনে কর সম্ভব নয়। তাতে তোমার লাভ কি?

ব্যক্তিগত সুখবৃদ্ধিকে শ্রদ্ধা করে কিনা তাও জানতে চাই।

তুমি যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করছ সে ব্যক্তির সুখবৃদ্ধি আমরা চাই না। সমষ্টির সুখ বৃদ্ধি হলে তার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিরও সুখ বৃদ্ধি হবে। এতে ঈর্ষা থাকবে না, বৈরীভাব থাকবে না, বঞ্চনা থাকবে না।

চিং-ফেন বাধা দিয়ে বলল, আমি মেহনত করব আর অন্যে তার উপসত্ত্ব পাবে এতো হতে পারে না।

আমাদের কথাও তাই, শুধু দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। সমাজের সব সম্পদ সমবন্টনই হল ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করে। শ্রমিক ও কৃষক পরিশ্রম করবে, আর তার উপসত্ব ভোগ করবে মালিক-জমিদার, তা হতে পারে না। মালিক জমিদারকেও পরিশ্রম করতে হবে, সেই পরিশ্রম অনুপাতেই সে পাবে উপসত্ব।

চিং-ফেন কি বুঝল বলা কঠিন তবে স্যুয়ান যে তার প্রণয়িনীকে মুক্তিযুদ্ধের মূলতত্ত্ব শোনাতে পেরেছে এইটেই হল তার সান্ত্বনা।

এর বহু বছর পর স্যুয়ান যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। চিং-ফেনকে জীবনসঙ্গিনী করার আশা যখন প্রবল তার মনে তখন জানতে পারল চিং পালিয়ে গেছে তাইওয়ানে ওপর একজনকে বিয়ে করে।

ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব মেটাতে পারেনি কেউ-ই।

চারিদিকে আন্দোলন। তাইওয়ানকে মুক্ত করতে হবে। চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করতে হবে। যতদিন চিয়াং তাইওয়ানে থাকবে ততদিন চীনের বিপদ। আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী কামান উঁচিয়ে আছে চীনের দিকে। এ অসহ্য। তাইওয়ান চাই।

নেতারা সমর্থন করল এই দাবী কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে কি ভাবে তাইওয়ান যাওয়া যায়—এইটেই সমস্যা। আমেরিকা চিয়াংকে পাহারা দিচ্ছে। তাইওয়ানে সৈন্য নামতে গেলেই আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হবে, ফলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি আছে। সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধে আমেরিকা অংশ গ্রহণ করবে না বলেছে।

সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন দায়িত্ব ও সততা রক্ষা করার আগ্রহ আমেরিকার নেই।

বিষণ্ণভাবে চীনের মানুষ বলল, তাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বাধ্য কর।

করা হবে তবে it is not advisable to be in a hurry—অত ব্যস্ততা ভাল নয়। তোমরা তো জান আমেরিকা চিয়াংকে রক্ষা করতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছে। মার্কিন সাহায্য এসেছে দ্বিগুণ। জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধে যে পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে চিয়াং তার অনেক অনেক গুণ বেশি সাহায্য করেছে আমেরিকা কম্যুনিষ্টদের নির্মূল করতে। চীনের মানুষ মনে করে চীনের গৃহযুদ্ধ হয়েছে আমেরিকার ভূমিতে, চিয়াং উপলক্ষ মাত্র "We (Americans) were the architects of the strategy, we flew Government troops into Communist territory, we transported and supplied Kuomintang armies marching into the Communists' Yellow River basin and into the no man's land of Manchuria, we issued the orders to the Japanese garrisons that made the railway lines of the north the spoils of the Civil war. Our marines were moved into North China and remained there to support Chiang's regime—though fiction succeeded fiction to explain their continued presence in noble words," - (Thunder out of China)—আমেরিকা প্রথম অবধি যুদ্ধ করেছে আমাদের বিরুদ্ধে, তাদের পয়সা, তাদের বুদ্ধি, তাদের পরিবহন, তাদের নৌসেনার সাহায্য—এই নিয়েই চিয়াং যুদ্ধ করেছে। আজও আমেরিকা তার নৌবহর নিয়ে পাহারা দিচ্ছে চিয়াংকে। নিজেদের অপরাধ যাতে বিশ্বসভায় নিন্দিত না হয় সেজন্য নব চীন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকারও করেনি আমেরিকা।

কিন্তু আমেরিকা বলতে চায় চীন হল রাশিয়ার উপনিবেশ (The Peiking regime may be a colonial Russian Government)

মিথ্যা প্রচার করে ওরা যদি আনন্দ পায় তাই পেতে দাও। আমরা আমাদের অবস্থা জানি। যারা এই অপপ্রচার করছে তারাও

জানে চীনের প্রগতি রাশিয়ার চেয়েও অনেক উন্নত (Chinese Communists exhibited a far more pragmatic outlook than the Russians)

কিন্তু।

আবার কিন্তু কি।

রাশিয়া যেভাবে ভিয়েতনামে সাহায্য করছিল তা কমিয়ে দিল কেন?

আমরা সেই অনুপাতে সাহায্য বৃদ্ধি করেছি। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা রক্ষার নামে যেভাবে নরহত্যা করেছে, তাকে রোধ করতে হলে অধিক সাহায্য না দিয়ে উপায় নেই।

আমাদের বিমানবহর তো সামান্য শক্তিসম্পন্ন, নৌবহর বলতে গেলে আধুনিক যুগের উপযোগী নয়। আমাদের পক্ষে এই যুদ্ধে কতটা সাহায্য করা সম্ভব।

কতটা তা হিসাব করে বলা কঠিন। তবে আমাদের শক্তি যেমন জনসাধারণ, তেমনি ভিয়েতনামীদের শক্তিও তাদের জনসাধারণ। আমাদের সামান্য সাহায্যই যথেষ্ট সাহায্য। সেজন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। আমাদের মহান নেতা মাও সে-তুং আর ওদের মহান নেতা হো-চি-মিন কেউই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করার মত লোক নয়। সেজন্য ভয়ের কিছু নেই।

সেদিন আমেরিকার ভিয়েতনাম আক্রমণের কথা আলোচনা করছিল ক্যান্টনের যুবকশ্রেণী। তাদের ঘৃণা যেন ফেটে পড়ছিল প্রত্যেকটি কথায়।

একজন বলল, আমেরিকা যে অন্যায় করছে তার ইতিহাস যদি কোন দিন লেখা হয় তা হলে পৃথিবীর মানুষ ঘৃণায় নাক সিঁটকোবে। চিয়াং বিতাড়িত তবুও তাকে জিইয়ে রাখতে আমেরিকা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। চীনের সর্বনাশ করতে বর্মার জঙ্গল দিয়ে য়ুনানে চিয়াং-এর সৈন্য ঢুকিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টাও করছে। সর্বতোভাবে আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় জন বলল, ওদের শায়েস্তা করা হয়েছে।

আরেকজন বলল, ভিয়েতনামে আমেরিকার যে ভূমিকা তাতে যে কোন লোকই বলবে যুদ্ধ চলছে হো-চি-মিন আর কেনেডি-জনসন-নিকসন কোম্পানীর সঙ্গে।

তবে আর বেশি দিন নয়। ওদের দিনও শেষ হয়ে এসেছে। অত্যাচারীকে পালাতেই হবে (The days of the U. S. aggressors in Vietnam are numbered)

আমাদের চেয়ারম্যান মাও ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন সমগ্র চীন জাতির পক্ষ থেকে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের মহান নেতা বলেছেন, তোমরা কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছ। পরিবেশ তোমাদের পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবু তোমরা তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করে আমেরিকার আগ্রাসী নীতিকে যে ভাবে আঘাত করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তাতে তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। চীনের জনসাধারণ তোমাদের লাল সেলাম জানাচ্ছে।

আমেরিকার মত শক্তিশালী ধনতন্ত্রবাদী দেশের সঙ্গে ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের এই যুদ্ধ পৃথিবীর বিস্ময়।

আমরাও ভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে জাপানের সঙ্গে লড়েছি, আমেরিকার সঙ্গে লড়েছি, আমাদের জয় সম্ভব হয়েছে জনতার মুক্ত হবার নেশায়। আদর্শ আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী করেছে, শত্রুকে বিতাড়িত করেছে। আজ ভিয়েতনামের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে যে কোন জাতি, ছোট অথবা বড় যাই হোক না কেন, যে কোন শক্তিশালী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে যদি তার জনসাধারণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বাধীনতার জন্য জনযুদ্ধ করতে পারে। ভিয়েতনামের এই যুদ্ধ হল জনতার যুদ্ধ, বাঁচার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। এতে আক্রমণকারীর পরাজয় নিশ্চিত। আর পরাজয় সন্নিকটে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ভিয়েতনামী মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থন করছি।

ঠোঁটের সঙ্গে দাঁতের যেমন সম্পর্ক তেমনি ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। আমরা দুই ভাই, সুখ দুঃখে সমান অংশীদার। ভিয়েতনামের এই সংঘর্ষ আমাদের সংঘর্ষ, তাদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে, সে অত্যাচারকে আমাদের ওপর অত্যাচার মনে করি। চীনের সত্তর কোটি জনসাধারণ ভিয়েতনামীদের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করছে। জয় নিশ্চয়, নিশ্চয় জয় হবে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, তাদের মৃত্যু ঘটবে ভিয়েতনামে।

অতীতের ইতিহাসে দেখেছি কিছু স্বার্থবাহ আমেরিকাকে চীনের বন্ধু মনে করত। তারা জানত না আমেরিকা পৃথিবীর সব চেয়ে কুখ্যাত জহ্লাদ। আমেরিকা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য মাও কুনকে সাহায্য করেছে, আবার তুলা রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এইগুলো থেকেই তো আমরা জানতে পারি আমেরিকার উদ্দেশ্য। তাকে বন্ধু যারা মনে করত তাদের ভ্রম দূরীভূত হয়েছে। আজ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, রোডেশিয়ার নরহত্যা দেখে সবাই স্বীকার করবে, আমেরিকা জহ্লাদের জাত। তাদের বিশ্বাস করার অর্থ নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা।

আমরা যুদ্ধ করেছি চিরস্থায়ী শান্তির জন্য। আর আমেরিকা চিরস্থায়ী অশান্তি বজায় রাখতে যুদ্ধ করছে তার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে।

চীনের সমস্যা তো অনেক দিনের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের নামে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা লীগ অব নেশন গঠন করেছিল। চীনের স্বার্থ বলী দিয়ে পাশ্চাত্য শক্তির স্বার্থ চীনের বুকে তারাই কায়েম করেছিল। আর সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল কুয়োমিনটাং সরকার। সোভিয়েত রাশিয়াকেও জব্দ করতে চেষ্টা করেছিল এই সব সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা। তাদের শায়েস্তা করতে রাশিয়ার মানুষ অস্ত্রধারণ করেছিল, তেমনি অস্ত্রধারণ করেছিলাম আমরা কিন্তু সরকার যার হাতে ছিল সেই চিয়াং কাইশেক দস্যুদের

স্তাবকতা করেছে সর্বসময়। আবার বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করেছে, তবে সেদিনের মত সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব নেই, এখন বাধা দেবার মত সদস্য রয়েছে বলেই এখনও বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। যদি তা না হতো আমেরিকা এতদিন আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করত। যুদ্ধটা আমেরিকার ভূমিতে হয় না তাই ওদের সম্পদ ও জননাশ হয় না। হয় সম্পদ বৃদ্ধি। তাই ওরা অশান্তি চায়, ওরা চায় যুদ্ধ। চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনের কোন পরিকল্পনা ওদের নেই।

শুধু যুদ্ধ নয়। শুধু রাষ্ট্র প্রশাসন নয়। শুধু কাব্যের জগৎ নয়। শুধু মনুষ্যধর্মী নয়। শুধু ত্যাগ তিতিক্ষা ভালবাসা নয়। মাও সে-তুং এই সব কিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি স্তম্ভ ও নাম, যার তুলনা পাওয়া বর্তমান দুনিয়াতে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। বহু দেশে বহু মনীষি জন্মেছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান মোটেই কম নয় কিন্তু মাও যে ভাবে চীনের দুঃখ বেদনাকে অনুধাবন করেছে, যে ভাবে সেই দুঃখ বেদনা মোচন করে শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করতে আজীবন সংগ্রাম করেছে, এমন উদাহরণ বিরল।

মার্কস ও লেনিন তার পথপ্রদর্শক কিন্তু কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাদের মতবাদ প্রয়োগ করতে কোন সময়ই চীনের ঐতিহ্য, পরিবেশ, মনোভাব, আচার আচরণ, এমন কি অতি নগণ্য বিষয়কেও উপেক্ষা করেনি।

লালফৌজ গড়তে মাও একদল দস্যু অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীকে যেমন প্রশ্রয় দেয়নি, তেমনি যুদ্ধের নামে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারকেও প্রশ্রয় দেয়নি। মাও যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্যবাদীর দালালদের বিরুদ্ধে, জনস্বার্থের বিরুদ্ধে নয়, যুদ্ধ করেছে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে, দরিদ্রকে পেষণ করতে নয়। সেজন্য মাও পেয়েছে সর্বহারার অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা ও সহানুভূতি। তার সাফল্যের মূলে ছিল জনসাধারণের এই তিনটি অবদান।

মাও সবার মানুষ, তাই মাওয়ের নাম মোহ সৃষ্টি করে চীনা অধিবাসীদের মনে, তারা মাওয়ের শিক্ষাকে অভ্রান্ত মনে করে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

শাওসানের সেই নিম্নবিত্ত চাষী গৃহিণীকে আজও যদি মনে করা যায়, আজও যদি তার যন্ত্রণা কাতর মুখটা কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাহলে ভাবতে অবাক মনে হবে এই নারীর গর্ভজাত সন্তান মাও সে-তুং নিজেকেই মহান করেনি, মহান করেছে তার গর্ভধারিণীকে ও স্বদেশকে। ডিসেম্বরের শীতের রাতে আমরা ফিরে গিয়ে যদি সদ্যজাত সন্তানকে দেখতে উঁকি দেই তাহলে দেখতে পাব শীতকাতর সেই শিশুটির ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে, জননীর স্তনে মুখ রেখে যেন কঠিন লড়াই করছে বাঁচার এবং বাঁচাবার পথ খুঁজতে।